পাতাল কলকাতা

গুরু বিশ্বাস

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭/২৭শে এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক : অরুণ কুমার শীল, দেবযানী,
৬বি শংকর হালদার বাই লেন, কলকাতা-৫

মুদ্রাকর : সেনকো প্রিন্টার্স, ৪৬বি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

পশ্চিম বাংলার আত্মতুষ্ট শাসকদের উদ্দেশে—

লেখকের অন্য কয়েকটি উপন্যাস

মতিন মিয়ার মরিফত
পরাজিত পদাতিক
বানভাসি
আবছায়া
অমিতা
বইশি
স্বর্গ
পোকা

টিঁয়া-টিঁয়া-টিঁয়া

ওপর দিকে তাকাল নিরঞ্জন। চলমান শব্দ। একটা টিয়া। ডাকতে ডাকতে পশ্চিম থেকে পূবে উড়ে গেল। বোধহয় ঘরে ফিরছে, নিরঞ্জন ভাবল। আঃ, স্বস্তি। এখানেও তাহ'লে টিয়া! এই টিয়াই যেন তাকে জীবন দিতে পারে। তার সেই সবুজ জীবন। এই টিয়ার গায়ের রঙের মতই সবুজ। সেই জীবন তাহ'লে সে পেতেও পারে ফিরে। চোখ নামাল মাটিতে। তার বউ সীতা মাটিতেই শুয়ে আছে আঁচল বিছিয়ে। কালো রঙ গায়ের। চকচকে কালো। মনে হয় একটা পাথর। টিয়ার মত নয়। কোন ভাবেই নয়। তবু যেন কোথায় টিয়ার সঙ্গে মিল আছে। সে দেহ। পাখীর মতই নিটোল গোল পুষ্ট দেহ সীতার। ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা সীতা যদি দেখত। যদি দেখতে পেত এখানেও টিয়া ওড়ে।···তেমনি ভাবেই ডাকে···

টিঁয়া-টিঁয়া, টিঁয়া-টিঁয়া টিঁয়া

এবার আর একটা নয়, অনেকগুলো। এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যাচ্ছে ডাকতে ডাকতে। ভাবনা ছিঁড়ে গেল নিরঞ্জনের। না আর দেখবে না টিয়াগুলোকে। দেখলেই গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে। বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা। নিরঞ্জনের মন—ত্রিশটি আলো অন্ধকার বছরে তৈরী গ্রামের মন; সোনা রঙ ধানের শীষের মতই যে মন স্বর্ণালী, পুকুরপাড়ের পেয়ারা গাছের ডালে বসে থাকা মাছরাঙ্গাটির মত বর্ণালীও সে মন হয়ত বা। কখনও সে মন কেঁপেছে বাঁশপাতার মত, কখনও দুলেছে যেন ঝড়ের মাঝে নারকেল গাছের পাতা। এমনি করেই ত্রিশটি বছর চলে গেছে তার জীবনের ওপর দিয়ে। তারপর কলকাতা।

এই শেষ নয়, নিরঞ্জন জেনেছে এই সুরু। ঘর যখন ভেঙেছে পথের তখন আর শেষ হবে না। কোনদিনই নয়। সে তো দেখছে ঘর যাদের নেই পথ তাদের অনন্ত। কলকাতাতেই দেখছে। গ্রামে যার স্বপ্ন দেখেনি কলকাতা

শহরে এসে দেখছে তা বাস্তব। তাদের গ্রামে বজরঙলালের খোলায় ইট হত সে দেখেছে—সে সেই ইটের খোলায় মজুর খাটতে গিয়েও দেখেছে রাশি রাশি নতুন ইট। ভেবেছে তাদের গ্রামের বাড়ীগুলো সবই তো মাটি আর খড়; এ ইট যায় কোথায়? জবাব পায়নি। এতদিনে পেয়েছে তার জবাব। বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে তার অনেকবার মনে হয়েছে এই সব বাড়ীতে তার ইট আছে। তার তৈরী ইট। যে ইট তৈরী করে সে অর্ধেক মজুরী পেয়েছিল। অর্ধেকটা সর্দার খেয়েছিল কারচুপি ক'রে। বজরঙলালের কাছে নালিশ করতে গিয়ে বাকি মজুরী ও পেয়েছিল—বজলুর শেখের গলাধাক্কা। বজরঙলালই ওটুকু বজলুরকে মিটিয়ে দিতে বলেছিল। মজুর অমন রোজই কত যায় আসে, সর্দার তো যায় আসে না। বরং সর্দার গেলেই মজুর আর আসবে না মাথা খুঁড়লেও।

এই সেই সুন্দরী কলকাতা। যে সুন্দরী রাক্ষসী মায়ায় মানুষকে শুষে নেয়। সাজে, আরও সুন্দর হয়। কি বড় কি ছোট সবাই সেই শোষণ যন্ত্রে নিজেকে বলি দিয়ে গড়ে তোলে নগরী। এই সেই নগরী যার জন্যে দূর গ্রামেও মানুষ শোষণের কল পেতে বসে থাকে মানুষের রক্ত মাংস অস্থি নিয়ে একে সাজাবে বলে। যেমন বসে আছে বজরঙলাল, মহাদেব খটিক আছে ধান চালের কল খুলে।

দেশে থাকতে নিরঞ্জনের মনে হয়েছে কলকাতায় নিশ্চয়ই জীবন আছে। জীবন সেখানে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, সব মানুষই হাত দিয়ে ধরে নিতে পারে—নেয়ও তাই। এই তো তাদের গ্রামের ফটিক দত্ত কলকাতায় গিয়ে কি পয়সাটাই না ক'রেছে। দেশে যখন প্রথম ফিরল লোকে চিনতেই পারল না। সেই ফটিক দত্ত কি আর আছে? অন্য লোক—ফটিক বাবু। তার মুখ থেকেই সবাই শুনল গ্রামে পথঘাট ভালো নয় বলে গাড়ীটা আনে নি। বিশ্বাস ক'রল না। ক'রেছিল পরে যখন ফটিক দত্ত গ্রামের স্কুল ঘরগুলোকে একেবারে পাকা বাড়ী ক'রে দিল। ফটিক দত্তকে দেখেই নিরঞ্জন বিশ্বাস ক'রেছিল কলকাতায় গেলে সে নতুন জীবন পেতে পারে।

ফটিক দত্তর অনেক কিছুই ছিল এই গ্রামে, এখনও কিছু আছে, দখ্‌নের মাঠে সোনা ফলানো ধানের জমি, নারকেলের বাগান, আছে পাকা একতলা মজবুত বাড়ী। তবু ফটিক দত্ত একদিন চলে গেল, সব ছেড়ে চলে গেল বৌ ছেলে নিয়ে, গরুর গাড়ীতে বাসুলপুর স্টেশনে সেখান থেকে নিশ্চয় ট্রেনে।

ফটিক দত্তর জমি ভাগে চাষ করত ইদ্রিস মিয়া, তার বুড়ো বাপ বলল—চলে যাবেন ক্যানে গো কর্তা? এমন রাজপাট ছেড়ে কেউ কি কখনও যায়?

সে বেচারীকে সান্ত্বনা দিয়েছিল বার্ধক্যে তাই তার পক্ষে যা বলা সহজ তার বিপরীত বলল ছেলে ইদ্রিস—এখানে আর কি রাজপাট আছেন কর্তার, ওখানে যা ব্যবসা হয়েছেন সে কি আর এই দুবিঘে ভুঁইয়ের সঙ্গে তুলনা ?

আহাসেন আলির দিকে চেয়ে ইদ্রিস আরও বলেছিল—বলি তোমরাও তো আছ গো চাচা, বাবুর জমির ফলটা ফসলটা গুইচে দিতে পারবে না ?

আহাসেন আলিও ফটিক দত্তর জমি ভাগে চাষ করত। ইদ্রিসের বুদ্ধিসম্পন্ন কথায় সায় দিয়ে একমুখ দাড়ি নেড়ে সে সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল—এখানের জন্যে হুজুরের চিন্তার মোটেই কারণ ঘটবে নি। সালে দুবার করে এলিই সব ঠিক বুঝে সমঝে নে যাবেন।

ফটিক দত্ত যখন দেশ ছাড়ল এমনি কথা অনেক উঠেছিল অনেক প্রান্ত থেকে। কিছুতেই কান করেনি ফটিক দত্ত। ফলে গ্রামের শুভানুধ্যায়ীরা ভেবেছিল ইচ্ছে করেই সর্বনাশটা করল ফটিক। কিন্তু পরে তারাই বুঝেছিল তা হয়নি। জমির ফসলে ভাগ সে কম পেয়েছে বটে, ইদ্রিস আর আহাসেন বাড়ী ক'রেছে ঠিকই তবে ফটিক যা করেছে তা তার ফসলের চুরি যাওয়া ভাগের হাজার গুণ।

আর নিরঞ্জন ? গ্রামে থাকার মধ্যে আছে তার একটু মায়া। বাপ-ঠাকুর্দার মাটি, এই মোহ। এছাড়া আর কিছু নেই, ভিটেটি পর্যন্ত নয়। ভিটে অবশ্য নিজের একটা ছিল—আর নেই। আড়াই কাঠা জমিতে চারটি বাঁশের খুঁটির ওপর মশারীর কাপড়ের মতো একটা চালা তার ছিল। দুবছর আগে যেবার অসুখটা হ'ল সেবারই গেছে। সীতা পেট চালাচ্ছিল কোন রকমে, রোগের খরচ চালাতে পারছিল না। গাঁয়ের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা অঢেল। সরকারী শুভেচ্ছা সেখানে উদার তবু নিরঞ্জন জায়গা পেল না সেখানে। ওষুধ পেত। সদ্য পাশকরা ডাক্তার পাইকারী হারে রোগী দেখে বিধান দিলে কম্পাউণ্ডার বাবু ভেতর থেকে ঝাঁজালো এবং উগ্রগন্ধ যে জল শিশি ভরে এনে দিত তাতে রোগের উপশম নেহাৎ আয়ুর জোর না থাকলে হবার কথা নয়। মাঝে মাঝে ট্যাবলেটও দিত, কাজ না হলে ওষুধ বদলে দিত ডাক্তার, তবে রোগ সারা না সারার কোন দুশ্চিন্তা সেই ভদ্রযুবকটি কখনই ক'রত না।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সীতা ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যখন বলল—আপনার পায়ে ধরি ডাক্তারবাবু একটা উপায় ক'রে দিন—ঠিক তখনই ডাক্তার জানতে চাইল—কি হয়েছে ?

নিরঞ্জনের শক্তি অনেকটাই ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে ম্লান স্বরে বলল—হজম হয় না বাবু, বুক জ্বলে।

এই প্রথম কিছুটা মন দিয়ে দেখল ডাক্তার, জানতে চাইল—আর কি হয় ?

দাস্ত হয় বাবু। বমিও হয় মধ্যে মধ্যে—যোগ করল সীতা।

কি খেতে দাও ?

জলটুকু পর্যন্ত খেতে পারে নি বাবু—সীতা জবাব দিল।

এত দেরীতে নিয়ে এলে কেন ?

না বাবু···

সীতা আরও কি বলতে যাচ্ছিল তাকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই ডাক্তার বলল—না তো কি ? আরও দু চারদিন ঘরে বসিয়ে রাখলেই তো পারতে।

সীতা আর বলবার সুযোগই পেল না যে দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারবাবু নিজেই চিকিৎসা ক'রে চলেছেন। কোনই ফল হচ্ছে না। ডাক্তারই বলল—সদরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখন। সেখানে দেখালে যদি কিছু হয়, এখানে হবার নয়।

কথাটা শুনে চোখে যেন অন্ধকার দেখল সীতা। মানুষটা অসুখে পড়বার পর থেকে একটা পয়সা রোজগার নেই। ওষুধটা, সে ভালো হোক আর না হোক, হাসপাতাল থেকে দিলেও রোগীর পথ্য তো জোগাতে হচ্ছে। কি করে যে পথ্য জোগাড় করে তারই এখন ঠিক নেই। ওপাড়ার বুড়ি দাসুর মার কাছে সীতা শুনেছে আগেকার কালে নাকি অনেকেই চাল তৈরী ক'রে, চিড়ে কুটে পেট চালাত। দাসুর মা নিজের কথাই তো বলে দাসুকে নাকি অমনি ভাবেই পরের বাড়ী ধান ভেনে ভেনে মানুষ ক'রেছে। আজকাল যে ধান ভানা চাল তৈরী করাও উঠেই গেছে। বেশীর ভাগ লোকই জমির ধান বিক্রী করে দিয়ে কলে ভাঙ্গা চাল কিনে আনে তুষ্ট মুদীর দোকান থেকে। মাত্র দু চারজন যারা মজুরী হিসেবে ধান পায় অথবা সামান্য জমি ভাগে চাষ ক'রে অল্প-স্বল্প ধান পেয়ে থাকে খাবার মত, তারাই কেবল নিজেরা ঘরে চাল ক'রে নেয়। নিজেরাই জন খাটে তারা, জন খাটায় না, কাজেই সীতা পেট চালাবার মতো পথও পায়না খুঁজে। ভাবে কি ক'রে দিন চালাবে, কেমন ক'রে চিকিৎসা করাবে নিরঞ্জনের ! ডাক্তার আবার সহরে চিকিৎসা করানোর কথা বলাতে সীতা ভেবেই পেল না কি ভাবে তা হবে। অথচ অবস্থা যা তাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা না ক'রলেও নয়। বুঝে শুনে সীতা বলল—সহরে গেলে তো অনেক খরচ ডাক্তারবাবু। অত টাকা কোথায় পাব ? অনেক-কষ্টে ঘটিটা বাটিটা বিক্রী করে তো এতদিন কাটল···। কাঁদতে লাগল সীতা।

দিনের পর দিন দিন না খেয়ে দেহে একটু টোল পড়লেও মোটামুটিভাবে নিটোল সেই শরীর কান্নার চাপে যখন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তরুণ চিকিৎসক একটু যেন নরম হ'ল। বলল—তোমরা যাবার ভাড়া অন্তত ব্যবস্থা কর আমি ওখানের হাসপাতালে ডাক্তারবাবুর কাছে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এতে

উপকার হবে।

নিরঞ্জন হাত দুটো জোড় করে বলল—আপনার দয়া ডাক্তারবাবু, ভগবান আপনার মঙ্গল ক'রবেন।

ডাক্তার নিরঞ্জনের কথায় কান দিল না। সীতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—এখন ব্যস্ত আছি বিকালে এসে চিঠি নিয়ে যেয়ো।

সীতা তবু নড়ল না, বলল—এখানে চিকিচ্ছেটা হ'লে বড় ভাল হ'ত ডাক্তারবাবু।—সে ভাবছিল এখানের হাসপাতালে যেমন রোজ যাতায়াত করতে হয় তেমনি যদি সদর হাসপাতালে যেতে আসতে হয় কেমন ক'রে ক'রবে তা নিরঞ্জন? এখানে না হয় সে নিজে শুদ্ধ আসে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, ফিরিয়ে নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে, সদরে হলে তো আর তা পারবে না! এখান থেকে সাত মাইল বাম্বলপুর গিয়ে ট্রেনে চেপে যেতে হবে। যেদিন যাবে রোগী দেখিয়ে সেদিন ফিরে আসা চলবে না। কোথায় থাকবে সেদিন? বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থাটা পেলেও তা নেবার যেটুকু ক্ষমতা দরকার তাও যে তাদের নেই।

ডাক্তার একটু বিরক্ত হয়েই বলল—এখানে তো আমাকে একজন রোগী নিয়ে বসে থাকলে চলে না যে একজনেরই চিকিৎসা ক'রব—বলেই নিজের কাগজপত্র নাডতে লাগল কাজের ব্যস্ততায় এবং যেন সীতাকে শুনিয়েই বলতে লাগল—এরা যত পায় এদের আশা মেটে না। গ্রামে হাসপাতাল হয়ে গেছে অতএব আর দূরে যাবে না। বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাও ভাবটা এমন ডাক্তারগুলো কেন বাড়ী গিয়ে রোগী দেখে বাড়ী বয়ে ওষুধ দিয়ে আসে না।

সীতা শুনল। শুনল নিরঞ্জনও। কিন্তু এসব কথা শুনে তাদের মনে কোন অভিব্যক্তি হয় না। এমন কথা নিরঞ্জন অনেকবার শুনেছে। অনেক সরকারী কর্মচারীর সম্মুখীন হয়েছে সে অনেকবার অনেক কাজে, এই ধরণের কথা সে প্রায় সবার মুখেই শুনেছে। আগে দুঃখ পেত আজকাল পায় না।

ডাক্তারের কথা যেন তার কানেই পৌছায়নি অথবা ডাক্তার অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে এমনিভাবে কানে না তুলে নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—চল বউ বাড়ী যাই। সে বেলা তুই আসিস।

নিরঞ্জনের চিকিৎসার জন্যে সহরে যাতায়াতের প্রথম দিনের খরচ জোগাড় হ'ল অনেক চেয়ে চিন্তে। এতদিনের রোগ একদিনে যে সারবে না খুব স্বাভাবিকভাবেই তা জানত সীতা, আরও জানত বেশীদিন এভাবে চিকিৎসা চালানো কোনভাবেই সম্ভব হবে না। তবু জীবনের তাগিদে তা ক'রতেই হবে বলে যেন মরীয়া হয়েই নামল। কিন্তু রোজগারের পথ যারা না পেয়েছে সামান্য টাকা জোগাড় করাও তাদের পক্ষে দুরূহ সমস্যা। নিজের দরকারের বেশী টাকা যাদের

আছে অন্যের প্রয়োজনে তাদের সে টাকা কখনই লাগে না। তাই যখন একজনের ঘরে খাবার পচে আর একজনের পেটে ক্ষিধের আগুন জীবনী শক্তিকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ ক'রে খায়।

তাই স্বামীর চিকিৎসার জন্যে ভিটের মাটিটুকু পর্যন্ত সীতাকে বাঁধা দিতে হ'ল হরি মুদির কাছে। সীতা চোখের জলের সঙ্গে ভাবল, সেরে উঠে আবার রোজগার ক'রবে লোকটা, আবার ফিরে আসবে ভিটের সঙ্গে যা গেছে সবই। নিরঞ্জন রোগের যন্ত্রণায় আর চিকিৎসার নিষ্ফলতায় হতাশ হয়ে পড়েছিল দিনে দিনে। তবু যখন ভিটের জমিটার দলিলে দস্তখত করতে হ'ল তখন তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরল বেশ কিছুটা। নিঃশব্দে সেই বেদনাকে হজম ক'রে নিজের ঘরে ফিরে সব শক্তি উজাড় ক'রে কেঁদে উঠল সে—আমি মরতাম সে-ভাল ছিল বউ, যদি বাঁচি তবে থাকব কোথায় বল্?

তার প্রতি শব্দে যন্ত্রণা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। শব্দগুলো মনে হ'ল যেন হৃদয়ের পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে ঠিক যেমন ভাবে হারমোনিয়ামের স্প্রিং ভেঙ্গে গেলে আর্তনাদের মত শব্দ অকস্মাৎ ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

সীতা নিজের অশান্ত মনকে দমন ক'রে নিরঞ্জনকে সান্ত্বনা দিতে বলল—তুমি ভাল হয়ে নাও আবার সব হবে, আমাদের ভিটে ফিরিয়ে নিতে পারব। হরিকাকার সঙ্গে তো সেই কথাই আছে।

নিরঞ্জন বিন্দুমাত্র শান্ত হ'ল না। নিজের মনেই কেঁদে চলল। সবহারানোর আগের মুহূর্তের বেদনা তার মনের পর্দায় যে কম্পন তুলেছে তার স্থিরতা সহজে আসা সম্ভব নয়। সীতা বাধা দিতে পারল না বরং সেই শূন্যতার বেদনা সংক্রমিত হ'ল তার মনে, ফলে সে নিজেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিরঞ্জন সীতার দিকে চেয়েও দেখল না, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে কাঁদল আর ভাবল, এবার কোথায় দাঁড়াবে তারা? কোথায় আশ্রয় পাবে? সে যদি মরেও যেত তবু সীতা তার কোলের ছেলেকে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে পারত এই খড়ের ছাউনীর তলায়। এখন সে মরে গেলে তো কথাই নেই বেঁচে থাকলেও বউ ছেলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে তার কোন ঠিকানা নেই। এ কেন ক'রল সীতা? কোন দুর্মতি ঘাড়ে চাপতে এ বুদ্ধি দিল সে? কোনদিন আর এ ঘর ফিরবে না। হরিমুদি আম-কাঁঠালের বাগান করবে এখানে, নয়ত ফসল রাখবার গুদাম তৈরী ক'রবে তার এতদিনের আশ্রয় ভেঙ্গে ফেলে।

অসুখ হবার আগে পর্যন্ত লোকের জমিতে জনমজুর খেটে যা সামান্য রোজগার হ'ত তাতে কোনমতে দুবেলা দুটো ভাত জুটতো কেবল, মাঝে মাঝে তাও জোটেনি, একবেলা খেয়েও রাত কেটেছে কত। চাষের কাজ যখন না থেকেছে দিনের বেলা কাজ জোটেনি, সারা দিন কারও কোন সামান্য কাজ করে,

দিয়ে সন্ধ্যে ফিরেছে দুটো চাল হাতে ক'রে। সারাদিন উপবাসের পর চাল ক'টা ফুটিয়ে খেয়েছে। অনেকদিন উপর্যুপরি কাজ না হ'লে হরিমুদির দোকানে বাকিতে সামান্য চাল এনেছে চেয়ে। হরিমুদি নিরঞ্জনদের ধার দেয় সাবধানে, কারণ প্রত্যেকদিন যারা দিনের অন্ন কোনক্রমে রোজগার করে তারা কোনভাবেই ধার শোধ করতে পারবে না হরিমুদি জানে। তাই এত সন্তর্পণে এত সামান্য ধার দেয় যাতে চাপ টাপ দিয়ে আদায় করতে পারে সুযোগ মতই। প্রায় দিনই হরিমুদি ধার দিত না বলে কাজ না থাকলে হাঁড়ি চড়ত না উনোনে। আর সেই নিরঞ্জন কিনা রোগমুক্তির পর ফিরিয়ে নেবে বন্ধকী ভিটে! কোনদিনই সম্ভব হবে না। নিরঞ্জন নিজেও জানে। তাই তার বেদনার দহন বিরামহীন।

হরিমুদি দয়া করল কেবল এইটুকুই নিরঞ্জনের অবস্থা বুঝে টাকা ফেরৎ দেবার জন্য তাগাদা ক'রল না। সুদের জন্যও নয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালেই একদিন ঘরের চালাটা উড়ে গেল বাতাসে। উড়ে গেল ঠিক নয়, ভেঙ্গেই গেল ঝড়ে। ফলে মাথার ওপরে আকাশ ছাড়া আর ছাদ রইল না। প্রকৃতির রোষ এবং করুণা উভয়ই বাধাহীনভাবে এসে ঢুকতে লাগল ঘরে। এমন অবস্থায় ঘর থেকে কি লাভ, তার চেয়ে বরং নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করাই ভাল। গ্রামের মধ্যে আছে কেবল এক বৃদ্ধ বট। তার তলায় এই ঘরের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে তো আর সীতাকে নিয়ে সেই গাছতলায় দাঁড়ানো যায় না! এর চেয়ে ভাল একটা আশ্রয় খুঁজে নিতেই হবে। না হয় ক্ষণস্থায়ী হবে, তা হোক তবু আপাততঃ পাওয়া যাক তো একটা, পরে যেমনভাবে ভাগ্য নিয়ে যায় চলতে তো হবেই।

নিরঞ্জন বলল—চল বউ সদরেই যাই। হাসপাতালের দক্ষিণ দিকের বাইরের বারান্দাটা খালিই পড়ে থাকে; ওখানেই থাকা যাবে ক'টা দিন।

সীতা জবাব দিল না।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল—ভাবিস কি? চল যাই।

সীতা শুনেও শুনল না কথাটা; উঠবে, যাবে, প্রভৃতি শব্দগুলো তার মনে অনির্বচনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রল। যাবে? কোথায় যাবে সে? এক সময় অনুভব করল সে যেন গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে, নড়তে পারছে না। একদম নিশ্চল হয়ে গেছে সে। এমনি শক্তি রহিত হলেই বুঝি মানুষ মরে। হ্যাঁ এইখানেই যেন মৃত্যু হয় সীতার, যেন ভেসে না বেড়াতে হয় পথে পথে। কোনও কূলে নিজের বলতে কেউ নেই তার। কাজেই নিরঞ্জনের এই কুঁড়ের বাইরে কোন আশ্রয় থাকতে পারে তা স্বপ্নেরও অগোচরে। ছোট্ট বেলায় বিয়ে হয়েছে তার, তারপর একদিন হঠাৎ খবর পেয়েছে তার বাবা, মা, আর ভাইটি একই সঙ্গে মারা গেছে ওলাওঠায়। তারপর থেকেই শুধু নিরঞ্জন। শুনেছিল কোথায় নাকি তার মামা বাড়ী আছে,

কোন গাঁয়ে তা সেও জানে না আর মামারও যে কোনদিন তার খবর নিয়েছে এমন নয়। সত্যি বলতে কি সে জানেই না তার মামা ক'জন অথবা কে কে আছে তার সেই আনুমানিক অস্তিত্বের মামা বাড়ীতে।

তাই আজ একাকীত্বের মধ্যে সে একটা সত্যই যেন উপলব্ধি ক'রল নিজের বলতে তার শুধু নিরঞ্জনই একা ছিল না, আর একটিও আপন ছিল—এই ঘরটি আর কচা গাছের ধবজি পুঁতে পাশের জমি থেকে আলাদা করা তার স্বামীর পূর্বপুরুষের এই ভিটে মাটিটুকু। আজ সেই আপন জনের মায়ায় তাকে কাঁদাতে লাগল। তার বাবা মা ভাই একসঙ্গে মরতে সে এত কাঁদেনি যত কাঁদল আজ এই মাটিটুকু ছাড়তে। সে না বুঝলেও তার অন্তর যেন আজ বুঝল পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ এই মাটিটুকুই। এটুকু ছেড়ে যেতে হলে এই ধরিত্রীর সঙ্গে তার যোগসূত্র আর থাকবে না।

নিরঞ্জন আবার ডাকল—ওঠ। কান্নাটান্না থো থুয়ে চ' যাই। কমনে কমনে বেলা পড়ে যাবে দিশে পাওয়া যাবে না।

কথা শুনল না সীতা, কাজেই বাধ্য হয়ে নিরঞ্জন বউ-এর কোল থেকে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে একটা বাহু ধরে তুলে নিয়ে বলল—চ-অ-ল।

তিন বছর আগে জন্মেছিল ছেলেটা খাদ্যাভাবে বাড়তে পারেনি। হাড়গুলো পর্যন্ত লম্বা হতে না পারার ফলে উঁচুতে একবছরের ছেলের মতো দেখায়, রোগা কেমন তার তুলনা নেই। ছেলেটাকে দাঁড় করাতে গিয়ে নিরঞ্জন লক্ষ ক'রল ছেলে বসে পড়ছে। দাঁড়াতেও পারছে না ভাল ক'রে। নিরঞ্জনের মনে হ'ল এই ভিটে তার বাবা যেমন তাকে দিয়ে গেছে তেমনি নিরঞ্জনেরও উচিত ছিল ওই রুগ্ন ছেলেটাকে দিয়ে যাওয়া। আজ যদি সে মারা যায় এই নির্জীব ছেলেটা যে একবেলা বাস ক'রবে এমন সংস্থানও পাবে না। কাজেই নিরঞ্জন যে বাপের কাজ করতে পারেনি এর চেয়ে বেদনার আর কি থাকতে পারে? জন্মে অবধি ভাল ক'রে পেট পুরে খেতে পায়নি বেচারী, দিতে পারেনি নিরঞ্জন, অথচ পিতৃপুরুষের মাটি তা থেকেও শেষকালে ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে যেতে হ'ল। হায়রে! গ্রামে যা কাজ কর্মের অবস্থা তাতে শরীর যদি সুস্থ হয়ই তবু কি পারবে নিরঞ্জন টাকা রোজগার ক'রে ভিটেমাটি ফিরিয়ে নিতে? এই খড়ের চালের তলায় শুয়ে কি মরতে পারবে তার ঠাকুরদার মত, বাবার মত? ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ব্যর্থতা যেন বড় কঠিন ভাবে বাজল নিজের বুকে। শূন্য প্রান্তরে অকস্মাৎ আসা ঘূর্ণি বাতাস যেমন ভাবে বাঁশী বাজিয়ে ফেরে তেমনি ভাবেই একটা যন্ত্রণা শব্দের সঞ্চার ক'রে গেল তার অন্তরে।

কয়েক নিমেষ নিঃশব্দে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে সীতাকে ডেকে তুলল—

মিথ্যে বসে দেরী ক'রে তো লাভ হবেনি। চল বেলাবেলি পৌঁছে যাই।

যাওয়ায় আদৌ সম্মতি ছিল না সীতার। ছিল না অনিশ্চয়তার কথা ভেবে। এখানে তবু নিজের দেশ গ্রাম, এখানে আধবেলা হলেও খাবার সংস্থান ক'রে নিতে পারে তারা। ইটের খোলায় কিংবা সরকারী রিলিফের কাজ ক'রে তবু আধপেটা খেয়ে দিন কাটে, অন্য কোথায় গিয়ে তা ক'রতে পারবে? কোথায় যাবে তারই তো ঠিকানা নেই কোন। হাওয়ায় ভেসে বেড়ান চলে কি? আপন দেশ গ্রাম—মায়া যেন কাটাতে চায় না কিছুতেই। মন বলে এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে, নিরঞ্জন বলে—চিকিৎসাটা করিয়ে সোজা চলে যাব ক'লকাতা। ইটখোলার রহমৎ বলছিল কলকাতায় না কি কত লোক চাকরী করে। যে যায় চাকরী পায়। কলকাতা গেলে কোন একটা চাকরী পেয়ে ফিরে আসব গ্রামে।—যেমনভাবে ফটিক দত্ত আজকাল আসে তেমনই, এক আধবার আসবে নিরঞ্জন, আমোদ আহ্লাদ ক'রবে, আবার চলে যাবে কর্মক্ষেত্রে। জীবন পাবে সেখানে।

আশায় বুক বেঁধে সীতা নিরঞ্জনের সঙ্গে এসে ডায়মণ্ডহারবারে যখন দাঁড়াল সন্ধ্যা তখন সন্নিকটে। হাসপাতালের বাইরের দিকের বারান্দাটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। তারই এক কোণে সঙ্গের সামান্য বিছানাপত্রগুলো নামিয়ে রাখল নিরঞ্জনরা। সীতা ক্লান্ত ছেলেকে শুইয়ে দিল কাঁথাটা পেতে। নিরঞ্জন কোনক্রমে এতটা পথ হাঁটবার ধকল সহ্য ক'রেছে। তার মনে হচ্ছিল শুধু শুয়ে পড়া নয় তার দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে-ও একপ্রান্তে ধপ ক'রে বসে পড়ল। সীতা নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখে জিনিসপত্রগুলো গোছাতে মন দিল। কেমন একটা নৈরাশ্য এসে তার মন ভরে ফেলল। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় নিরঞ্জন তার মনে ক'লকাতা সম্বন্ধে যতটুকু আশার সঞ্চার করতে পেরেছিল এখন যেন সবই মিথ্যে বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল তাদের গ্রামে এত লোক আছে, বাইরের লোক পর্যন্ত তাদের গ্রামে গিয়ে ব্যবসা ক'রছে, বাস ক'রছে, আর তার মধ্যে কি তাদের ক'জনের একটু জায়গা হ'ত না? খাবার মিলত না? চলে এসে অন্যায়ই হয়েছে। বরং আবার ফিরে যাবে তারা চিকিৎসা করিয়ে। কাল সকালবেলা ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেই বরং চলে যাবে ওষুধটুকু নিয়ে।

পরের দিন তো দূরের কথা প্রত্যাবর্তনই অসম্ভব হয়ে পড়ল তাদের পক্ষে। এখান থেকে চিকিৎসা ক'রে একটু উপকার যেন বোঝা গেল। তাছাড়া মাটি বন্ধক দেওয়া কয়েকটা টাকা তখনও হাতে থাকার ফলে দিন কাটছিল

কোনক্রমে। কেবল সীতা প্রত্যেকটি পয়সা খরচ করবার সময় চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল এ ক'টা টাকা ফুরিয়ে গেলে কি হবে? কি খাবে তারা? এভাবে ক'টা দিন বা চলতে পারে? যদি টাকা ফুরিয়ে যাবার আগে না নিরঞ্জন সেরে ওঠে তাহলে কিভাবে বাঁচবে তারা, চিকিৎসাই বা কেমন করে হবে? কোত্থেকে যে রোগ এসে জুটল—মাঝে মাঝে সীতার মনে হয়। রোগের প্রতি ক্ষোভ অকারণ বলে রোগীর প্রতি ক্ষোভ জন্মায় তার, কোত্থেকে যে এমন রোগ নিয়ে এল! অথচ এ রোগ যে নিয়ে আসবার নয় সীতাও তা জেনেছে অনেক আগেই। এমন পিত্তশূলের ব্যথা হয়েছিল বৈরাগীপুরের বল্লভীরও। সে অবশ্য শুনেছে। নিরঞ্জনের কথা উঠতে কে যেন বল্লভীর কথা বলেছিল। কোন কবিরাজ বল্লভীকে ভাল করেছিল তাও শুনেছে সীতা তবে বক্তা বলেছিল—এ রোগ বড়ই যন্ত্রণা দেয়। যার হয় তার হয়। বাইরে থেকে আসবার রোগ তো এ নয়।

সীতা তবু নিরঞ্জনকে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বকে, নিরঞ্জন সয়। বিনা প্রতিবাদে অপরাধীর মত সয়। খুব বেশী হ'লে বলে, আমি কি ক'রব বল? রোগ কি আর কারও ইচ্ছার?

ইচ্ছার নয়তো কি? এতদিনে রোগ সারবে নি?

না সারলে কি করা যায়? তুইও তো সারাবার চেষ্টা কম ক'রছিস না!

এরপর সীতাকে চুপ করতেই হয়। সত্যিই তো, কি করতে পারে তারা রোগ না সারলে? হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছেন এখন কমলেও পেটে পাথর হয়েছে তা কাটাতে হবে। সেই কথাটা মনে পড়ে সীতা নিজেও যেন পাথর হয়ে যায়। সেদিন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে হাসপাতালের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে চারপাশে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে নি। আজ কথাটা পুনরায় মনে হতে তেমনি অন্ধকার দেখল নিজের চারপাশে।

হাসপাতালের একজন নার্সকে ধরেছিল নিরঞ্জন—দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বলতেছেন পাথর হয়েছে পেটে। পিত্তপাথরি। বললেন কাটতে হবে···।

সীতা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সবই শুনছিল। কিশোরী ধাত্রীটি সহৃদয়া বলে বলেছিলেন—ফটো তোলা হয়েছে?

ফটো! নিরঞ্জন তো আকাশ থেকে পড়ল।

পিত্তশূল হলে ফটো তুলতে হয় পেটের, তবে ঠিক বোঝা যায় কি করতে হবে। সে তো তোলান নি ডাক্তার বাবু?

আজ্ঞে না।

অনেকসময় এমনি ওষুধেও সেরে যায়। কাজেই দেখ খুব বেশী না হয়ে থাকলে সেরে যাবে।

শুনে যেন অনেকটা আশা পেয়েছিল সীতা। মনে মনে আশীর্বাদ করে ফেলেছিল ধাত্রী দিদিমণিকে। আর মা রক্ষাকালীর কাছে প্রার্থনা ক'রে মানত করেছিল রোগ মুক্তির জন্যে। সাধ্যের কথা চিন্তা না করেই মা রক্ষাকালীকে একজোড়া পাঁঠার উপঢৌকনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। ধাত্রীটি মেয়েছেলে হলেও সীতা তার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে নি, কেবল মনে হয়েছিল এই নৈরাশ্যে মরুদ্যান যিনি রচনা ক'রে গেলেন সেই দেবতার পা দুটো জড়িয়ে ধরে গভীর কৃতজ্ঞতায়।

নিরঞ্জন বাঁচার প্রেরণায় জানতে চেয়েছিল—যে ওষুধটায় সেরে যায় আপনি তো তা জানেন, দিতে পারেন আমায়? আমার তো কেনবার ক্ষ্যামতা নেই দিদিমণি। আমি মরে গেলে এরা দুটো শুকিয়ে মরবে।

সেবাব্রতী দিদিমণির কিশোর মন ভিজে উঠেছিল অশ্রুতে। কিছু করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন—আজকাল রোগে লোক মরে না। তোমার কোন ভয় নেই, ঠিক সেরে যাবে। ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিচ্ছেন ওতেই হবে।

সেই আশ্বাসকে বিশ্বাস ক'রেই দিন যাপন ক'রছে সীতা। তবু মাঝে মাঝে বিশ্বাস টলে ওঠে, ডাক্তারবাবুর কথা মনে এসে দাঁড়ায়, হতাশা আর বিক্ষোভ দানা বাঁধে, প্রকাশও ঘটে কোন কোন সময় রূঢ় কথা বলে ফেলে রুগ্ন নিরঞ্জনকে, ব'লে কখনও নিজেও ব্যথা পায়। যখন তীব্র যন্ত্রণায় নিরঞ্জন ছটফট করে তখনই সীতার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়, নিজের অসহায়তা দিয়ে নিরঞ্জনের বেদনাকে এবং অক্ষমতাকে চিনতে পারে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, হে ভগবান এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও ওকে। সরিয়ে দাও এই দুঃসহ রোগ। নিরঞ্জন পেটের যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মত ছটফট করে সারারাত ধরে, ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ মুখে ঢেলে দিয়ে একান্ত অসহায়ভাবে সীতা বসে থাকে স্বামীর দিকে চেয়ে, আর তার নাম জানা যত দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। তখন খুঁজে দেখতে চায় কোনদিন নিরঞ্জন এমন কোন পাপ করেছে কিনা যার জন্যে এমন কষ্ট সে পাচ্ছে। কোথাও খুঁজে পায় না। সারাজীবন পরের জমিতে মুনিষ খেটেই পেটের ভাত যোগাড় করেছে যে নিরঞ্জন সে জানত কোন পাপ করেছে বলে সীতা মনে করে না। তবে কেন এমন কঠিন রোগে এত কষ্ট পাচ্ছে বেচারী? কেন এমন শাস্তি দিচ্ছেন ভগবান? নিদ্রাহীন রাত গভীর হ'লে দুই হাত জোড়া ক'রে সীতা প্রার্থনা করতে বসে, হে ভগবান, আমি যদি জীবনে কোন পাপ করে থাকি তার জন্যে ওকে অমন শাস্তি দিও না। এই দারুণ যন্ত্রণা থেকে বাঁচাও ওকে। হে মা দয়া কর! গত জন্মের পাপের জন্যই এই শাস্তি পাচ্ছে নিরঞ্জন, সীতা বিশ্বাস করে। কত জন্মের পাপ জমলে যে এমন কষ্ট মানুষ

পায় সীতা তা অনুমান ক'রে উঠতে পারে না। তবে তার স্থির বিশ্বাস অনেক জন্মের পাপ না থাকলে এমন শাস্তি কখনই হয় না মানুষের। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সীতার প্রার্থনা নতুন বাণীতে বাহিত হয়, হে ভগবান, শাস্তি তো কম দিলে না তুমি এবার মুক্তি দাও। রক্ষা কর। এতগুলো প্রাণী ভাসতে ভাসতে অকূল পাথারে এসে পড়েছে তাও কি তোমার শাস্তির শেষ হবে না ভগবান, হে ভগবান!

একদিন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেল। রোগ নিরাময় হ'ল না। এর মধ্যেই একদিন একজন মহিলা রোগী দেখতে এসে দয়াপরবশ হয়ে নিরঞ্জনের বিছানার সামনে একটি দশপয়সার মুদ্রা ফেলে দিয়ে গেল ভিক্ষাপ্রার্থী ভেবে, আর তারই ফলে সীতার মাথায় বুদ্ধিটা এল। ছেঁড়া শাড়ীটিতে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়ল পথের ওপর। সামনে একটা চট পেতে ছেলেকে রাখাল শুইয়ে। এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না বলে মনের সবটুকু প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করেও সীতা পথের ধারে নীরবে বসে রইল। মানুষের দয়ার জন্যে প্রতীক্ষা ছাড়া কোন পথই নেই। তাই বাঁচার তাগিদে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিতেই হ'ল তাকে জনারণ্যের মধ্যে।

নিরঞ্জন চূড়ান্ত দুর্যোগের দিনেও কখনও দুঃস্বপ্ন দেখে নি যে তার বউকে হাত পাততে হবে পথের ধারে বসে। আজ যখন সে শুয়ে শুয়ে দেখল সীতা ঘোমটায় মুখ ঢেকে হাসপাতালের সিঁড়ির ধারে বসে আছে তখন মনটা মোচড় দিল তার প্রচণ্ড বেদনায়। শেষ পর্যন্ত এও ছিল তার ভাগ্যে! মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বড় শাপ দেয়, তুই ভিক্ষে ক'রবি। আর সেই ভিক্ষেই কিনা তাদের আজ করতে হচ্ছে! করতে হচ্ছে তার বউকে! তার পক্ষে এর চেয়ে গ্লানির আর কি থাকতে পারে? না না এ কখনই সহ্য করা যায় না, ভাবল নিরঞ্জন। পরক্ষণেই ভাবল, সহ্য না করেই বা উপায় কি? এতগুলো প্রাণী বাঁচবে কি খেয়ে? সে নিজে তো অক্ষম হয়ে আছে। কি ভাবে চলবে তার চিকিৎসা? আর একটু সুস্থ হলেই কাজ করতে পারবে, নিরঞ্জন, নিজের সম্বন্ধে ভাবল। তখন আর ভিক্ষা করতে হবে না সীতাকে, করতে দেবে না সে কিছুতেই। আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থই সে হয়ে গেছে আর অল্প দিনের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা ফিরে পাবে; তখন আবার ঘরে ফিরিয়ে দেবে সে সীতাকে। হয়ত সে ঘর নিজের হবে না, তা না হোক তবু আশ্রয় তো সেটা হবে। এমনি ভাবে পথের ধুলোয় গড়িয়ে বেড়াতে তো আর হবে না ছেঁড়া কাগজের মত। আর ওই ছেলেটা! এই বয়সেই ভিক্ষে করতে হচ্ছে ওকে? চাষীর ছেলে হয়ে সে কিনা ভিখারী? তা কখনই হতে পারে না।

বাবা হয়ে ছেলেকে কখনই ভিখারী ক'রে রেখে যেতে পারবে না নিরঞ্জন; জীবন থাকতে নয় বরং তার আগে মৃত্যু হবে ওর। সুস্থ হোক অসুস্থ হোক টাকা রোজগার করতে গিয়েই না হয় সে মরবে তবু তো প্রাণ থাকতে ছেলেটা ভিখারী হয়ে যাবে না, তাকে চোখে দেখে মরতে হবে না যে ছেলেটা ভিক্ষে ক'রছে!

দুপুরবেলা ক'টা পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে এল সীতা। এসেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিরঞ্জন শুয়েছিল তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বউ ভিক্ষে ক'রছে বলে তারাও লজ্জা কম করছে না। কোনক্রমে মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে সে। উঠে বসেই সীতাকে বলল—চুপ চুপ। ভর দুপুরে কাঁদে নাই।

আমি আর পারব না, আর আমি যাব না—দুহাতের পাতায় মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সীতা।

নিরঞ্জন কোন কথা বলল না। কথা সে খুঁজেই পেল না বলবার মত। হঠাৎ তার মনে হ'ল সত্যি যদি না যায় সীতা কেমন করেই বা তাহ'লে চলবে? অনাহারে ক'দিন সম্ভব হবে বেঁচে থাকা? সীতা যদি না যায় তাহলে সে নিজে যাবে? শুধু ছেলেটাকে বসিয়ে দেবে? না থাক। তার চেয়ে বরং সে নিজেই যাবে? কিন্তু সীতার যেটুকু সুবিধে আছে তার নেই। সীতা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে থাকলে কেউ মুখ দেখতে পাবে না লজ্জাও কম হবে অথচ সে সুযোগ নিরঞ্জনের নেই। তাছাড়া মেয়েছেলে দেখে লোকে দয়া ক'রতে পারে তাকে দেখলে কেউ করবে না। তবু যদি সীতা একান্তই না যায় সে-ই যাবে, কি করা যাবে আর। বাঁচতে তো হবে।

সীতা কিছুক্ষণ কাঁদল। কান্না থামল। বসেই রইল সে। নিরঞ্জন বলল—দুটো চাল ফুটিয়ে নে বউ। ওঠ, আগুন জ্বালি।

সীতা তবু উঠল না, ক্ষোভে সে মনে মনে পুড়তে লাগল একটু একটু ক'রে। শরীরে কোন কষ্ট না থাকলেও মনোবেদনার ভারে যেন সারা শরীর ভার হয়ে আছে; সে উঠতে পারছে না, নড়তে পারছে না, চলতে পারছে না।

পেটে খিদের যন্ত্রণা নিরঞ্জনের সমস্ত সুস্থ চিন্তাকে যেন নিঃশেষে মুছে নিল, সে রূঢ় স্বরে বলল—বসে থাকিস নি রান্নার ব্যবস্থা কর। খিদে লেগেছে।

ছেলেটা বুকের কাপড় ধরে টানাটানি করাতে উঠল সীতা। দিনের বেলা চাল ফোটানোর অনেক অসুবিধে। বারান্দায় আগুন জ্বালা যায় না, রাস্তায় যায় না, কি যে করে। তাই চাল কিছু বেশী থাকলে রাত্রেই রোজ ভাত রেঁধে রাখে। দিনের বেলা পান্তা ভাত খায়, আবার সন্ধেবেলা লোক চলাচল কমে গেলে বারান্দার নিচটাতেই নির্দিষ্ট তিনখানা কালো কালো ইট পেতে কুড়িয়ে

জানা কাঠ জ্বালিয়ে মাটির হাঁড়িটাকে চাপিয়ে রান্না সেরে নেয় সারা দিন রাতের মত। যেদিন রাত্রে চাল বেশী না থাকে সেই দিনই হয় বিপদ। পরের দিন ভাত থাকে না, ফলে হয় সারাদিন উপোস নয় দুপুরে চাল যোগাড় ক'রতে পারলে ভাত চড়াতে হয়। পারত পক্ষে সীতা দুপুরবেলা রান্না ক'রতে চায় না। অত ঝঞ্ঝাটের চেয়ে না খাওয়াও ভাল। কিন্তু থাকতে পারে না নিরঞ্জন, ছেলেটাও পারে না। প্রথমজন জীবনে বহু উপোস ক'রেছে রোগী বলে আর পারে না আজকাল, দ্বিতীয়জন শিশু। কাজেই সীতাকে শত অসুবিধে সত্ত্বেও রাঁধবার ব্যবস্থা করতেই হয়।

সীতা ভেবেছিল আর ভিক্ষে করবে না। হ্যাঁ ভিক্ষেই তো ক'রছে সে। কিন্তু বেলা বেশী হলে ইচ্ছে বদলাতে হ'ল। এই মাত্র দুটো ঘণ্টা। এই দুটো ঘণ্টা চোখ কান বুঁজে বসতে পারলেই হয়ত রাত্রে আগুন জ্বালতে পারবে, নইলে পেটে আগুন জ্বলবে প্রতিজনের। এই সময় লোকে রোগী দেখতে আসে, মন চিন্তাক্লিষ্ট এবং উদ্বিগ্ন থাকে, আবার অনেকে কল্যাণ কামনা ক'রেও পয়সা দিয়ে যায় দুএকটা। অনেকে আবার দেয় মন ভাল থাকায়। দু একজন এমন আছে পয়সা দিয়ে সত্ত পুণ্য সঞ্চয় করে তবে ভেতরে ঢোকে। তাছাড়া এই বিকেলটাতেই যা মানুষের আনাগোনা। এই সময় বসলে হয়ত বেশ কিছু মিলে যেতেও পারে। এমনও তো হতে পারে কোন ভাল লোক হঠাৎ একটা টাকা···

নাঃ তেমন কেউ দেবে না। ওরকম লোক কখনই থাকে না। কেবলমাত্র পাগল ছাড়া কেউ এরকম ভাবে ভিক্ষে দেবে না। একটা টাকা পেয়ে গেলে আর বসবে না। সত্যিই কি এমন লোক হয় না যে একটা পুরো টাকা ভিক্ষে দিতে পারে? যদি সে লোক খুব ভাল হয় এবং এসে খবর পায় তার রোগী সুস্থ আছে অমুক দিন ছাড়া পাবে তাহ'লেও কি খুশী হয়ে একটা টাকা দিতে পারে না? নেতিবাচক ভাবনা ভাবতে ভাল লাগল না বলে সীতা ভাবল আছে এবং দিলে হয়ত দিতেও পারে। অন্তত পঞ্চাশ পয়সার একটা মুদ্রাও তো দিতে পারে। তা হ'লেও তার প্রয়োজনের অর্ধেক হয়ে যাবে। বাকী অর্ধেক······বসাই মনস্থ ক'রত সীতা।

পরের দিন প্রত্যুষেই হঠাৎ ডাক্তাররা ছোটাছুটি সুরু ক'রে দিলেন। কি হ'ল, নিরঞ্জন ভাবতে চেষ্টা ক'রল, তবে কি আজ অনেকগুলি রোগী মারা গেছে? তাই বা এমন ছোটাছুটি হবে কেন? রোজ তো কত লোকই মারা যাচ্ছে কখনও তো ডাক্তাররা এমন দৌড়াদৌড়ি করে না হাসপাতালে! কি হ'ল তবে? নিরঞ্জন ভাবতে চেষ্টা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাসপাতালের দারোয়ান এসে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে কুটুম্ব সম্বোধন ক'রে হুঙ্কার ছাড়ল।

অকস্মাৎ এমন রূঢ় ভাষণের অর্থ বুঝল 'না নিরঞ্জন। তাতে আবার হিন্দী ভাষায় বক্তব্য পেশ করেছে দারোয়ান—নিজের মাতৃভাষায়, যা নিরঞ্জন একে-বারেই বোঝে না। ভাষা না বুঝলেও ভয় পেতে কোন বাধা ছিল না এবং নিরঞ্জন তা পেল। দারোয়ানকে এর আগে নিরঞ্জন খুব কমদিনই দেখেছে, যে ক'বার দেখেছে কোনবারই এমন উগ্র মনে হয়নি লোকটাকে। অথচ আজ এসেই জানাল, এই জায়গা ভিখারীদের জন্যে নয় অতএব এখনই যেন বিদায় হয় ওরা। তাছাড়া দারোয়ান জিনিষপত্র সরাবার নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কারও অপেক্ষা না ক'রে নিজেই পদাঘাতের দ্বারা যতটা পারল ফেলে দিল বারন্দা থেকে। চারিদিকে ছিটকে গেল সীতার খণ্ড সংসারের সামগ্রী। মাটির ভাতের হাঁড়িটা দেওয়ালে লেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, নোংরা ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ছিটকে পড়ল নিচে। ভাঙ্গা কলায়ের থালাটা গরুর গাড়ীর চাকার মত গড়াতে গড়াতে বেশ কিছুদূর গিয়ে পড়ে যেতে শব্দের মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত হল মাত্র।

অদৃশ্যপূর্ব ঘটনার উত্তেজনার জন্যে অজানা আতঙ্কে সীতা স্থির হয়ে বসেছিল কাঠের মত। মুখ দিয়ে বাক্য সরা তো দূরের কথা হাত পা পর্যন্ত নাড়তে সে ভয় পাচ্ছিল। ব্যাপার দেখে নিরঞ্জন হতভম্ব হয়ে গেল। এই ভোরবেলা দারোয়ানজীর এত দাপটের কারণ সে কিছুতেই অনুমান করতে পারল না। ফলে দারোয়ানের মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকল। দারোয়ান নিজের মাতৃভাষায় নিরঞ্জনকে কষে ধমক দিয়ে বলল—দেখছ কি তাকিয়ে তাকিয়ে? হঠাও মালপত্তর।—বলে নিজে নিজেই বলে চলল, একেবারে ভিখিরীশালা বানিয়ে তুলেছে—।

নিরঞ্জন বোকার মত প্রশ্ন করল—আচ্ছা দারোয়ানজী, কোনদিন তো তুমি তাড়াওনি আজই বা এমন রাগলে কেন?

রাগলে কেন—মুখ ভেংচে দারোয়ান বলল—জামাই এসেছে শালারা।

আবার একটা লাথি মারল দারোয়ান; টিনের কয়েকটা কৌটো ছিটকে পড়ল নিচে রাস্তায়। ছোট একটা টিনের বিকৃতমূর্তি সুটকেশ ছিল যেটা বিচিত্র শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সীতা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিল হাতের কাছের জিনিষগুলো।

ভাগো ভাগো সব। হটাও ঝামেলা—দারোয়ান চেঁচিয়ে উঠল। পুনরায় জানাল—এখানে থাকা চলবে না সব পালাও না হলে মেরে তাড়ানো হবে। সব জিনিষ নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হ'বে নদীতে।

সীতা এতক্ষণে কথা বলল স্বামীর ব্যর্থতা দেখে—আমরা তো বাবা এক কোণে পড়ে থাকতেছি। মানুষটার চিকিচ্ছের তরে আছি; ক'দিন বাদেই তো

চলে যাব এখানে কি আর থাকব ?

থাকব না তো আজই চলিয়ে যাও—দয়া পরবশ হয়ে বাংলা ভাষায় সীতাকে বলল দারোয়ান। আরও জানাল, ক'লকাতা থেকে বড় সাহেবরা আসবে হাসপাতাল দেখতে, কাজেই সব পরিষ্কার করা হবে।

শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল বাস এখান থেকে গোটাতেই হবে। আজ এরা কিছুতেই থাকতে দেবে না। এখানে বেশ ছিল আবার কোথায় যাবে, কোথায় যে থাকবে তারই ঠিক নেই। আর কোথাও এমন থাকবার জায়গা আছে বলেও তো মনে হয় না। অথচ এখানে না থাকলে চিকিৎসাও তো হবে না। এতদিন চিকিৎসা করাতে একটু যেন রোগটা কমেছিল…একটুই বা বলে কেন অনেক আরাম হয়েছে, নিরঞ্জন ভাবল। মনে হয় আর অল্প কিছুদিন চিকিৎসা হলেই সে সেরে যাবে। এই ক'দিন থাকার জন্যে একটা আশ্রয়স্থল যোগাড় করে নিতে হবে। দারোয়ান আর একঘণ্টাও থাকতে দেবে না বলে গেছে ফিরে এসে যদি ওদের এখানে দেখে তো সবই ফেলে দেবে ছুঁড়ে। বিশ্বাস নেই লোকটাকে, যা রাগী লোক। কাঁদো কাঁদো ছেলেটাকে সীতা কোলে ক'রে বসেছিল নিরঞ্জন তাকেই বলল—নে বউ জিনিষগুলো গুছিয়ে নে। চল অন্য কোথাও যাই।

কোথায় যাবে—সীতা জানতে চাইল।

চল দেখি কোথাও থাকা যায় কিনা।

সীতার কান্না পাচ্ছিল। অনেক প্রয়াসে সে নিজেকে সংযত করে বসেছিল ছেলেকে কোলে নিয়ে ; এবার আর সহ্য করতে না পেরে বলল—কোথায় তোমার জন্যি রাজবাড়ী বাইনে রেখেছে শুনি ?

মুহূর্তের মধ্যে নিরঞ্জনের মাথায় খুন চাপল সীতার কথাটা শুনে। সে ক্রুদ্ধ কেউটের চোখে তাকাল সীতার দিকে। সীতা একটু ঘাবড়ে গেল কিন্তু রাগ তার কিছুমাত্র কমল না। ছেলেটাকে ধপ করে বসিয়ে দিয়ে কাঁথা বালিশ গুছিয়ে নিতে লাগল নিঃশব্দে, মনে মনে গুমরোতে গুমরোতে। নিরঞ্জন উঠে গিয়ে রাস্তার ওপর থেকে টিনের কৌটোগুলো তুলে আনল। ভেঙ্গে যাওয়া হাঁড়িটার জন্যে অনুশোচনা করতে লাগল সীতা। কিসে যে এখন রান্না ক'রবে এই ভাবনাতেই বিমর্ষ হ'ল। সমাজের নিম্নতম অর্থনৈতিক অবস্থার কল্যাণে অপমানের সঙ্গে নিত্য বাস ক'রে অপমানবোধ তাদের একেবারেই বিলুপ্ত বলে কেবল লোকসান ব্যতিরেকে দুঃখ হয় না কখনই। কাজেই জিনিষপত্রের লোকসানের জন্যই বিচলিত হ'ল সীতা, নিরঞ্জনও। রাস্তায় নেমে নিরঞ্জন দেখল একটা কৌটো গিয়ে পড়েছে নর্দমার মধ্যে। তাকিয়ে দেখল কৌটোটার মধ্যে চাল রাখত সীতা। যা চাল ছিল সবই কাদ

খরচ হয়ে গেছে, সুতরাং কৌটোটাকে আর নর্দমা থেকে তুলবে কি না ভাবল।
নাঃ অত পাঁকের মধ্যে থেকে না নেওয়াই ভাল।

জিনিষপত্র গোছানো শেষ করেই নিরঞ্জন ভাবল কোথায় যাবে তারা এবার। এতক্ষণ যে চিন্তায় সীতা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল সেই কথাটিই মাথায় এল নিরঞ্জনের। তাই তো, কোথায় যাওয়া যায়! কলকাতা। কিন্তু···হাতে পয়সা নেই একটাও, কেমন করে পৌছোবে ওরা কলকাতায়? ছেলেটার ভাড়া হাতে পায়ে ধরে বাঁচাতে পারলেও ওদের দুজনের ভাড়া জোগাবে কে? কোথায় পাবে অত পয়সা?

হাসপাতালের দারোয়ানকে দূর থেকে আসতে দেখে সীতা সভয়ে বলল—চুপ ক'রে কি অত ভাবতেছ?

ভাবতিছি—নিরঞ্জন জানাল—কোথা যাব?

ব্যাগ্রভাবে সীতা বলল, যিথানে হোক চল। মড়াটা আবার আসতেছে!

একটু আগে যাওয়া সম্বন্ধে সীতার যা ধারণা ছিল দারোয়ানের দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে গেল। বরং তার মনে হ'ল এত বড় পৃথিবীটার কোথাও কি জায়গা পাবে না তারা? কোথাও কি মাথা গুঁজে থাকতে পারবে না? এর চেয়ে হয়ত খারাপই হবে তবু এখানে আর নয়।...দারোয়ানটাকে এদিকে আসতে দেখে পুঁটলিটা হাতে তুলে নিল সীতা, বোঝাতে চাইল যে যাবার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়েছে যেন আর তাড়া দেওয়া না হয়। নিরনঞ্জকে তাড়া দিয়ে বলল—চল চল একটু তাগাদা কর।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের চারিদিক চক্কর দেওয়া শেষ ক'রে দারোয়ান ওদের কাছে পৌছে গেছে, সামনাসামনি এসেই ধমক দিল—ক্যা রে? তারপর মাতৃভাষায় কিছু অশ্লীল সম্বোধন ক'রে বলল এখনও তারা যায়নি, এখানে বসে আছে?

নিরঞ্জনের ছেলেটা একলা বসেছিল বাপ-মার কাছ ছেড়ে। দারোয়ানের ধমক শুনে তার দিকে চেয়ে কেঁদে উঠল। নিরঞ্জন বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল—দেখছ তো যেতেছি আবার কেন অমন করে তাড়তেছ বাবা?

ওদের বিছানা ও পুঁটলির দিকে তাকিয়ে লোকটি কিছুটা থুথু ফেলে বলল—শালারা সব একদম গান্ধা ক'রে দিয়েছে।

বক্তব্য না বুঝলেও সীতা বুঝতে পারল বহুপরিচিত গালাগালিটি তাদের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত। সম্বোধনটিতে যতই মাধুর্য থাক না কেন অনর্থক এমন সম্বোধনে বিরক্ত হ'ল সীতা। কিন্তু যেভাবে এ বিরক্তি প্রকাশ ক'রলে যথাযথ হ'ত তা করা সম্ভব না হওয়ায় চুপ ক'রে সহ্য ক'রে গেল সে। কেবল শরীরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ডানহাতে পুঁটলিটা ঝুলিয়ে নিয়ে বলল—চল যাই।

এত বড় সহরে দেখেছে তার মত লোকের থাকবার জায়গা আর দ্বিতীয় নেই যে জন্যে তার সব খুইয়ে এখানে আসা সেই কাজই যদি না হয় তাহলে কেন বা এল সে ? আর মাত্র কয়েকটি দিন যদি এখানে থাকতে দিত তাহলেও হত।

নিরঞ্জন শুনেছে বটে কলকাতা থেকে কে আসবে, সে জন্যে তাদের কেন তাড়াবে এটা সে বুঝতে পারে না। হাসপাতালের বড় সাহেব আসার সঙ্গে কি সম্পর্ক তাদের ? আসলে ওই ব্যাটা দারোয়ানের বদমায়েশি। কিছু নেবার মতলব ছিল সেটা দেওয়া হয়নি তাই, তা সে কথা আগে বলে রাখলেই হোত, অযথা এভাবে তাদের ওপর অত্যাচার ক'রে কি লাভ পেল ব্যাটা ? হাসপাতালের সামনে ফলওয়ালাগুলোর কাছ থেকে যেমন তাদের বসতে দেবার বদলে রোজ পয়সা নেয় তেমনই তার কাছেও নেবার মতলবে ছিল। চেষ্টা করবে নাকি বলে ? পরক্ষণেই মনে হ'ল কত যে চাইবে কে জানে। তার কাছে তো পয়সাও নেই। কি দেবে দারোয়ানকে ? বলবে পরে দেবে ? তাতে শুনবে না সে। তবে ? পয়সা থাকলে না হয় বলে দেখা যেত এখন আর কোন ভাবেই চেষ্টা করা চলে না। কি আর করা যাবে, ভাগ্যের ওপর তো আর হাত নেই !

ওদিকে সীতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আর এক মুহূর্তও নয়। যা হবে হোক, এমন ভাবে গালাগালি খাওয়ার চেয়ে চলে যাওয়া অনেক ভাল। থাকার জায়গা যদি একান্তই না থাকে হাঁটবার পথ তো আর ফুরিয়ে যায় নি ? না হয় শেষ পর্যন্ত হাঁটতেই থাকবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর হাঁটতে হাঁটতে মানুষের পায়ের জুতোর মত ক্ষয় করে ফেলবে জীবনটাকে। এমনিভাবে কুকুর শিয়ালের মত তাড়া খেয়ে বাস করার চেয়ে সে অনেক ভাল। সীতার মনে আছে একদিন তার ঘরের সদ্য নিকোনো উঠোনে একটা কুকুর এসে ওঠায় তাকে ঠিক এমনি ভাবেই তাড়িয়েছিল আজ যেমন ভাবে তাদের তাড়াল হাসপাতালের দারোয়ানটা। মানুষে আর কুকুরে তাহলে কি তফাৎ ?

বিছানাটা বগলদাবা করে উঠে দাঁড়াল নিরঞ্জন, রওনা হবে। কোথায় জানে না তবে মোটামুটি লক্ষ্য কলকাতা, যে কলকাতা ফটিক দত্তকে নবজীবন দিতে পারে, যে কলকাতায় যতেক অসম্ভব সম্ভব হয় বলে সবাই শুনেছে। সেখানে পৌছতে পারলে সে হয়ত আবার নতুন ক'রে জীবন গড়ে তুলতে পারবে। সীতার এই সবহারানোর নিঃশ্বাস আবার ভরে উঠবে জীবনের প্রতি বিশ্বাসে। আর তার নিজের দেহের রোগ, আশায় বুক বাঁধল নিরঞ্জন, কলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার কত হাসপাতাল সেখানে কি হবে না তার চিকিৎসা এখানকার চেয়ে ভালই হয়ত হবে। এখানকার হাসপাতালের

কাগজগুলো দেখলেই সেখানের হাসপাতালে সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। তাদের নৌসের আলির তো এমন হয়েছিল। কলকাতার হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করিয়ে সেরে বাড়ী গিয়ে তো সেই গল্পই ক'রেছিল নৌসের। কাজেই সে-ও তেমনি ক'রবে। কলকাতার হাসপাতালে গিয়ে টিকিট নিয়ে দাঁড়াবে।

ক্রমাগত ভুগে কেমন একটা নৈরাশ্য জন্মে গেছে, মাঝে মাঝেই মনে হয় ডাক্তারে আর কি করবে, এ রোগ তার কোনদিনই সারবে না। সারবার হ'লে এতদিনে সেরেই যেত। এত ডাক্তার তো দেখল ওষুধ তো আর কম খেল না, তবু যখন সারে নি এজন্মে আর সারবে না। এমনি ক'রে রোগের সঙ্গে লড়তে লড়তে আয়ু ফুরিয়ে যাবে একদিন। ভাবতে গিয়ে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। মৃত্যুর কথা মনে হলে নিদারুণ বেদনাময় শূন্যতায় মন ভরে যায়। এই শূন্যতার ভাষা পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না নিরঞ্জন। আগে কখনও কখনও সে ভাবাবেগে প্রণোদিত হয়ে ভেবেছে এ রকম জীবন থাকার চেয়ে তার পক্ষে মরে যাওয়াই ভাল। আবার যখন সত্যিই মৃত্যুর কথা মনে হয় তখন পৃথিবীর প্রতি গভীর মায়া তাকে একা নিজের ক'রে ঘিরে ধরে।

মনের মহাশূন্যে মেঘের মতই ভাবনাগুলো উড়ে চলে। কখনও সে মেঘ বর্ষণের সম্ভাবনায় ধূসর কখনও হালকা সাদা। নিরঞ্জন চলে, তার মন তাকে যেমনভাবে নিয়ে চলে তেমনি ভাবেই এগোতে থাকে সে। কিছুক্ষণের বেদনায় সে কালো মেঘের কালকে অতিক্রম করে। আবার পথ চলে, যে পথ তাকে প্রদর্শন করে আশার সম্মোহ।

যেভাবে নিরঞ্জন হাঁটছে এভাবে চললে কোনদিনই কলকাতা পৌছানো যাবে কিনা সেই কথাটাই অসহিষ্ণু সীতা জানতে চাইল। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্য জেলেছে অনন্ততাপ। পায়ের তলায় পথ জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে আছে যেন। এত মাঠেঘাটে বেড়িয়েছে সীতা কখন কোথাও এত কষ্টকর মনে হয়নি। পায়ের তলায় সূচের মত টুকরো খোয়া ফুটলেই যেন প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই সময়েই বিরক্তি চরম সীমায় পৌছাচ্ছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করতে নিমেষমাত্র দেরী ক'রছে না। পথ চলতে চলতে এগিয়ে পড়লে থামতে হচ্ছে সীতাকে, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে অপেক্ষা ক'রে সঙ্গী ক'রে নিতে হচ্ছে নিরঞ্জনকে। তবে খুব কম সময়ই সীতা নিরঞ্জনকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে। পথের অবস্থা চলবার ব্যাপারে কারও সঙ্গেই বিশেষ সহযোগিতা না করার ফলে বাধ্য হয়েই ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে।

সরিষা পর্যন্ত পৌছোতেই পথে দুবার বিশ্রাম নিতে হ'ল দুজায়গায়। তবু যখন সরিষায় এসে পৌছাল মনে হ'ল শরীরে এক রতি শক্তিও আর অবশিষ্ট

নেই। কোমরের একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক দিচ্ছে তার দেহ। পা দুখানা মনে হচ্ছে কোন কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারে রসুল আলীর মাংসর দোকানের সামনে বসে পরমতৃপ্তিতে যেভাবে ফেলে দেওয়া কান চিবোয় দেহের লোমওঠা কুকুর ঠিক তেমনিভাবেই যেন চিবোচ্ছে তার পা দুখানা। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলেই বুঝি ধপাস ক'রে তার দেহটা পড়ে যাবে। —একটু জল খাব—কাতরকণ্ঠে নিরঞ্জন বলল।

সীতাও সরষে বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোলে ছেলে আর মাথায় বোঝা নিয়ে কি সে নিজেই চলতে পারছে? যদিও হালকা তবু বোঝা তো বোঝাই। ছেলেটাও একটু হাঁটছে কি না হাঁটছে কোলে চড়ছে। মাঝে দু এক থাপ্পড় খেয়েও কোলে উঠতে ছাড়ে নি। এতবড় একটা ছেলেকে কোলে নিয়ে কি হাঁটা যায়! ছেলেটা রুগ্ন কিন্তু বয়সের ওজন যাবে কোথায়? একটু জিরানোর জন্য সীতাও একবারে দেয়াল ঠেসে বসে পড়ল। ছেলে তার দেহ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অকারণে কান্না জুড়ে দিতেই বিরক্ত হ'য়ে উঠল সীতা। মুখিয়ে উঠল—কাঁদিস কেন শুধু শুধু?

মুখে কোন কথা না বলে ছেলেটি নাকী সুরে কেঁদেই চলল অনবরত।

সীতার বিরক্তি মাত্রা ছাড়াতে চলল। —শুধু শুধুই কেঁদে চলেছে এই আপদটা—মনে মনে একবার আউড়ে নিল সীতা। এই ঘ্যান-ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। সব সময় ছোঁড়াটা এই রকম বিরক্ত করে—একবার যদি চুপ ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে থাকত! সারাটা পথ এমনি ক'রে জ্বালাতে জ্বালাতে এসেছে সীতাকে। ইচ্ছে করে এক আছাড় মেরে ওকে থামিয়ে দেয়। একে নিজের মনে শান্তি নেই তার ওপর কেউ এরকম ক'রলে চলে? বিরক্তিতে এবং রাগে সীতা প্রশ্ন পর্যন্ত ক'রল না কেন কাঁদছে। ছেলেটা আমআঁঠির ভেঁপুর মত শব্দে কেঁদেই চলল ওর মায়ের দেহে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সামনে দিয়ে একজন লোককে হেঁটে যেতে দেখে সীতা চট ক'রে ডান হাতটা পেতে ফেলল কিছু প্রাপ্তির প্রার্থনায়। লোকটি একবার সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। সীতা ব্যর্থ হাতটি গুটিয়ে নিয়ে ছেলেকে বলল—পয়সা চাইতে পারলি নি?

ছেলেটি একটা নেতিবাচক শব্দ ক'রে এতক্ষণের ম্লান কণ্ঠস্বরেই কিঞ্চিৎ শব্দ যোজনা ক'রে পরিবেশটাকে জীইয়ে রাখল। সীতা বলল, ওই লোকটা আসতেছে মুড়ি খাবার পয়সা মেগে নে।

ছেলেটি তাকিয়ে দেখল একজন লোক এইদিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতেই ছেলেটা কান্না থামিয়ে তার কাছাকাছি ছুটে গিয়ে বলল—দুটো পয়সা দাওনা বাবু মুড়ি খাব। লোকটি ওর কথা গ্রাহ্য না করে চলে গেল

দেখে মায়ের কাছে ফিরে এসে দাপিয়ে দাপিয়ে কাঁদতে লাগল অনুনাসিক স্বরে। সীতা বলল—একবার চাইলে কখনও দেয় ? আরও চাইলিনি কেন ?

পাইলে গেল যে—

পাইলে গেল তা কি হ'ল ? সঙ্গে সঙ্গে এট্টু গেলিনি কেন ?

না তুমি মুড়ি কিনে দাও—বায়না ধরল ছেলেটি।

পয়সা না পেলে কি দিয়ে কিনব ? ওই দেখ আসতেছে। চা এবার।

আর একজন পথিককে দেখে ছুটল ছেলেটি তার পেছন পেছন। এতক্ষণ যে স্বরে কাঁদছিল ঠিক সেই স্বরে মুড়ি খাবার পয়সার আবেদন জানাতে লাগল। লোকটি এরকম ক্ষুদ্র ভিখারী দেখে বেশ বিস্মিত হ'ল। কারণ এমন চলমান ভিখারী এখানে দেখা যায় না। এই বয়সের ছেলে তো নয়ই। তাই থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ক'রল, কোন গাঁয়ে বাড়ী তোর ?

ছেলেটি কোন জবাব দিল না।

কি নাম তোর ?

জবাব দিল না ছেলেটি।

লোকটি ভাবতে চেষ্টা ক'রল এই গ্রামেরই কোন লোকের দুষ্টু ছেলে হবে হয়ত। তাই বাপের কাছে নালিশ করবার জন্য জানতে চাইল—তোর বাপের নাম কি ?

এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে একটু হকচকিয়ে গেল ছেলেটি। তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুড়ি খাবার পয়সার আশায়। কিন্তু কড়া প্রশ্নগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সে পয়সা চাইতে ভুলেই গেল। এ অবস্থায় কি ক'রতে হয় শেখে নি এখনও। কাজেই সে সরে যেতে পারল না, কিছু বলতেও পারল না। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ ভয়ের ছায়া পড়ল তার চোখে। চলমান লোকটি সামান্যই অপেক্ষা ক'রল প্রশ্ন ক'টি উত্থাপন ক'রতে, তারপর আগের মতই চলে গেল নিজের পথে।

ম্লানমুখে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে ফিরে গেল। এবার কিন্তু সে কাঁদল না, বায়না ধরল না মুড়ির জন্যে। ভাবগতিক দেখে সীতাই প্রশ্ন ক'রল—কি রে ? দিল নি ?

নেতিবাচক মাথা নাড়ল ছেলেটি নিঃশব্দে। সীতা অনুভব ক'রল সত্যিই ওর জন্যে কিছু খাবার জোগাড় করা প্রয়োজন। ওইটুকু ছেলে, ও কি ক্ষিদে সহ্য ক'রতে পারে ? কিন্তু ক'রবে কি ক'রে ? নিরুপায়ভাবে তাকাল চার দিকে। ওর বাবা যে সেই জল খেতে কোনদিকে গেল আর তো ফিরছে না! গেল কোথায় এতক্ষণ ? নিরঞ্জনের জন্যেও ভাবনা হ'ল সীতার—কোথাও গিয়ে বাবার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে নি তো ?

নিরঞ্জনের ভাবনা যেন সাময়িকভাবে ছেলের ক্ষিধের ভাবনাকে ছাপিয়ে

উঠতে চাইল। একান্ত অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কি করা যায় সীতা ভাবতে লাগল। এ গ্রামের কিছুই চেনা নেই তার, কোথায় সে খুঁজতে যাবে নিরঞ্জনকে? একবার মনে হ'ল নিরঞ্জন হয়ত রাতের আস্তানা খুঁজতে গেছে। রাতটুকু কাটাবার একটা জায়গা তো জোগাড় করতেই হবে। যেখানেই গিয়ে থাক চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা ছাড়া সীতা আর কিছুই ক'রতে পারল না।

মাগ রে মাগ—একজন লোককে আসতে দেখে সীতা ছেলেকে শিখিয়ে দিল —ওই লোকটার কাছে পয়সা মাগ।

ছেলে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন ক'রল না। কাজেই সীতা নিজেই ঘোমটা মুখের ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে চাইল—বাবা দুটো পয়সা দাও বাবা। অসুখ ছেলেটার খাবার জন্য দুটো পয়সা দাও বাবা।

পথিকটি দাঁড়াল না চলতে চলতে সীতার দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। ছেলেটির দুই চোখ চকচক ক'রে উঠল পয়সা দেখে কিন্তু সীতা যেহেতু মুদ্রা চেনে মোটেই আশান্বিত হ'ল না। কেবল শুধ্ ছেলে ভোলাবার জন্য পয়সাটা তার হাতেই দিল।

আরও কিছুক্ষণ বাদে নিরঞ্জন কোঁচড়ে করে কিছু মুড়ি নিয়ে এসে হাজির হ'ল। সীতা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে মুড়িগুলো ঢেলে নিল কলাই উঠে যাওয়া টিনের থালায়। ছেলেটা মুহূর্তও দ্বিধা না ক'রে সেই মুড়ির থালায় ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

নিরঞ্জন একপাশে বসে রইল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে, তার শরীর আর চলছে না। প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছিল বলেই জলের সন্ধানে যেতে হয়েছিল তাকে। দুটো মুড়ি অনেক চেয়ে চিন্তে আদায় ক'রেছে এক বাড়ীতে এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে। এখনও একবার বেরোন উচিত চালের সন্ধানে নইলে রাত্রে খাবে কি? কিন্তু দেহ আর চলছে না। মনে হচ্ছে শুতে পারলে বাঁচত। ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলছে ঠিকই কিন্তু তারও চেয়ে তীব্র যে অনুভূতি তা ক্লান্তি। কাজেই উঠবে না নিরঞ্জন তাতে যা হবার হোক।

সীতা মুড়িতে হাত দিতেই ছেলেটা থালা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল। সীতার চোখে উষ্ণতা ফুটে উঠে ছেলেটাকে ভৎসনা ক'রতে চেষ্টা ক'রলেও সে মায়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাধ্যাতীত গোগ্রাসে মুড়ি চিবোতে লাগল। যেন জন্মের খাওয়া খাচ্ছে, সীতা মনে মনে বলল, হ'ল হ্যাংলামির জন্যে একচড় বসিয়ে দেয় ছোঁড়াটার মুখে। মায়ের দিকে তাকাবার অবসর নেই ছেলেটির, পরম তৃপ্তিতে সে তখনও মুড়ি চিবোনোয় ব্যস্ত।

মুড়ি ক'টা মুখে দিয়ে সীতা দেখল নিরঞ্জন গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরের মানুষ হিসেবে কোন দুঃস্থের প্রতি মানুষের যেমন সহানুভূতি হয় তেমনই জাগল সীতার মনে নিরঞ্জনকে দেখে। বেচারীর ঘুমটা না ভাঙিয়ে রাত্রের আহার্যের সন্ধানে সীতা ছেলেটিকে নিয়ে এগিয়ে চলল। রাতটুকু বিশ্রাম ক'রে ভোরে উঠে আবার চলতে সুরু ক'রতে হবে। দিনের খাবার জুটবে এমন সম্ভাবনা কম তাই রাত্রে দুটো ভাতের ব্যবস্থা ক'রতেই হবে সীতা স্থির ক'রল।

কিন্তু সীতার স্থির করাতে কোথাও কোন পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব বলে সেদিন রাত্রে ভাত জুটল না সরষেয়। পরের দিন শিবানীপুরে এসে পৌছে আবার ঠিক ক'রল খাবার ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে। খাদ্যের পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হ'তে হ'তে সামান্য সামান্য খেয়ে দেহ ধারণ ক'রে চতুর্থদিন মাঝের হাট সাঁকোর সামনে দাঁড়াল নিরঞ্জন। ক'লকাতা চত্বরে পৌছেছে তারা অনেকক্ষণই তবু যেন মন ওঠে নি তাদের। যে স্বপ্নপুরীর গল্প শুনে এতদূরে আসা তার সঙ্গে যেন সঙ্গতি থাকে নি বেহালার নোনাধরা ইটের। সাবেক কালের উঁচু-নীচু বাড়ীগুলোর। তারও আগে বড়িশা আর ঠাকুরপুকুরের নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত জনপদ দেখেও মন ভরে নি নিরঞ্জনের। নতুন নতুন বাড়ী-গুলোয় ডায়মণ্ড হারবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য পেয়েছে খুঁজে ; ফলে আরও চলতে হয়েছে তাকে আসল ক'লকাতার কাছে—যেখানে, সে শুনেছে, টাকা ওড়ে বাতাসে, যেখানে মরা মানুষ জীবন্ত হতে পারে। কিন্তু সেই যক্ষপুরীর পথ যে এমন কদর্য হবে তা কে জানত ? রাস্তা কোথাও ভাঙ্গা কোথাও জল জমে আছে। দুপাশে আবর্জনার তো আর অন্ত নেই। সখের বাজার থেকে সেই যে আরম্ভ হয়েছে কোথাও পরিষ্কার বলতে নেই। রাস্তা যেখানে চওড়া সেখানেই হয় একপাশে ভাঙা জিনিষপত্র জড় করে রেখেছে কেউ নইলে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া গাড়ী পড়ে পড়ে ধুলোয় মিশে যাবার জন্য প্রতীক্ষা ক'রছে আর তারই সঙ্গে রয়েছে কোথাও রাশীকৃত পাথরকুচি কোথাও স্তূপীকৃত জঞ্জাল। কলকাতার একটা বর্ণও তো মিলছে না কোথাও ! কেবল অসংখ্য দ্রুতধাবমান গাড়ীতে সমাকীর্ণ পথে মানুষ চলবার উপায় নেই বললেই চলে। অতি দক্ষ চালকদের সম্বন্ধে সবিস্ময় অনুমান সত্ত্বেও ব্যস্তপথে অতি ধীরে চলতে হচ্ছিল তাদের। বেহালা বাজারে পৌছে নিরঞ্জন অনুভব ক'রল পেটের কাছে ফাঁকিবাজীটা ধরা পড়ে গেছে। বাজারের সামনেই একটা ফলের দোকানে নানাবিধ ফল ঝুলছে ভারে ভারে। একমাত্র কলা ছাড়া আর একটা ফলও পরিচিত মনে হল না তার।

মন অনেক সময় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়। কারণ বর্ণময় ফলগুলো ঝুলতে দেখে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব ক'রল না নিরঞ্জন, কিন্তু তারই সংলগ্ন

মুড়ি মুড়কির দোকানটাকে সে কোনমতেই অতিক্রম ক'রতে পারল না। ছেলেটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার মায়ের কাপড় ধরে ক্রমাগত আকর্ষণ ক'রতে লাগল কলা কেনাবার জন্যে। গ্রামের ছেলে হলেও কলা খাবার সৌভাগ্য তার জীবনে খুব বেশী হয়নি। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর সকালে শুকনো মুড়ি পেঁয়াজ দিয়ে খাওয়া ছাড়া আর সবই তাদের কাছে বিলাসের পর্যায়ভুক্ত। তবু দৈবাৎ কখনও দু একবার কলার স্বাদ পেয়েছে সে নিম্নস্তরের, তাও কাঁঠালী কিংবা চাঁপা। আজকের এই দোকানে ঝোলানো কলার সঙ্গে আকারে বর্ণে সেগুলোর তুলনাই চলত না। তাই এই সুন্দরতরের স্বাদের জন্যে রসনা লোলুপ হয়ে উঠল তার।

প্রথমে তার আবেদনকে গ্রাহ্য না ক'রে দমিয়ে দেবার ইচ্ছায় ছিল সীতা। ব্যর্থ হয়ে প্রশ্ন ক'রল—পয়সা কোথা পাব?

ওইটুকু ছেলের অবশ্য পয়সার হিসেব রাখা সম্ভব নয় তবু যেন পয়সার কথা উঠতে একটু দমে গেল। পয়সা না থাকলে জিনিষ পাওয়া যায় না এই সত্য যে বয়সের ছেলের নির্মমভাবে বোঝা উচিত নয় সেই বয়সেও পয়সা পাওয়া যে অত্যন্ত দুরূহ তা সে বুঝেছে। তাই বলে পেটের ক্ষিধে তো আর কোন আপত্তি শুনবে না, সে জন্যেই ছেলেটি প্রস্তাব ক'রল—তবে মুড়ি কিনে দাও।

যা না, দোকানে গিয়ে মেগে নে না—সীতা বুদ্ধি দিল।

দেবে নি—।

যা মাগলেই দেবে।

ছেলেটি নাড়ল না। এই সামান্য দিনের ভিক্ষে করার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে দোকানী দোকানের জিনিষ ভিক্ষে দেয় না। একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয়, জিনিষ নয়। কাজেই সেই অভিজ্ঞতায় সে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনে দিয়ে পথিক চলছে অনেক। সীতা তাকিয়ে দেখল একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন লোকের কাছে ভিক্ষে চাইছে। দেখে তার কেমন যেন লাগল কিন্তু পরক্ষণেই সামনের ভদ্রলোকের বাঁদিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে নিজে থমকে দাঁড়াল ভদ্রলোক, পকেট থেকে একটা পয়সা বের ক'রে নিজের কপালে ছুঁইয়ে আলগোছে সীতার হাতে ফেলে দিল। পয়সাটা পেয়ে সীতা প্রীত হ'ল—এমনি সহজে সবাই একটা ক'রে পয়সাও তো স্বচ্ছন্দেই দিতে পারে। তা কেউ দেয় না। ডায়মণ্ডহারবারে হাসপাতালের সামনে সে বসে থেকে দেখেছে প্রত্যেকের কাছে চাইতে চাইতে কচিৎ কখনও একজন একটা পয়সা দেয়। অনেক নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে হঠাৎ দিয়ে ফেলে। নিরঞ্জনের আশাবাদিতা সম্বন্ধে যতই নিরাশ সে হোক না কেন মধ্যে সে কিন্তু ক'লকাতার সেই জায়গাটার সম্বন্ধে মনে মনে আশা ক'রে ফেলে যে জায়গায় পৌছতে পারলে

ফটিক দত্তর মত টাকা পাওয়া যায়। অনেক টাকা পেয়ে যাবে তারা, আরামে থাকবে দেশে গিয়ে। কাজেই, এই মুহূর্তে সীতা ভাবল, যে ক'দিন সেই জায়গায় না পৌছতে পারা যাচ্ছে সে ক'দিন অন্তত যদি কোন রকমে খরচটা উঠে যায় তবু প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতে পাবে কোনক্রমে।

গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও ওই একটি পয়সা তাকে আশাবাদী ক'রে তুলল। সে ভাবতে পারল আবার জীবনের জন্যে সংগ্রাম ক'রতে পারবে তারা, মৃত্যুর জন্যে ক্ষয়ে চলবে না অবিচ্ছিন্ন প্রতীক্ষায়। পরে অবশ্য অনেক ব্যর্থ প্রার্থনার পর সফলতা কিছু এল তবু কোন সাফল্যই তাকে সেই প্রথম পয়সার মত উৎসাহিত ক'রতে পারল না।

মুড়ির ঠোঙ্গা পেয়ে কলার অভাব দূর হ'ল ছেলেটির। একমুঠো মুড়ি মুখে ফেলে রমনীয় ভঙ্গীতে চিবোতে চিবোতে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তার মা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি মনে ক'রে একটু দূরে সরে গেল। সীতা চোখ ফিরিয়ে নিল। আর একজন আসছে ওই দিক থেকে, সীতা দেখল নিরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে ভিক্ষে চাইল তার কাছে। দিল না লোকটা। লোকটি ক্রমাগত এগিয়ে আসতে লাগল তারই দিকে, সে স্থির ক'রতে পারল না সে-ও চাইবে কি না। প্রতি নিমেষে ভাবল কিন্তু সিদ্ধান্ত ক'রতে পারল না, যে লোকটা নিরঞ্জনকে প্রত্যাখান করেছে সে কখনও আবার ভিক্ষা দিতে পারে কি না। লোকটি যে মুহূর্তে সামনে এসে পড়ল নিজের ইচ্ছার অজ্ঞাতে সীতা হাতটি বাড়িয়ে দিল দান গ্রহণের ভঙ্গীতে। তার শূন্য হাতটির দিকে তাকিয়েও দেখল না লোকটি। ব্যর্থতার দংশনে তার হাত যেন নিমেষে অসাড় হয়ে গেল—অচেতন ক'রে দিল তাকে। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ পেয়ে হাত টেনে নিল সীতা।

এমনিভাবে ব্যর্থতার গুরুভার বয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে এসে মাঝের হাট পুলের দক্ষিণ দিকে প্রথম কলকাতা দেখল সীতা। বাঁ দিকের বিরাট চকচকে বাড়ীটার দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সর্বোচ্চ্য সীমায় পৌছাল। দেখে তার মনে হচ্ছে বাড়ীটা যেন সদ্য তৈরী হয়েছে। মাঠ তো তাদের গ্রামেও আছে কিন্তু তার কোথাও কি এই বাড়ীটার সামনের লোহার বেড়া ঘেরা বাগানের মত সৌন্দর্য আছে? কোথাও গাছে এমন সুন্দর সুন্দর ফুল আছে? পথের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে সে তন্ময় হয়ে গেল। এমন বিরাট বাড়ী কোথাও থাকতে পারে, না এমন সুন্দর বাড়ী হতে পারে তা তার ধারণার অগম্য ছিল। অপ্রয়োজনীয় কৌতুহল ভীড় জমাল তার মনে। নিরঞ্জনের মুগ্ধতাকে লক্ষ ক'রে সে প্রশ্ন ক'রল—কার বাড়ী হবেন গো ইটা?

কার বলবে তা ভেবে পেল না নিরঞ্জন। বাস্তবিকই এই বিরাট সুন্দর বাড়ী

কারই বা হতে পারে ? বিরাট ফটকে চোখ পড়ল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দুজন, কাজেই নিশ্চিন্ত ভাবে বলে ফেলল—রাজার হবেক।

কথাকার রাজা গো—সীতা ছোটবেলায় শোনা রূপকথার গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

কোথাকার আর হবে নিশ্চয়ই কলকাতার রাজা হবে। নিরঞ্জন ভাবল এবং এই কথাটা জানিয়ে দিল সীতাকে। সীতার মত সেও মনে মনে তারিফ ক'রল রাজবাড়ীর, ভাবল, হ্যাঁ কলকাতার রাজবাড়ী এমনি না হলে মানায়! যাই হোক রাজবাড়ীর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি পেট ভরবে ?—চল বউ চল, তাড়া দিল নিরঞ্জন।

একটু এগোতেই পথ রুদ্ধ হ'ল সামনের রাস্তা নূতন ক'রে তৈরী হচ্ছে, রাস্তা তো নয় পুল। বাবা! কি বিরাট পুল পুনর্নিয়র্নীমান মাঝের হাট পুলের দিকে চেয়ে ভাবল নিরঞ্জন। রাস্তাটা অবশ্য বাঁ দিকে ঘুরে চলে গেছে কিন্তু ডানদিকে কত বাড়ী দেখা যাচ্ছে সুন্দর সুন্দর—ওই তবে কলকাতা হবে। কাজেই ডান-দিকে ঢুকে পড়ল ওরা।

বাস্তব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে সে ভাবল বজরঙ্গলালের ইঁট খোলায় কাজ ক'রতে ক'রতে সে দেখেছিল বড় বড় ট্রাক ভর্তি ইঁটগুলো সব কলকাতায় চলে যায়। শুনেছিল অমন বজরঙলাল অনেক আছে। সব ইঁট গিয়ে জমা হয় এক কলকাতাতেই। কথাটার সত্যি মিথ্যে সাম্ভব্যতা বা অসম্ভবতা যাচাই করার কথা মনে হয় নি তার। আজ এই সারি সারি বাড়ী দেখে সে যেন ভাবতেও ভুলে গেল কত বজরঙ্গলাল কলকাতার জন্য ইঁট তৈরী ক'রতে ব্যস্ত আছে চারিদিকে। কিন্তু বাড়ীগুলো দেখে বিশ্বাস করাই শক্ত যে এগুলো ইঁট দিয়ে তৈরী। পাকা বাড়ী তো তাদের গ্রামেও আছে, আছে ডায়মণ্ডহারবারেও সেখানেও বাড়ীগুলো দেখলে বজরঙলালের ইঁটগুলোকে চেনা যায়, আর এখানে ? অভিভূত হবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। এত বাড়ী অথচ মানুষ নেই যে পয়সা চাইবে। আশ্চর্য রকম ফাঁকা। কোন বাড়ীর সামনে একটা হয়ত গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, কোন বাড়ীর সামনে এক আধজন এমনই লোক যারা ভিক্ষে দেয় না। আরও এগিয়ে একটি বাড়ীর সামনে দেখল সুবেশ এক ভদ্রলোক ও অনুরূপ এক মহিলা বেরিয়ে আসছে। সাহস ক'রে তাদের কাছেই হাত বাড়িয়ে দিল নিরঞ্জন, বাবু একটা পয়সা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবু একটা পয়সা দিন দয়া করে।

ভদ্রলোক কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে গেলে সঙ্গীটি কি একটা মন্তব্য ক'রল নিরঞ্জন পরিষ্কার শুনতে পেল না। শুনতে পেল না সীতাও—কিন্তু সেই সুবেশ মহিলাটির মুখভঙ্গী দেখেই সীতা অনুমান ক'রে নিতে পারল যে সুখপ্রদ কোন

কথা বলল না মেয়েটি। তবু বিরক্ত হতে ভুলে গেল সীতা বরং বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সজ্জাবিলাসিনীর দিকে। আর সেই যুগল মূর্তি অপসৃত হবার মুহূর্তে এমন কিছু সুগন্ধ রেখে গেল তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্মৃতিতে যে সীতা সমস্ত ভাবনা বিস্মৃত হ'ল।

নিরঞ্জন তাড়া দিয়ে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল সীতার—দেখতেছিস কি অমন হ্যাঁ ক'রে দাঁয়রে ?

সীতা তাকিয়ে দেখল নিরঞ্জন তাকে ফেলে কিছুটা এগিয়ে গেছে। একটু জোরে পা ফেলে নিরঞ্জনের কাছে পৌছে সীতা বলল—মেয়ে মানুষটার গায়ে কি বাসনা গো— !

ওরা সব বড়লোক ওদের গায়ে এমনি বাস থাকেই। আমাদের কি আর পেট ভরবে তাইতে ?

নিরঞ্জনের ভৎ'সনাটুকু গায়ে মাখল না সীতা, সে তখনও সেই সুবাস আর সুন্দর পোষাকের স্মৃতিতে বিভোর। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। একটা কালো গাড়ী ছুটে আসছে সামনে দিক থেকে সীতা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে টেনে ধরল নিজের কাছে। নিজেও রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গেল।

অনেকটা পথ অর্থহীন পরিক্রমার পর নিরঞ্জন যেন কোনই দিশা পেল না। দেহে কেবল ক্লান্তি জমে উঠেছে অপরিসীম, মনে ব্যর্থতার ভার। চাররাস্তার মোড়ে একটা খালি জমি পড়ে আছে দেখে সেখানে জিনিষপত্র নামিয়ে বসল নিরঞ্জন। সীতারও কোমর থেকে শরীরের নীচের অংশ ব্যথা হয়ে এসেছিল। বসতে পেয়ে সেও যেন বাঁচল। এইভাবে অনিশ্চিত চলা আর তার ভাল লাগছিল না। অথচ সাহস ক'রে কোন কথা নিরঞ্জনকে জিজ্ঞেস ক'রতেও সে পারছিল না। কেমন যেন নিজের কাছে লুকিয়ে যাচ্ছিল সে এবং অনেক অনুভবের মধ্যে বুঝতে পারছে নিরঞ্জন তার কাছে আত্মগোপন ক'রছে। কি ক'রবে কোথায় যাবে তা সে নিজেও এখনও জানে না। নিরঞ্জনের কাছে জিজ্ঞেস করা নিস্ফল বুঝে গন্তব্যের প্রশ্ন ক'রল না সীতা, নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রে চলল স্বামীকে।

দুই

অবশেষে এই আশ্রয়। আশ্রয় মানে কলকাতার নির্জনতা বিলাসী পাড়ায় ঘুরে ব্যর্থতায় মথিত অন্তরে নিরঞ্জন প্রথম আশ্বাস পেল এই বিরাট শিরিশ গাছের তলায়। কেউ পথ চিনিয়ে দেয় নি, কেউ বলেনি কোনদিকে যাওয়া চলতে পারে বা কোথায় গেলে আশ্রয় পাবে তারা। ক্ষুন্নিবৃত্তির টানে আপনি সে চিনেছে পথ, জেনেছে কলকাতা কেবলমাত্র ওই নতুন গড়ে ওঠা সদরবন্ধ বাড়ীর এলাকা নয় কলকাতা বিরাট এবং বহুব্যাপ্ত। তার দূর প্রসারিত দেহে বহু আশ্রয়স্থল আছে নিরঞ্জনের। আরও মনে হয়েছে দোকানপাট আলো মানুষ ব্যস্ততা যখন নেই তখন এ কিছুতেই কলকাতা হতে পারে না। সেখানে নাকি গাড়ী ঘোড়ার দৌরাত্মে মানুষ পথে নামতে পারে না অথচ এখানটায় এসে পড়বার আগে সেকথা শুধু কিংবদন্তীই হয়ে ছিল। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে সে দেখছে যা শুনেছে তা সত্যি। মুহূর্মুহু গাড়ী ছুটছে আর সে কত গাড়ী কত রঙ কত চঙ কে তার হিসাব রাখে। মানুষ যে কত তারই কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু এখানেও ওই বিরাট বাড়ীগুলো পাঁচিলের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে নিজেদের গাম্ভীর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র। এই অত্যুচ্চ পাঁচিলের ওপিঠে কি আছে তা দেখবার জন্যে ঔৎসুক্য নিরঞ্জনের নেই তার শুধু এইটুকুই ভাবনা যে কোন বাড়ীতেই মানুষ দেখা যাচ্ছে না অথচ এত লোক চলছে এই পথে। তবে এই লোক আসছে কোথা থেকে? অথচ তাদের গ্রামের এবং আশেপাশের মানুষের সঙ্গে এই পথচলতি লোকগুলোর পরিচ্ছদগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে বলে একথা অনুমান ক'রতে কোন অসুবিধে হয় না যে এরা শহরবাসী। তবে কোথায় এত লোক থাকছে? সামনে তাহলে আরও সহর আছে—। তা থাক তবু আপাততঃ এইখানেই বিশ্রাম নিতে হবে।

বাঁ দিকে একটা গেট দিয়ে অনেক লোক ঢুকছে। কোথায় নিরঞ্জন বুঝতে পারল না। সামনে অনেকগুলো লোক বাদামভাজা ছোলাভাজা আরও কত রকম খাবার বিক্রী ক'রছে। কয়েকজনকে দেখল ভিজে ছোলা ছোট ছোট ঠোঙায় সাজিয়ে রাখতে। সহরের লোকেরা আবার ছোলা ভিজে খায়! একটা ছোট হলদে রঙের হাতলওয়ালা চাকা গাড়ীতে ক'রে একজন লোক যেন কি বিক্রী ক'রছে। জনসমাগম দেখে নিরঞ্জন ধারণা ক'রে নিল এখানে বসলে দুচারটে পয়সা পাওয়া যেতে পারে। ওই তো এক কোণে দাড়িওয়ালা অন্ধ বুড়োটা একটা চৌখুপি লুঙ্গি পরে বসে বসে ভিক্ষে ক'রছে একটা টিনের মত

মগ হাতে। ওরই পাশে গিয়ে বসবে কিনা নিরঞ্জন ভাবল। কিন্তু ব্যাপারটা সে আদৌ বুঝে উঠতে পারল না। কিসের বাড়ী এটা এবং কেনই যে এত লোক ঢুকছে কিছুই অনুমান ক'রতে পারছে না নিরঞ্জন। স্থানটা কি জানবার জন্যে অনেক বেছে সে একজন লোককে প্রশ্ন ক'রল—সেটা কি হচ্ছে গো মশায়? লোকটি অবিচল দৃষ্টিতে বোবার মত নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইল। এবং নিরঞ্জনও তার দিকে। কিছুক্ষণ ম্লান দৃষ্টি বিনিময়ের শেষে নিরঞ্জন আবার প্রশ্ন ক'রল—কি গো কথা বুঝতেছ নাই?

অদ্ভুত ভাষার কতগুলো এমন শব্দ লোকটি উচ্চারণ ক'রল যার একবর্ণও নিরঞ্জন বুঝল না। নিরঞ্জনের ওই অবস্থা দেখে লোকটি হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা ক'রল যে ওর কথা সে একবর্ণও বুঝছে না। নিরঞ্জন একটু বিরক্ত হ'ল এবং অন্যদিকে সরে গেল।

ভিজেছোলাওয়ালাটি যেন কি বলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। নিরঞ্জন কান পেতে রইল, কি বলছে শুনবে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে বুঝল, সে বলছে চানা নিয়ে যান বাবু ভিনজা চানা। পাখী খাবে বানদর খাবে।

পাখী খাবে, বাঁদর খাবে, নিরঞ্জন বুঝল বাকী শব্দগুলোর অর্থ বুঝল না। কেবল অনুমান ক'রে নিল ছোলা নেবার জন্যেই আহ্বান জানাচ্ছে লোকটি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পাখী খাবে বাঁদর খাবে বলছে কেন? ব্যাপারটা কি? বোঝবার জন্যেই ছোলা বিক্রেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে লোকটা আদৌ প্রসন্ন হয়েছে বলে মনে হ'ল না। তার রক্তিমাভ চোখের জলন্ত দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক পর্যবেক্ষণ ক'রে নিল নিরঞ্জনকে। তারপর কঠিন স্বরে প্রশ্ন ক'রল—ক্যা বে, কি চাই?

প্রশ্নের রুক্ষতায় এবং কণ্ঠের কর্কশতায় একটু থতমত খেয়ে গেল নিরঞ্জন। নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল—এখানকার কি নাম বলে ভাই?

ক্যা পুছতা? প্রশ্ন ক'রল ছোলা বিক্রেতা এবং নিরঞ্জনকে সদ্য গ্রাম থেকে আসা বুঝতে পেরে বাংলা ক'রে আর একবার বলল—কি জিগাইছো?

ইটার নাম কি গাঁ?—নিরঞ্জন প্রতিপ্রশ্ন ক'রল।

ইয়ে চিড়িয়াঘর হ্যায়—জানাল লোকটি।

চিড়িয়াঘর ব্যাপারটা যে কি সেই কথাটাই বুঝতে পারল না নিরঞ্জন ঠিক মত। তবু লোকটি যে শেষ পর্যন্ত তার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে এই জন্যেই লোকটাকে যথেষ্ট ভাল বলে মনে হল, যে ঘরই হোক না কেন বেশ বড় ঘর নিশ্চয়ই হবে। একটু এদিক সেদিক দেখে নিরঞ্জন আবিষ্কার ক'রল তার ছেলেটি বাদাম ভাজাওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাত পেতে কিছু চাইছে না কিন্তু চাইছে দৃষ্টিতে।

নিরঞ্জন আর দেরী না ক'রে লোকের সারির সামনে গিয়ে হাত পেতে যতটা পারল কাতরভাবে আবেদন জানাল—সারাদিন কিছু খাইনি বাবু দয়া ক'রে দুটো পয়সা দাও।

যারা ফিরে তাকাল তাদের অনেকেরই চোখে অবিশ্বাস। আবার কারও বিরক্তির ভ্রূকুটি। তবে প্রায় সকলের দৃষ্টিতেই যেটা সে সাধারণভাবে দেখতে পেল তা অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। তাই সে নিজের কথাটিকে আবার উচ্চারণ ক'রল বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যে। কিন্তু তার সারাদিন না খেতে পাবার জন্যে দয়া ক'রল না কেউ, বরং একজন সুবেশ যুবক স্বগতোক্তি ক'রল—দেহ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে!

নিরঞ্জন শুনল, তার মন প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইলেও সে প্রতিবাদ ক'রতে পারল না। বরং আরও করুণভাবে আবেদন জানাল—একটা পয়সা দেন বাবু! ভগবান আপনাদের রাজা ক'রবেন।

একজন তরুণ এবং তার সঙ্গিনী একটি যুবতী সেই কথা শুনে নিজেদের মধ্যেই নিঃশব্দে হেসে ফেলল। যুবকটি বলল—তোমাকে রাণী করবার জন্যে অন্তত ওকে একটা পয়সা দেওয়া উচিত।

রাজা তুমি আগে হ'য়ো—মেয়েটি মৃদু হাসিতে সুন্দর হয়ে বলল।

আচ্ছা ওর কথা শুনেই যদি ভগবান আমাকে রাজা করবে তো ওকেই ক'রছে না কেন। অতএব মিথ্যাবাদী লোকটাকে পয়সা দেওয়া চলে না।

যুবকটি কথার সুরে এবং ভঙ্গীতে হাস্যরস সৃষ্টির যে চেষ্টা ক'রছিল তা সার্থক হওয়ায় কলকণ্ঠে হেসে উঠল তার সঙ্গিনী। নিরঞ্জন সেই হাসির শব্দ শুনে কেমন ঘাবড়ে গেল এবং একটু দূরে সরে গিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। দেখল মেয়েটি ছেলেটির গায়ের ওপর প্রায় ঢলে পড়েছে, অনেক লোকই সেই দৃশ্য মনযোগ সহকারে দেখছে।

নিরঞ্জন অন্যদিকে গেল। বেশ লম্বা লাইন হয়ে গেছে—লাইনের বিপরীত দিকে চলতে লাগল নিরঞ্জন প্রত্যেকের কাছে পয়সা চাইতে চাইতে। কয়েকটা কনিষ্ঠতম মুদ্রা এখান সেখান থেকে এসে তার হাতে পড়ল। প্রথমটির স্পর্শ পেতেই তার দেহে কেমন শিহরণ জাগল। মনে কি উৎসাহ—নাঃ একটু আগে যেমন মনে হচ্ছিল তেমন হবে না নিশ্চয়ই। ভাল লোকও তো অনেক আছে। ভাল লোকেদের কাছে চাইলেই এমনিভাবে দেবে তারা, কোন কথা না বলেই দেবে। এই যে এতগুলো লোক আছে তাদের অর্ধেক লোকও যদি এমনি ক'রে একটি পয়সা দেয় তাহলেই তাদের খাবার মত পয়সা হয়ে যায়—নিরঞ্জন মনে মনে ভাবল। তারপর সেইভাবেই চেয়ে চলল একের পর এক।

দুপুরের রৌদ্রের তীব্রতম উত্তাপ যখন তাকে ক্লান্ত ক'রে দিল বাঁদিকে

গাছের ছায়ায় ফিরে গেল সে, দেখল সীতা ছেলেকে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ক্লান্তিতে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সম্ভবমত সর্বদেহ ঢেকে ছেলেকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার পাশ-টিতেই বসল নিরঞ্জন। হাতের পয়সাগুলো অতি সন্তর্পনে গুণল, এক-দুই-তিন-চার-ছয়···পঞ্চাশ-একান্ন-তিপান্ন। শেষটি বেশী পয়সার মুদ্রা।

এই তার সামান্য প্রচেষ্টার আয়। তবু মনটা অনেকদিন বাদে প্রফুল্ল হ'ল। হঠাৎ একটা টিয়ার ডাক শুনে ওপর দিকে তাকাল নিরঞ্জন। একটা টিয়া ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে গেল পশ্চিম থেকে পূবে। বড় ভাল লাগল নিরঞ্জনের। টিয়াগুলোকে তার ভাল লাগে। কেমন নিটোল চকচকে দেহ তাদের। কি সুন্দর সবুজ সবুজ পাখী। এবার অনেক শব্দ। চলমান শব্দ লক্ষ ক'রে উপর দিকে তাকিয়ে দেখল অনেকগুলো টিয়া একই দিকে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে। এতগুলো টিয়া! নিরঞ্জন ঘুমন্ত সীতার দিকে তাকাল ঠিক অমনি নিটোল গোল চকচকে দেহ সীতার ছিল, এখন অনাহারে অর্ধাহারে আর অত্যাচারে একটু যেন চুপসে গেছে। তবু এই টিয়াগুলোর সাথে মিল আছে। তাছাড়া বিয়ে হবার পর একটা টিয়ার ছানা ধরে দেবার জন্যে কত দিনই সীতা অনুরোধ ক'রেছে তাকে। বলেছে পুষবে, বোল শেখাবে। তাই টিয়াগুলোকে ভালবাসে নিরঞ্জন।

এত বড় বড় বাড়ীতে ভর্তি সহরে যখন টিয়াগুলো সচ্ছন্দে বেঁচে আছে তখন সেও বাঁচবে, জীবন পেতে পারে এখানেই। শুধুই যেখানে ইঁট আর পাথর সেখানে যদি ওই টিয়াগুলোরও জায়গা থাকতে পারে তাহলে তারও জায়গা পাওয়া কঠিন হবে না। অমনি সবুজ এক সজীব জীবন পাওয়াও সম্ভব হবে তার পক্ষে। সীতার দিকে চেয়ে নিরঞ্জন দেখল সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এমনই ভাবে ঘুমোচ্ছে যেন ওর চেয়ে নিশ্চিন্ত কেউ নেই। অথচ শান্তি নেই বৌটার। থাকবেই বা কি করে, নিরঞ্জন মনে মনে ভাবল, ওর তো এমন নিশ্চিন্তই থাকা উচিত তার নিজেরই উচিত সীতাকে এমনি নিশ্চিন্তে ঘুমোবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া।

তা সে পারে নি। চমকে উঠল নিরঞ্জন নিজের মনেই, পারে নি! না, না, মানতে চাইল না পারে নি বলে, অসুখ হয়ে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেছে। এই রোগটা উপশম হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে বরং ভালই হবে আরও, এখানে তো আর বজরঙলালের ইঁটখোলা নেই যে রোজগারের অর্ধেক ভাগ খাবে ইদুরে। এখানে কত বেশী আয়, কলে খাটবে তাহলে কত টাকা পাবে নয়ত আর কিছু ক'রবে। অন্য কিছু যে কি ক'রবে নিরঞ্জন চিন্তা ক'রে আবিষ্কার করতে পারল না। তবে মোটামুটি তার নিশ্চিন্ত ধারণা যে যাই করুক এখানে

অনেক টাকা সে রোজগার করতে পারবে সুস্থ হ'লে। আজ ছেলেটা আর সীতা রাস্তার ওপর শুয়ে আছে; কি ক'রবে ভাগ্যে দুঃখ না থাকলে কখনও এরকম হয়? কোন জন্মে যে কি সব পাপ ক'রেছিল, নিরঞ্জন নিজেদের সম্বন্ধে ভাবল, তাই এই দুর্দশা। নইলে কখনও এত কষ্ট মানুষ পায়! মনে মনে ব্যথিত হ'ল নিরঞ্জন সীতার জন্যে আর তার ছেলের জন্যে।

সারাদিনের শেষে আর খোলা আকাশের নিচে চলে না। তখন মাথার উপর আচ্ছাদন চাই। অন্ততঃ এমন একটা স্থান রাত্রির জন্যে চাই যেখানে আচ্ছাদন না থাকলেও অন্তত আচ্ছাদনের কাছাকাছি হবে। যাতে প্রয়োজন হ'লেই আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। কাজেই দিন থাকতে থাকতে রাতের আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। সীতাকে ডেকে তুলল নিরঞ্জন, বলল, চল বউ।

কোথাকে যাবে—ঘুম ভাঙ্গা বিরক্তিতে প্রশ্ন ক'রল সীতা।

ভিতরে।

ভিতরে আবার কোথাকে যাবা—সীতা অধিকতর বিরক্তি প্রকাশ ক'রল। শুধু হেঁটে হেঁটে আর ঘুরে ঘুরে সে পরিশ্রান্ত। এই তের দিনের মধ্যে একটু ভাত পড়ে নি পেটে, কেবল আজে বাজে জিনিষে পেটকে ধাপ্পা দিয়ে এসেছে। কখনও একটা রুটি, কখনও দুটি মুড়ি, কখনও বা পাউরুটির টুকরো এমনি ক'রে দিনগুলোকে অতিকষ্টে পেছনের দিকে ঠেলে ঠেলে ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে উত্তরে। কলকাতায়। কলকাতার ভেতরে এবং আরও ভেতরে। এবার আবার কোথায় যাবে আর কতদূর হাঁটতে হবে এসব কিছুই বুঝতে পারছে না। সে, ক্লান্ত। দেহের ক্লান্তি মোছে বিশ্রামে, মনের অত সহজে মোছে না। তাই বেশ কিছুক্ষণ মহীরূহের সুশীতল ছায়ায় অবিচ্ছিন্ন নিদ্রার পরও সীতা এগিয়ে চলার কোন প্রেরণা অনুভব ক'রল না।

সেই দিকে—উত্তর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল নিরঞ্জন।

সেই দিকে আছেটা কি—অনিচ্ছুক সীতা প্রশ্ন ক'রল।

হেতাকে পয়সা মিলল নাই। খাবার মিলছে নাই।

কথাকে মিলবে? সীতার জিজ্ঞাসায় ক্ষুব্ধ উষ্ণতা।

নিরঞ্জন জবাব দিতে পারল না। তার নিশ্চিত বিশ্বাস কলকাতার সেই অর্থ কেন্দ্রে গিয়ে পৌছোলে পয়সা মিলবেই কিন্তু সে চেনে না তা। এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েই তাকে পৌছোতে হবে। এমনি ভাবে চলতে চলতে সেই আসল কলকাতার খোঁজ পাবে সে। এসব কথা সীতার কাছে বলা যায় না। বললে সীতা রেগে যাবে, এখনই এমন কথা বলে বসবে যে সহ্য করা যাবে না।

নিরুপায় দৃষ্টিতে নিরঞ্জন বারকয়েক এদিক ওদিক তাকাল। অদূরে ঘাসের ওপর অদ্ভুত এক টুপি মাথায় লুঙ্গি পরা এক ছোকরা বসে বসে এদিকে কি

অপরূপ দৃশ্য যেন দেখছে! নিরঞ্জন একবার দেখল মাত্র, লক্ষ ক'রল না। তবু তার মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে এই ছোকরটাকেই সে ডালমুট বিক্রী ক'রতে দেখেছে। অকস্মাৎ যেন ছেলেটির মূল্যবৃদ্ধি ঘটল, ডালমুট বিক্রী ক'রে পয়সা রোজগার করে যে ছেলে নিঃসন্দেহে সে সমীহ করবার উপযুক্ত। কাজেই নিরঞ্জনের ইচ্ছে হ'ল ওকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে কলকাতার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে।

ছেলেটি জলের জন্যে অভাব জানাতে নিরঞ্জন বলল—একটা জায়গা দে এট্টু জল নে আসি।

টিনের মগটা দেখিয়ে সেটিকে নেবার কথা বলে সীতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। সে বুঝে উঠতে পারছে না যে কিসের আশায় তারা ঘর ছেড়ে এসে কলকাতাতে হাজির হ'ল। কত কথাই তো নিরঞ্জন বলেছিল, যদিওসীতা জানত এত হবে না তবু কিছু আশা না ছিল এমন নয়। কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার নিম্নতম আশাটুকু তার ছিল কিন্তু আজ সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে সেই সর্বনিম্ন আশাও ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনেই। ভালভাবে বাঁচবার তো কোন কথাই নেই, গ্রামে যেভাবে ছিল কোনক্রমে একবেলা খেয়ে তাও তো জুটছে না এই কলকাতায়। আর নিরঞ্জন তাকে ফটিক দত্তের নিদর্শন দেখিয়েছিল, কত সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে ছিল অবশেষে তাকে কলকাতায় শুকিয়ে রেখে ছাড়ল। কূলকিনারা ছাড়িয়ে চলল তার ভাবনা।

হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখল একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে থাকা এক ছোকরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর হাসছে যেন অল্প অল্প। রাগ হ'ল সীতার, অত্যন্ত অসভ্য এবং বদমাস মনে হ'ল ছোকরাটিকে তার চাহনির জন্যে। বুঝতে তার আদৌ দেরী লাগল না হাসিটি কোনও শয়তানের ঠোঁট থেকে নকল করা। অক্ষম বিরক্তির তীব্রতায় প্রবল অবজ্ঞা প্রকাশের জন্যে সে ওষ্ঠাধরে ঘৃণার অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে এক ঝটকায় ঘুরে বসল।

তাতে বাসেদ আদৌ বিচলিত হ'ল না। পানের কষে লাল ছোপ পড়া দাঁতে হাসি ফুটে রইল তার আগের মতই। কেবল একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগল অকারণে, চোখদুটো স্থির সীতার দেহের দিকে। তার দৃষ্টি সীতার দেহের পশ্চাদভাগে দেওয়ালে আঁটা চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনের মত এঁটে রইল। প্রায় সমবয়সী একটা ছোকরা এসে ওর মাথা থেকে টুপিটি তুলে নিজের মাথায় পরে নিতে ঘটনার আকস্মিকতায় দৃষ্টি ফেরাল বাসেদ, ক্যা বে?

ইহা ক্যা হোতা বে—প্রশ্ন ক'রল আগন্তুক ছোকরা।

দেখ মেরে দোস্ত—ইয়ে দেখ রহা ম্যায়—ইসারায় সীতাকে দেখিয়ে তার দ্রষ্টব্য বুঝিয়ে দিল বাসেদ।

আবে ছোড়। আভি চল—

কাঁহা বে?

এক পিক্‌চর দেখনে কি—

কোন খেল্?

'দিল কি সওয়ার'।

উঠে দাঁড়াল বাসেদ। অদূরে ডালমুটের ঝুড়িটা রেখেছিল বসিয়ে, সেটাকে তুলে নিয়ে ডানদিকের চায়ের দোকানে রেখে ফিরে এসে দেখল তার সাথীর সঙ্গে নিরঞ্জন কথা বলছে। হাত মুখ নেড়ে তুজনে বুঝিয়ে চলেছে, সাধ্যমত বাংলায় ওর বন্ধু বলছে, ইখানে তো রাতমে শুবার জায়গা না আছে। ফির এক কাম তুম ক'রতে পারে। ওই বিরিজকা নিচেমে শোনে সখতা। —সামনের খালের পুল দেখিয়ে দিল নিরঞ্জনকে।

বাসেদ অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডেকে বলল—এ রশিদ, আ বে চল ইয়ার, দেরী হয়ে যাবে বে।—বাংলাতেই কথাগুলো বলল বাসেদ, সীতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল সে যে বাংলা জানে এটা জানবার জন্যেই।

নিরঞ্জনের আরও একটু কথা বলবার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু রশিদের ভাষা বুঝতে না পারার জন্যেই ক্ষান্তি দিয়ে বলল, উদিকে বুঝি ডাকতেছে?

রশিদও স্পষ্ট বোঝে না নিরঞ্জনের ভাষা আন্দাজে জবাব দিচ্ছিল এতক্ষণ, বলল, উর নাম বাসেদ আছে। ডালমুট বিক্রী কোরে।

অর্ধেক বুঝল নিরঞ্জন অর্ধেক বুঝল না। যেটুকু বুঝল তার বেশী আর বোঝবার ইচ্ছেও ক'রল না। কথা বোঝা যায় না পশ্চিমেগুলোর, কে কথা বলবে এদের সঙ্গে? এখন সে যেন এগুলোকে ছাড়াতে পারলে বাঁচে। তাছাড়া ঐ ছোকরা—বাসেদটার চোখ মুখ দেখে কেমন যেন সন্দেহ লাগছে নিরঞ্জনের। কেমন বিচ্ছিরি চাউনি ছোকরাটার। যার সঙ্গে কথা বলছে এটিও যে খুব একটা ভাল এমন মনে হয় না তবু ওটার চেয়ে ঠাণ্ডা মনে হয়।

পেছন দিকে দেহটাকে হেলিয়ে দিয়ে লাফানোর ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল বাসেদ রশিদকে সঙ্গে নিয়ে। তার বিচিত্র হাঁটার দিকে তাকিয়ে রইল নিরঞ্জন। অমনি পেছন থেকে সীতা খেঁকিয়ে উঠল, অমন হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছ? চোপর দিন পেটে দানা নেই খাবার জোগাড় ক'রতে হবে নাই?

কথাটা যেন সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল নিরঞ্জন। অল্পবয়সী ছেলে তুটো তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল পেটের কথা। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ওকে যন্ত্রণার নাগপাশ থেকে ক্ষণস্থায়ী মুক্তি দিয়েছিল। সীতার আহ্বানে ফিরে সে দেখল তার ছেলেটাও বাসেদ-এর মত ক'রে হাঁটবার চেষ্টা ক'রছে! অমনিভাবে হাঁটা অভ্যেস ক'রতে ক'রতে দূরে চলে যাচ্ছে দেখে নিরঞ্জন ডাকল—মদন! ইদিক

আয় বাপ।

মদন যে তার বাবার কথা শুনেছে তার কর্মধারা দেখে এমন অনুমান করা গেল না। নিজের মনেই খেলা ক'রে চলল সে। নিরঞ্জন আর কিছু বলল না। ছেলের দিক থেকে সরিয়ে মনকে এনে প্রয়োজনের কাছে উপস্থিত ক'রল। দুটো ভাতের ব্যবস্থা ক'রতে হবে, নইলে প্রাণ আর বাঁচে না। ক'দিনের মধ্যে ভাতের মুখ দেখে নি কেউ কাজেই আজ দুটো ভাত জোগাড় ক'রতে না পারলে আর কিছুতেই চলবে না।

দুটো চালের আশায় নিরঞ্জন বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা ক'রল কিন্তু পাবে কোথায়? কতটুকু পথ সে চেনে? বড় জোর যে পথ দিয়ে এসেছে সেইটুকু হয়ত অনেক প্রয়াসে চিনতে পারবে। কিংবা তাও হয়ত পারবে না। তবু তাকে যেতেই হবে—বাঁচবার জন্যেই যেতে হবে তাকে; যেতে হবে ছেলে বৌকে বাঁচাবার জন্যে।

আধঘণ্টা ধরে ক্রমাগত ঘুরেও কোন কূল পেল না নিরঞ্জন। এমন একটা বাড়ী দেখল না যে দরজায় গিয়ে ভিক্ষে চাইতে পারে, এমন একটা দোকানও দেখল না যেখানে চাল পাওয়া যায় পেলে অন্তত চেয়ে দেখতে পারত এক মুঠো মেলে কিনা। বড়ই বিস্মিত হ'ল নিরঞ্জন। এখানের এই যে বড় বড় বাড়ী প্রাচীরে আগলে রেখেছে মর্যাদা, এর অধিবাসীরা তাহলে খায় কি? বিরাট বিরাট সদর দরজায় হয় দারোয়ান নয় দ্বার বন্ধ। অযথা চারদিকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'ল নিরঞ্জন, অবশেষে ফিরে এল সেই গাছতলায় সীতার কাছে। তার ব্যর্থ আশাহত মূর্তি আর শূন্য হাত দেখে রুদ্ধ কণ্ঠে সীতা জানতে চাইল—কি হ'ল?

গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে দুই হাঁটুতে মাথার ভার রেখে আত্মগোপনে সাহায্য ক'রল নিজের মনকে। তার এই নির্বাক ভঙ্গীতে সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং বলল—অমন কইরে বসলে কেন?

নিরঞ্জন কোন জবাব দিল না।

চাল মিলল নাই? সীতা জানতে চাইল।

না—নিরঞ্জন জানাল মুখ না তুলেই। অমনি অগ্ন্যুদ্‌গিরণ হতে লাগল সীতার কণ্ঠে—তবে আর কি শুয়ে থাক মড়ার মত। তোমার কি?

নিরঞ্জন কোন কথা না বলায় সীতা নিজেই গজরাতে লাগল—মাগ ছেলের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। যে ভাত দিতে পারে না সে আবার ভাতার! অমন বেটাছেল্যা আবার মরদ নাকি? আ আমার সোয়ামী রে!

ব্যর্থতার যে বেদনায় নিরঞ্জন কষ্ট পাচ্ছে তার কাছে সীতার এই কটূক্তি কিছুই নয়। নিরঞ্জন ক্ষুব্ধ চিত্তে তাই চুপ ক'রেই রইল কিন্তু ক্রমাগত গঞ্জনায়

একবার অধীর হয়ে উঠল সে, সরোষে বলে উঠল—এই খবরদার বলছি, আজে বাজে কইবি নি।

নিরঞ্জনের একটা কথাই আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ ক'রল, সীতা গর্জে উঠল—আ আমার কে গো—। ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই। লজ্জা করে না অমন মানুষের ?—সীতা রীতিমত চিৎকার ক'রে ঝগড়া লাগল। একজন দুজন ক'রে ধীরে ধীরে বেশ কয়েকজন বেকার লোক জুটে গেল চারপাশে মজা দেখতে।

নিরঞ্জন বেশ বিস্মিত হ'ল সীতার আচরণে, আজ কি করছে সীতা ! এত দিন ধরে এত অসুবিধে সহ্য ক'রেও কোনদিন এরকম ঝগড়া করেনি, এত কষ্ট গেছে একদিনও চেঁচামেচি করে নি আর আজ হঠাৎ একি হ'ল ওর, এমন ভাবে ধিক্কার দিচ্ছে যে নিরঞ্জনের মনে কঠিন বিষের মত তীব্র জ্বালা ধরে যাচ্ছে। তবু নিরঞ্জন চেষ্টা ক'রল চুপ ক'রে থাকতে। এত লোকজন জুটে যাওয়ায় আরও লজ্জা ক'রছে তার, কেমন অস্বস্তি লাগছে।

লোকজন জুটে যাওয়ায় সীতাও সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ থেমে গিয়ে অকারণে এটা ওটা নাড়তে লাগল। আর হঠাৎ সে অনুভব ক'রল পেটের মধ্যে কি তীব্র জ্বালা যেন দেহ অভ্যন্তরের সমস্ত কিছু অংশকে পুড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এর আগে ক্ষিধেয় মোচড় দিচ্ছিল পেটের মধ্যে এখন আর মোচড়াচ্ছে না বদলে এমন এক জ্বালা সে অনুভব ক'রছে যার জন্যে মনে হচ্ছে সে আর এক নিমেষও বসে থাকতে পারবে না। পেটের ভেতর নাড়ি ভুঁড়িগুলো যেন মোমবাতির মত গলে গলে পড়ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। সারা শরীর কুঁকড়ে সীতা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল।

ক্ষিধে পেয়েছিল মদনেরও, অনেকক্ষণ ধরে মায়ের কাছে খাবার জন্যে বায়নাও ক'রে চলেছিল, মা-বাবাতে ঝগড়া সুরু হ'তে বেগতিক দেখে থেমেছিল, আবার সে ঘ্যান ঘ্যান ক'রতে ক'রতে সীতার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। সীতা নিজের যন্ত্রণাতেই অস্থির হয়ে যাচ্ছিল এই অবস্থায় ছেলেতে বিরক্ত করায় প্রবল জোরে একটা চড় বসিয়ে দিল ছেলেকে। হকচকিয়ে যাওয়ায় কাঁদতেও ভুলে গেল মদন, আঘাত লাগা যন্ত্রণায় যেন হাত দিয়ে উপশম ক'রতে চাইল সে। আর তার মা মুখ বন্ধ ক'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যার শব্দ গোপন রাখা সম্ভব হ'ল না।

উপস্থিতদের মধ্যে থেকে এক প্রৌঢ় এগিয়ে এসে ছেলেটার জন্যে সহানুভূতি-সূচক শব্দ উচ্চারণ ক'রল মুখে। বিহার প্রদেশের লোকটি কষ্টার্জিত বাংলায় নিরঞ্জনকে বলল, এতো কষ্ট ক'রিয়ে এখানে আছো কেনো ? এখানে কিসুই নাই আছে। যেমন কষ্ট ক'রে লোকটি কথাগুলো বলল, ততোধিক কষ্টে

তা বুঝল নিরঞ্জন। তবে মনের অবস্থা ভাল না থাকায় সে কথায় কোন গুরুত্ব দিল না। লোকটা কি বলছে না বলছে শোনাবার কোন প্রয়োজন অনুভব ক'রল না। কিন্তু লোকটি পুনরায় বলল, এখানে বসিয়ে কুছু মিলবে না। বরখা সে কোঠো মিলবে, ধুপ সে জড়বে. খানা উনা ইহা মিলবে না।

লোকটি তার কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঁচিয়ে আকাশ রৌদ্র প্রভৃতি দেখিয়ে নিরঞ্জনকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রছিল. সেই প্রয়াসের জন্যেই তার বক্তব্য কিছুটা অনুধাবন ক'রল অনুমানে। অন্তত এটা বুঝল যে লোকটি তাকে সহানুভূতি বশতঃ কোন কথা বোঝাতে চাইছে। যে সহানুভূতি সে কারও কাছে এতদিন চেয়েও পায়নি তাই এই লোকটি অযাচিত ভাবে তাকে প্রদর্শন করায় লোকটির কথায় মনযোগ দিল নিরঞ্জন। পেছন দিক থেকে একটি ছোকরা প্রৌঢ় লোকটির অজ্ঞতা নিরসনের উদ্দেশ্যেই বলে উঠল—ভিখ মাঙ্গা হ্যায়।

লোকটি কোনদিকে না চেয়ে বলল—হাঁ ও তো হ্যায়।—নিরঞ্জনকে বলল—তুমি কালীঘাটমে চলিয়ে যাও। রামজীকে দয়া সে উখানে খানা ভর মিলিয়ে যাবে তুমহার।

সে কোনখানে বাবা—নিরঞ্জন জানতে চইাল।

লোকটি হাত তুলে দিক নির্দেশ ক'রে বলল—এহি রাস্তা সে চলিয়ে যাও। পুছতাছকে চলিয়ে যাবে।

লোকটির করুণায় সে সাহস পেল। নিজের হাত দুটো জোড় ক'রে সকরুণ আকুতি সহকারে বলল—বাবা এই বাচ্চাটাকে সারাদিন কিছু খেতে দিতে পারি নাই। দুটো ভাত কোথাও পেলে—

ভাত তো ইঁহা মিলবে নাই। ইস ধার মে সাহাব লোককে মকান। উহা সে খানা কোইকো মিলে না।

কিন্তুক বাবা ই ছেল্যাটাকে দুটা ভাত দিতে না পারলে তো প্রাণটা উহার বাঁচবেক নাই. নিরঞ্জন লোকটিকে বোঝাবার মত ভাষা বলবার চেষ্টা ক'রল।

লোকটির হৃদয় নরম কিন্তু সাধ্য কম হওয়ার ফলে ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয় না। নিরঞ্জনের ছেলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে মন তার বেদনাক্রান্ত হ'ল। ভাবল কি করে ? যে বাড়ীতে দারোয়ানের কাজ করে সে নিজে. সেখানের রান্না ঘরের চাকরকে বলে যদি পারে ভুক্তাবশিষ্ট এই লোকগুলোকে দিয়ে দেয় কিছু। আবার ভাবল এত বেলায় কি আর কিছু থাকে ? নিশ্চয়ই সব ধোয়া মোছা পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণ। কাজেই এদের নিয়ে গেলে হয়ত অপ্রস্তুতই হতে হবে। তার নিজের ঘরে তো বাসনপত্র এখন ধোয়া হয়ে গেছে কাজেই কিছুই সে করতে পারছে না সেই কথাটা জানিয়ে কালীঘাট পৌছতে পারলে খাবার ব্যবস্থা তারা রাত্রেও ক'রে নিতে পারবে সেই পরামর্শ দিল।

সেরকম কোন হৃদয় ঘটনা না ঘটায় আশেপাশের ভিড় সরেই গিয়েছিল।
দু একজন অতিকুতূহলী নিষ্কর্মা কেবল তখনও দাঁড়িয়েছিল অকারণ, আর দু
একটি ছোকরা সহানুভূতিশীল লোকটির প্রতি নজর রাখছিল কোন মতলবে সে
হিতোপদেশ দিচ্ছে তাই অনুসন্ধান করবার জন্যে। এদের জন্যেই ভেতরে ভেতরে
অস্বস্তি অনুভব করছিল সীতা। এতগুলো লোকের নির্লজ্জ দৃষ্টি তার দেহের
ওপর বৃষ্টির মত পড়ছে সে স্পষ্ট বুঝে শারীরিক যন্ত্রণা সত্বেও অসহিষ্ণু হয়ে
উঠছিল। তাই, কি যে ওই লোকটা দুর্বোধ্য শব্দে নিরঞ্জনকে বোঝাতে চাইছে
তা সে বুঝতে চেষ্টা ক'রছিল না মোটেই।

নিরঞ্জন সীতাকে আর কোথাও যাবার কথা বলতে সাহস ক'রল না।
কলকাতার কথা বলে একদিন প্রলুব্ধ করার চেষ্টা ক'রেছিল কিন্তু কলকাতায়
এনে কেবল অনাহার আর নিরাশ্রয় রাত্রি ছাড়া অন্য কিছুই যোগাতে পারে নি
সীতাকে। স্বভাবতই এখন নতুনতর কোন জায়গার উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা বলতে
তার যেমন সংকোচ তেমনি শংকা।···শুভচিকীর্ষু মানুষটি বেশী কথা বলেনি তবু
তার সামান্য কথা থেকেই অসামান্য আশ্বাস পেয়েছে নিরঞ্জন। তার মনে হচ্ছে
সত্যিই কালীঘাট নামক জায়গায় গেলে তারা খেতে পাবে। কেমন ভাবে পাবে
বা কে যে দেবে এসব প্রশ্ন এল না তার মনে, শুধু মনে হল লোকটির কথা শোনা
উচিত। তাই অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সন্তর্পনে বলল—বউ, অ বউ! লোকটা
কি বলতেছেন শুনলি?

সীতা কোন জবাব দিল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মোলায়েম স্বরে নিরঞ্জন বলল—কালীঘাট
যেতে বলল উনি। সেখানকে থাকবার জায়গার অভাব নেই—ভাতও পাওয়া
যায়—বলে যেন হঠাৎ সংযত হয়ে পড়ল নিরঞ্জন। ভাতও পাওয়া যায় এই
কথা বলা কোন প্রত্যাভূতির সামিল মনে হওয়াতে কথার মাঝখানেই থেমে
গেল। দেশে থাকতে কলকাতা সম্বন্ধে যত সহজ চিন্তা ছিল তা যেন নিঃশেষ
হয়ে গেছে নিরঞ্জন স্পষ্টই অনুভব ক'রতে পারল। আগে যত সহজে আশার
কথা স্ত্রীকে শোনাতে পেরেছিল এখন তত সহজে বলতে পারে না। কিন্তু
কথা শেষ না করেই সে বিস্মিত হয়ে গেল সীতাকে দেখে। একটি কথাও বলল
না সীতা, কোন রূঢ় কথা নয়, কোন কটূক্তি নয়, কোন ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ
নয়, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এমন কি কান্নার শব্দটুকুকে পর্যন্ত সে আঁচল
চাপা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতে চেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সমবেদনার চাপে নিরঞ্জনের মনে হ'ল তার নিজের অন্তরও বুঝি কাঁদছে।
আশেপাশের দর্শকমণ্ডলী তখন সবাই সরে গেছে—চলে গেছে সেই সদয়
ব্যক্তিটিও। চারপাশে চেয়ে দেখল কেউ নেই। কথা বলতে গিয়ে অনুভব

ক'রল তার স্বর ভারী হয়ে উঠেছে, তবু সে বলল—চ বউ, আর দেরী করিস নি। নাগাদ সন্ধে গিয়ে উঠতে পারি তো ভাল। ওঠ দেরী করিস নি।
পোটলাটা উঁচুতে তুলে নিজেই উঠে দাঁড়াল নিরঞ্জন। তারপর যেন নিজেকেই বলল, পথে যদি পারি তো খাবারটা মেগে নেব।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যখন গন্তব্যস্থলে নিরঞ্জনরা পৌঁছাল তখন রাতের অন্ধকার হাজার বিজলী বাতির বিজয় প্রচেষ্টাকে প্রায় ব্যর্থ করে দিয়েছে। আলো আলো অন্ধকার ভেদ করে তখনও যানবাহন পথ অতিক্রম ক'রছে। কিছু কিছু পথচারী ক্লান্ত পদচারণায় গৃহাভিমুখী। পথের মাঝে মাঝে যেখানে পাথরের প্রতিরোধেও বর্ধিত অনুচ্চ বৃক্ষগুলো সার্কাসের হাতীর মত দাঁড়িয়ে সেখানে ঝুপসি অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অনিশ্চিতের সন্ধানে এগোবার উদ্দেশ্য নিরঞ্জনের মোটেই ছিল না, কেবল আশেপাশে সুবিধা মত কোন আশ্রয়স্থল না পাওয়ায় তাদের এগিয়ে চলতে হচ্ছিল। পথে আসতে এক বাজারের সামনে কয়েকটা পাউরুটি কেনা থাকায় তার আর খাবার অন্বেষণের ইচ্ছা ক'রছিল না এই রাতের অন্ধকারে। বিশেষ ক'রে অচেনা স্থান বলেই যেন তার আর এগোতে সাহস হচ্ছিল না।
ট্রাম রাস্তা ছেড়ে তবু ঢুকে গেল ওরা মন্দিরের দিকে। ঢুকতেই ডানদিকে কতগুলো টিনের চালা দেখে নিরঞ্জন সেগুলো যে কি তাই অনুমান করার চেষ্টা ক'রল। ভাবল ওগুলোর পাশে বা দুটো চালার ফাঁকে যে পরিসরটুকু আছে তার মাঝে রাত কাটানো সম্ভব কিনা। ক্লান্তিতে সীতার শরীর নুয়ে আসছিল, সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রল, দাঁড় হয়ে ভাবতেছ কি অত?
ভাবতেছি ইদিকপানটায় রাতটা যদি কাটান যায়—নিরঞ্জন জানাল। আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুমান করবার চেষ্টা ক'রল রাত্রে বৃষ্টি হবে কিনা! বসন্তকাল প্রায় মাঝামাঝি এসেছে। বর্ষা হতে কোন বাধা নেই, অন্তত এক-এক পশলা বৃষ্টি হঠাৎ নেমে গেলে আর রুখছে কে? মাঝরাতে তখন যাবেই বা কোথায়? কাজেই সীতা যা-ই বলুক না কেন জায়গাটা ঠিকমত বেছে নিতে হবে। সে লক্ষ ক'রল টিনের চালাগুলো মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে রয়েছে—খুঁটি দিয়ে উঁচু করা। চিন্তা ক'রল প্রয়োজনবোধে ওগুলোর তলায় শোয়া যায় কিনা। যে রকম নিচু আর যে পরিমান অন্ধকার জমে আছে তাতে সে বুঝল ওর তলায় শোয়া অসম্ভব। হঠাৎ সে দেখল একটা কালো রোঁয়া ওঠা কুকুর ওপাশ দিয়ে গুড়িগুড়ি মেরে টিনের ছাপরার তলায় ঢুকে গেল।
পথে ঘুম এসে যাওয়ায় মদনকে কোলে নিয়ে চলতে হচ্ছিল সীতার। ভারী অত বড় ছেলেকে আর বইতে পারছিল না বলে দুই টিনের চালার

মধ্যের পরিসরে শুইয়ে দিল মাটিতেই। নিরঞ্জন ইচ্ছা অনিচ্ছার টানা পোড়েনে দুলতে দুলতে অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই জিনিষপত্রগুলো নামিয়ে ফেলল কাঁধ থেকে। পোঁটলা থেকে পাউরুটি বের করে সীতাকে দিয়ে বলল, নে খা।

তুমি খাবে নি? সীতা জানতে চাইল।

না। আমার দেহটা ঠিক লাগছেক নাই।

সীতা কথাটা নির্ভরযোগ্য মনে ক'রল না বলে প্রতিবাদের স্বরে বলল—সেটি হবেক নাই। তুমি কিছু খেয়ে লেন গো।

আমি খাবো নি। তুই লে।

পেটের খিদের তুলনায় পাউরুটিটা পরিমাণে খুবই কম হলেও স্বামীকে অভুক্ত রেখে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না সীতা। তাই নানা অনুরোধ উপরোধ ক'রে তাকে এক টুকরো রুটি খেতে বাধ্য ক'রল। কিন্তু সামান্য রুটিতে ভাগ বসিয়ে মরা খিধেকে উত্যক্ত ক'রতে ইচ্ছা ক'রছিল না নিরঞ্জনের দীর্ঘক্ষণ নাড়ি ভুঁড়ি চিবিয়ে ক্লান্ত খিধে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে তাকে। এখন সামান্য কিছু পেটে গেলে সেই খিধে দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ ক'রবে। পিত্তশূল হবার পর থেকে খিধেটা যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়। ওষুধ খেয়ে কিছু ভালই আছে কারণ আজকাল আর খিধে প্রথম অবস্থাতেই যন্ত্রণা দেয় না। তাই বেঁচেছে নিরঞ্জন নইলে সেই যন্ত্রণা যদি সইতে হ'ত, উঃ। চিন্তা করতেই ভয় হয়, ভয় পায় সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়লে।

নিরঞ্জন ভাবে এই যন্ত্রণা যেন কারও না হয়। এমনকি অতি বড় শত্রুরও নয়। তার জ্ঞাতি লোচনেরও না। অথচ এই লোচন তার দশকাঠার জমিটা একরকম ঠকিয়েই নিয়েছে একদিন। লোচনের জন্য অনেক অভিশাপের কথা ভেবেছে সে, এটা হোক ওটা হোক কিন্তু যেই এই যন্ত্রণার কথা মনে হয়েছে ভেবেছে, না ভগবান এই শূল বেদনা যেন কারও না হয়। লোচনেরও নয়।

গায়ে জলের ছিটে লাগায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, তবে কি বৃষ্টি পড়ছে? নিরঞ্জন ভাবল, উঠে দেখল পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে, আলো এসেছে আকাশ জুড়ে। আর ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে দুজন লোক নলে ক'রে জল ছিটিয়ে। তারই কণাগুলো ছুটে এসে গায়ে লাগছে। একজন লোক উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ ক'রতে ক'রতে হেঁটে চলেছে। বেশ লোকজন চলতে শুরু ক'রেছে রাস্তায়। সে উঠে বসল। সীতার ঘুম ভাঙবার আগেই একবার চারপাশ ঘুরে আসবে কিনা ভাবল। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে ওদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল—ওঠ ওঠ। ভাগ এখান থেকে।

নিরঞ্জন অবাক তার মুখের দিকে তাকাতে লোকটি আবার তাড়া দিল—এখন দোকান খোলা হবে এখান থেকে পালাও জিনিষপত্র নিয়ে। শীঘ্রি কর।

সীতার গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে নিরঞ্জন জাগাল তাকে। মদনকেও টেনে তুলে বসিয়ে দিল। সীতাকে বলল—দোকান খুলতে লোক এসেছে, উঠ।

রাতের আস্তানা গুটিয়ে ওরা চলল মন্দিরের পথে। একটু এগোতেই দেখল একটি লোককে ঘিরে একদল অর্ধনগ্ন ছেলে এবং মেয়েছেলে কোলাহল করছে। একটু কাছে যেতেই বুঝল হাতের একটা বিরাট টিন থেকে কি যেন বিতরণ ক'রছে লোকটি, তারই সংগ্রহার্থীর ভিড়। নিরঞ্জন একবার অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ ক'রল—কি যেন দিতেছে। বলে আর কালক্ষেপ না ক'রে একটা টিনের মগ এগিয়ে দিল সেই প্রার্থীব্যূহ ভেদ ক'রে, সীতা দাঁড়াল কাপড়ের আঁচল পেতে আর মদন ছোট হাত দিল এগিয়ে।

যথাকালে হাত, কোঁচড় এবং মগ ভিড়ের মধ্যে থেকে ফিরে এলে দেখল যে কিছু খই মুড়কি মিলেছে সকাল বেলাকার মত। প্রত্যেকেই একমুঠো পেয়েছে এবং লোকটি এখানকার সকলকে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের দিকে। নিরঞ্জন দেখল যারা সেখানে ছিল সবাই নিচ্ছে কেবল অল্পদূরে দাঁড়িয়ে একজন লোক হাসছে। তার পরণে একটা প্যাণ্ট যার ডানদিকে পাটা হাঁটুর ওপর থেকে ছেঁড়া, বাঁ দিকেরটা পুরোই আছে। গায়ে একটা সার্টের ওপর গেঞ্জী। গেঞ্জীটায় অসংখ্য জানালা। সার্ট বা প্যাণ্ট কোনটাই চেনা যায় না ময়লার জন্যে। জামার হাত দুটো অকারণে ঝুলছে হাতের পাতার ওপরে। মাথায় অবিন্যস্ত একরাশ চুল, মুখে দাড়ি যথেচ্ছ বর্ধিত। দুপায়ে জুতোও আছে তবে দুটিই দুরকমের। লোকটি নির্বিকার চিত্তে হাসছে। কারও দিকে তাকিয়ে নয় শূন্য দৃষ্টি মেলে আপন মনে হেসে চলেছে লোকটি দাঁড়িয়ে! পাগল, সিদ্ধান্ত ক'রল নিরঞ্জন। কিন্তু পাগল বলে কি ওর ক্ষিধে থাকতে নেই? তবে কেন এত লোক খাবার নেওয়া সত্বেও ও নিল না? আহা যদি ওর মত হওয়া যেত, যদি ওর মত না খেয়ে থাকতে পারত নিরঞ্জন—

এগিয়ে চলল ওরা মন্দিরের দিকে। দু পা না যেতেই দেখল বাঁ দিকে রাস্তার ওপর রঙ কালো হয়ে যাওয়া একখানা কাপড় পেতে একজন শুয়ে আছে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে। তার সামনে কাপড়ের ওপরে অনেকগুলো পয়সা ছিটিয়ে পড়ে আছে। সীতারও নজরে পড়ল পয়সাগুলো। একবার তার মনে হ'ল যেরকম মড়ার মত পড়ে আছে লোকটা তাতে স্বচ্ছন্দে পয়সাগুলো তুলে নেওয়া চলে। তারা এত চেয়ে চেয়ে ঘুরছে একটা পয়সা পায় নি অথচ এই লোকটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই ভোরবেলা এতগুলো পয়সা পেয়ে গেছে! সবই বরাত—সীতা ভাবল। পাওয়া এবং না পাওয়াকে স্বাভাবিক ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে ন্যায় অন্যায়ের হিসাব শিখতে পারে নি সীতা। সংস্কার তাকে জ্ঞানের পথে হাঁটতে দেয় নি।

আর দু এক পা যেতে পথের দুধারে যেসব মানুষের মূর্তি ভেসে উঠল তাদের পোষাক উলঙ্গতার চেয়েও লজ্জাকর। তাদের চোখে, মুখে, দেহে সর্বত্র এমন এক সর্বময় বুভুক্ষা যে তার তুলনা নিরঞ্জন সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথাও খুঁজে পেল না। হঠাৎ এক তীব্র আর্তস্বরে চমক ভাঙ্গল তার, সীতারও। বাঁ দিকে কাপড় পেতে একটা লোক শুয়ে সমানে মাথা নাড়ছে, দেহ কাঁপাচ্ছে আর চীৎকার ক'রছে দুর্বোধ্য ভাষায়। নিরঞ্জনের নজরে পড়ল বীভৎস কালো সেই লোকটির দেহের সমস্ত অনাবৃত অংশ নোংরা ন্যাকড়ায় জড়ানো এবং একটা পায়ের মাঝখানে দগদগে ঘা পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যের দিকে দাঁত খিঁচোচ্ছে। সীতা সেই ঘায়ের দিকে তাকাতে পাচ্ছিল না। তার কেমন গা গুলোতে লাগল ঘৃণায়। মদন সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন ক'রল—তার কি হয়েছে বাবা? সেখানকে কি?

ঘা হয়েছে বাপ—নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর সমবেদনায় করুণ শোনাল।

অত ঘা কেন? শিশুর কৌতূহলী প্রশ্ন এল পুনরায়।

ভগবান দেছেন।

ভগবানের ওপর রাগ হ'ল মদনের। সে সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটির অবিবেচনার জন্যে বারংবার মনে মনে দোষারোপ ক'রল তার প্রতি। আর নিরঞ্জন লক্ষ ক'রল লোকটির চোখ মুখ সবই মাথার চুলে ঢাকা, পাশে একটা কাঠের গাড়ী আছে পড়ে আর এক হাতে একটা তোবড়ানো এ্যলুমিনিয়ামের বাটি ধরে লোকটা সমানে মাথা নাড়ছে আর চিৎকার ক'রে চলেছে। আরও লক্ষ ক'রল লোকটি কেবল মাথাই নাড়ছে না সমস্ত দেহ তার সমানভাবে কাঁপছে ঘন ঘন। একই ভাবে থরথরিয়ে কাঁপছে।

তার পাশেই এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় পরা একটি লোক বসে আছে গায়ে পুরানো একটা সুতীর কোটের খণ্ডাংশ। তার হাতের আঙ্গুলগুলো কি রকম বীভৎস দেখাচ্ছে। কেমন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, যেন ক্ষয়ে গেছে বলে বোধ হচ্ছে। সেদিকেও বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, নিরঞ্জন পারল না। পায়ের আঙ্গুলগুলোও অমনি। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল কপালের স্থানে স্থানে ফুলে যেন ঝুলে ঝুলে পড়েছে। মুখখানাকে কি কদাকার যে দেখাচ্ছে তা ভাবাই যায় না। চুপ ক'রে আছে লোকটি। কিন্তু তার দুই চোখে যে আবেদন ফুটে বেরোচ্ছে তার গভীরতা দেখে নিরঞ্জন নিজেও বেদনা বোধ ক'রল। লোকটির স্তব্ধতা পাশের জনের চিৎকারের চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হ'ল। যেন এই লোকটি তার স্তব্ধতা দিয়ে পৃথিবীকে আপন বেদনার কথা, যন্ত্রণার কথা জানাতে পারছে। তাদের পাশে যে ক'জন আছে প্রায় সকলের চেহারাই এক। কেউ নিঃশব্দে বসে আছে, কেউ পথিক দেখলে পয়সার

আবেদন জানাচ্ছে, কেউ শুধু "মা" কিংবা "বাবা" বলে আহ্বান জানিয়েই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে, বাকি কথা বলছে তার হাতের শূন্য পাত্র।

এতক্ষণ নিজের মনেই তন্ময় হয়েছিল নিরঞ্জন হঠাৎ খেয়াল হ'ল এবং দেখল পথে জনসমাগম হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। অনেক লোক চলছে মন্দিরের দিকে। চলতি পশ্চিমাভিমুখী পথকে ছেদ ক'রেছে একটি উত্তর-দক্ষিণ পথ। যেটি পার হতেই সে দেখল পথের বাঁ দিকে সারি সারি কাপড় বিছিয়ে ভিক্ষার্থীরা বসে আছে। প্রথমেই যে বসে আছে তার বয়স অনুমান করা কঠিন, পরণে রক্তিম পোষাক কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় অযত্ন বর্ধিত পিঙ্গল কেশ লম্বমান। পাশেই একটি ত্রিশুলে জবার মালা পরানো, ত্রিশুলটি একটি ইটের সাহায্যে খাড়া ক'রে রাখা হয়েছে। পাশেই এক অন্ধ বৃদ্ধ লাঠিটিকে সামনে ক'রে বসে আছে আর মাঝে মাঝে বলছে—এ বাবা, এ দানী বাবা, সুরদাস কো এক পইসা দো। এ মাঈ, এ লছমী মাঈ সুরদাস কো খানে দো।

একটি লোক অন্ধটিকে একটি নিম্নতম মুদ্রা ছুঁড়ে দিতেই রক্তিম বসনাবৃত ব্যক্তিটি বলে উঠল—সাধু কো দান দো বাবা, পুন করো। ধরম করো বাবা, সাথী বানা লো।

আবার একটি পয়সা পড়ল সাধুর বিস্তৃত অঞ্চলে। অমনি দূর থেকে শণের মত চুল বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—এ বাবু, এ রাজা বাবু বুড়ি কো এক পয়সা দো।

তার কাংসনিন্দিত কণ্ঠশব্দ ছাপিয়ে উঠল অনেক কণ্ঠস্বর শুধু—দেও, দেও, দেও। কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সরু সরু হাত বাড়িয়ে ঘিরে ধরল লোকটিকে। লোকটি সেই পিঁপড়ের ঝাঁক থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কাউকে ধমক দিয়ে কাউকে গালি দিয়ে কারও হাতে একটি পয়সা ফেলে দিয়ে নিজের পথ ক'রে দৌড় দিল। জটলার মধ্যে নিরঞ্জনও তার টিনের মগ নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার বরাতে কিছুই জুটল না। রিক্ত হাতে সে ফিরে এল শূন্যতায়। মধ্যে মধ্যে দু একজন পথচারী চলতে চলতে প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে নিম্নতম মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে, নিরঞ্জন অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করেছিল বলে তারও ইচ্ছে হ'ল এক জায়গায় অমনি কাপড় বিছিয়ে বসে পড়ে। কিন্তু মুহূর্ত অতিক্রান্ত হতে না হতেই সে চমকে উঠল তার পেছনেই গাত্রসংলগ্ন শব্দে; এক ছিন্নতন্ত্রীকণ্ঠি মুখিয়ে উঠল, বলি ও পোড়া কপালে মিনসে, কোন চুলোরদোর থেকে আসা হ'ল শুনি? বলি, আপনি শুতে ঠাঁই পাইনি শঙ্করাকে ডাকি—। তা এখেনে কেন বাবা, এত বড় তিভুবনে আর কি কোথাও জায়গা হ'ল না?

নিরঞ্জন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল লোল চর্মাবৃত এক অস্থিসম্বল বৃদ্ধা রক্ত নেত্রে তার দিকে চেয়ে আছে। হাতের লাঠিটায় ভর ক'রে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা দৃষ্টিতে যতটুকু সম্ভব অগ্নিবর্ষণ ক'রে বলল—এখেনে আবার জুটলে কেন মরতে?

নিরঞ্জন তার ক্রোধের মান অনুমান ক'রতে পারল না। সেই মুহূর্তে একজন যাত্রী আসায় বুড়ি ওকে ছেড়ে সেদিকে দৌড়োল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। আর একজন বুড়ি একটি কাপড়ের অর্ধাংশে লজ্জা নিবারণ করে বসে আছে, নিরঞ্জন শুনল সে-ও বলে চলেছে—আবার অরা আইলো। আইবো আইবো। অখন কত আইবো। পাকিস্তান হইছে অখন ব্যাবাক দেশ বিখারী হইয়া যাইবো।

আপন মনেই বকে চলেছে বুড়িটা। তার কথা কিছু বুঝল না নিরঞ্জন। সে এগিয়ে গিয়ে সকলের পরে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানেই জিনিষপত্র নামাল। অমনি কোত্থেকে এক ছোকরা ছুটে এল হাঁ হাঁ করতে করতে। বছর চোদ্দ পনের বয়স হবে খালি গা, গলায় একটি কালো সুতোর সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতবাহী হনুমানের ছাপ মার্কা তাবিজ। পরণে এমন একটি প্যাণ্ট যা কোন পূর্ণবয়সের ব্যক্তির উপযোগী বলে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নেমে ঝুলছে। মাতৃভাষা বাংলা না হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি বাংলাতেই বলল—এখানে বসবে না।

কেন ?—নিরঞ্জন জানতে চাইল।

উধার যাও—যেদিক থেকে ওরা এসেছিল সেইদিকেই হাত তুলে দেখিয়ে দিল ছেলেটি।

ইখানে কি হবে—নিরঞ্জন আবার প্রশ্ন করল।

ইখানে বোসা হোবে না। সব ফেলিয়ে দিব।

ক্যানে ফেলবা ?

হমার খুশি।

পাশের বুড়োটাও ছোকরাটির সঙ্গে যোগ দিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল—যাও যাও, ভাগ এখান থেকে।

এক বুড়ি নিজের জায়গায় বসে চিৎকার ক'রল—তাইড়ে দে, তাইড়ে দে ওগুনোকে। আমরাই ভিক্ কে পাইনি আবার কোত্থেকে এসে আপদ জুটলো।

নিরঞ্জন বুঝে নিল গোটা পরিবেশ প্রতিকূল। কাজেই চুপ ক'রে রইল প্রথমটায়। সকলের চিৎকারের ঝোঁকটা কাটলে সে বলল—রাগ ক'রো নি বাবা, আমরা এখেনটায় বসি।

ছোকরাটির ভাবে কোন পরিবর্তন হ'ল না! শুধু বলল—পঁচিশপয়সা রোজ দিতে হবে হমাকে।

বক্তব্যটি ঠিক অনুধাবন ক'রতে না পেরে নিরঞ্জন বলল—তোমার কিছু ক্ষতি ক'রবোনি বাবা।

ওসব জানে না, এখানে বসে ভিক্ষে ক'রতে হোলে হমাকে রোজ পঁচিশ পয়সা দিতে হোবে। এ সাফা বাত।

রোজ পঁচিশ পয়সা !

হাঁ।

কোথা পাব বাবা ?

কামাবে আর হামাকে দিবে না ? ফোকটসে কাম চলবে না।

আচ্ছা দেখি কি হয়।

দিবে কি না বোলো—।

হলে দেব।

হোলে উলে নেই, বসলে দিতে হোবে।

নিরঞ্জন আর বাক্যব্যয় না ক'রে কাপড় বিছোতে লাগলে ছোকরাটি চলে গেল। সীতা দেখল সামনে একটা ছোট পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দোকানীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছোকরা হাসতে লাগল। হাসির চাপে যেন ফেটে পড়ছিল অথচ এখানে এসে একটু আগেই কি রুক্ষ কথাই না বলছিল ! এখানকার লোকগুলোকে একদম বুঝতে পারে না সীতা। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে কিছুতেই বুঝছে না।

রাস্তায় ক্রমেই লোক চলাচল বাড়ছে। পাশের লোকগুলোর কাপড়ে অনেক ক'টা পয়সা পড়েছে অথচ নিরঞ্জন তাকিয়ে দেখল তাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র। সে লক্ষ ক'রল কোন লোক এলেই সমস্বরে সকলে প্রার্থনা জানাচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ওদের মত সোচ্চারে চ্যাচাবার ইচ্ছে করেও পারল না নিরঞ্জন। মনে হ'ল ভেতর থেকে কে যেন স্বরটাকে চেপে ধরছে। রাস্তার ওপাশে একজন লোক বসে বসে খঞ্জনী বাজাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই দেখছে ; এখন দেখল তার সঙ্গে এক জায়গায় মিল আছে লোকটির, লোকটিও মুখে কোন কথা বলছে না শুধু তালে তালে বাজিয়েই চলেছে অবিরাম, এমনকি গানও গাইছে না। আরও আশ্চর্য এই যে একটা লোকও ওর দিকে যাচ্ছে না এবং কেউ ভিক্ষে দিচ্ছে না তবু লোকটার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটাকে দেখে বিস্ময় হল নিরঞ্জনের, এখানে অদ্ভুৎ ব্যতিক্রম মানুষটা, এখানে কারও সঙ্গে মিল নেই। আর নেই বলেই একেবারে আলাদা একা বসে আছে। মাথায় দুব্বোঘাসের চেয়েও ছোট করে ছাঁটা চুল, গলায় তুলসী মালা. কপালে তিলক বেশ স্পষ্ট করে আঁকা। গায়ে কোন আচ্ছাদনও নেই। উন্মুক্ত দেহে ছোট এক টুকরো কাপড় পরে খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে চোখ বন্ধ ক'রে। যে তন্ময়তা লোকটিকে অভাববোধ মুক্ত ক'রেছে তা ওকে মুগ্ধ ক'রল।

সীতা মদনকে একপাশে শুইয়ে দিল। তারপর ভাবতে লাগল কি করা যায়। চুপচাপ বসে থাকতে তার ভাল লাগছে না, চলমান জনতার সামনে নিষ্কর্মার মত বসে থাকতে নিজেকে কেমন যেন মনে হচ্ছে। অথচ কি করবে কিছু ভেবে পেল না। কতদিন সে রান্না করেনি, তার মনে পড়ল।

সুযোগ আসে নি রান্না করবার। কোনক্রমে কোনদিন একবেলা খেয়ে কখন না খেয়ে দিন কেটেছে, ক্ষুধাকাতর রাত কেটেছে নিদ্রার অনুগ্রহে। মনে পড়ল তার গ্রামের বাড়ীর কথা সেই রাঙচিতার বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটু আঙিনায় দক্ষিণলাগা রান্নাঘরের ছোট্ট উনোন আর ঝকমকে নিকানো তার মাটির মেঝে। এমন কি তার সেই ছোট্ট পিঁড়েটার কথাও মনে পড়ল যেটার ওপর বসে রান্না ক'রত সে। সেই যে বার ভোলাবাবুদের বাগান বিক্রী হয়ে গেল, ভিনদেশী মহাজন এসে কেটে নিয়ে গেল গাছগুলো সেবার সেই বাগানে গাছ কাটার কাজ ক'রতে গিয়ে নিরঞ্জন একটা কাঁঠালের ডাল এনেছিল তাই ফেড়ে তক্তা ক'রেছিল এবং তার রান্না করার জন্যে পিঁড়েও করে দিয়েছিল একটা। অত সাধের পিঁড়েটাকে বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় আনতে পারে নি সীতা। ভার বলে ফেলে এসেছে। একদিন যা বহু সখে ক'রেছিল আর একদিন তাই আবার ফেলে এল অবহেলায়। শুধু সেটাই বা কেন কত সখ ক'রে সামান্য ক'দিনের সংসারে কত জিনিষই সংগ্রহ ক'রেছিল সীতা আজ তার কি বা অবশিষ্ট আছে? তবু যে কটা জিনিস সঙ্গে করে বেরিয়েছিল আজ তাও তো নেই। তার অনেকেই আজ পরিত্যক্ত। যা আছে তারও রূপ নেই, আকার নেই। সামান্য বিছানা তাও ছিঁড়ে এসেছে, কালো হয়ে গেছে। একটাই মাত্র বালিশ ছিল ফেটে যাবার জন্য ফেলে দিতে হয়েছে রাস্তায়। শেষ পর্যন্ত যে কি থাকবে আজ আর সীতা ভাবতেই পারছে না। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে একটা অন্ধকার বন্ধ ঘর ভেসে উঠছে তার চোখে, শুধু অতীতের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নিজের বাপের বাড়ীর কথা। মনে পড়ছে তার মা বাবা, মরল এক দিনের ব্যবধানে ওলাওঠায়। তৃতীয় দিনে সংবাদ এসে পৌছাল তার কাছে। সংবাদ শুনে বাপের বাড়ী গিয়ে দেখল তার ভাই দাওয়ায় বসে গাঁজার কল্কেয় মশলা পুরছে। এবং অল্পদিন বাদেই সে আবার খবর পেল বাকী বলদটা আর হাল জমি বিক্রী ক'রে তার একমাত্র ভাই কোনদিকে রওনা হয়ে গিয়েছে কলকেটি পকেটে নিয়ে, তবে সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই ক'রবার জন্তে একদিন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নিরঞ্জন খবর পেয়েছিল ভিটেটি পর্যন্ত বিক্রী ক'রে গিয়েছিল তার শ্যালক। সীতা তারপর থেকে ভাই-এর আর কোন সংবাদই পায় নি।

এতদিন যে সব কথা মনেই ছিল না আজ আবার সেই সব কথা মনে পড়ছে। সারি সারি ছবির মত স্মৃতিগুলো উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে মনের ওপর দিয়ে। হঠাৎ একটা পয়সা গড়িয়ে আসতেই ভাবনার সূত্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। সামনে রাখা কাপড়ের ওপর পড়ে পয়সাটা তার দিকে গড়িয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি থামাল সীতা। সামনের ভিক্ষা বস্ত্রের দিকে নজর পড়ল সীতার, যতগুলো পয়সা পড়েছে প্রায় সবই দু পয়সার মুদ্রা। অনেক খুঁজে দেখল

একটা মাত্র পাঁচ পয়সা পড়েছে। ভাবল পয়সাগুলো গুটিয়ে নেয়, সেটা আবার ঠিক হবে কিনা ভেবে তা না ক'রে বসেই রইল সে।

একটু একটু ক'রে রোদ চড়ছে, যাত্রী কমছে সেই সঙ্গে। বেশ কয়েকজন পয়সাগুলো তুলে নিয়ে কাপড় পেতে অদূরে ছায়ায় বসে আগলাচ্ছে, দু একজন যারা মাথার ওপর গাছের ছায়া পেয়েছে তারাই কেবল বসে তখনও প্রাতঃকালের স্বরেই বলে চলেছে জয় হোক মা ঠাকুরাণীর, জয় বাবাসকল একটা পয়সা দয়া ক'রে দাও বাবা, অথবা গরীবকে একটা পয়সা দে যাও বাবা। মাথার ওপর চনচনে রোদের উত্তাপে যেন চাঁদি ফেটে যাচ্ছে, নিরঞ্জন নিজের মাথায় হাত দিয়ে তাপ অনুভব করার চেষ্টা ক'রে একবার চারপাশে তাকাল ছায়ার খোঁজে। ব্যর্থ হয়ে ভাবল কি ক'রবে, রোদের তেজ প্রথম প্রহরেই যা বেড়েছে তাতে আর থাকা চলে না। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মদন ঘুমিয়েছে। আর তার মুখের ওপর একটা কাপড় চাপা দিয়ে রোদ আটকেছে সীতা। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সীতা বলল—বড় খরা। চল সিধরে যাই।

মন্দিরের দিকে নির্দেশ ক'রল সীতা। তার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল ওদিকে থাকবার জায়গা হয়ত আছে। মনে হয়েছিল নিরঞ্জনের তাই প্রস্তাবটা মনে ধরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাপড় গুটিয়ে চলতে শুরু ক'রল পশ্চিম মুখে। একটু দূরেই দেখল ডান দিকে আর একটা গলি। রাস্তার মোড়ের খালি জমিটাকে ঘিরে রাখা প্রাচীরের ধারে ধারে রাজ্যের পরিত্যক্ত চট, ত্রিপল ইত্যাদি টাঙ্গিয়েই তাঁবু খাটানো হয়েছে। এবং তাতেই বাস ক'রছে অনেকে। পথের ধারে লোক বসে নেই প্রার্থী হয়ে, এখানে প্রার্থনা চলছে যাত্রীকে ঘিরে ঘিরে। চলমান প্রার্থীরা সকলে মিলে ঘিরে ধরছে একজনকে যতক্ষণ না সে সকলকে কিছু দিয়ে তুষ্ট ক'রছে। আরও এগিয়ে চলল নিরঞ্জনরা, এক ভদ্র-মহিলাকে ঘিরে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হচ্ছে শুনে দৃষ্টি আকর্ষিত হ'ল নিরঞ্জনের মহিলাটি প্রত্যেকের পাশেই আলগোছে পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়াতেই যেন সকলের উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উঠছে। আশান্বিত হয়ে নিরঞ্জনও ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেল টিনের মগটিকে হাতে নিয়ে। ভিড়ের মধ্যে থাকতে পারল না সে কোন মতেই। আরও যারা ঢুকতে না পারছিল তাদেরই মত হাত এগিয়ে দিল সে সকলের মাথার ওপর দিয়ে। ভিড়ের চাপে ছিটকে সরে যেতে বাধ্য হলেও আবার শক্তি প্রয়োগ ক'রে এগিয়ে গেল। হঠাৎ শুনল একজন চেঁচিয়ে উঠল—এই ব্যাটা ঠেলছিস কেন রে?

সচকিত হয়ে নিরঞ্জন দেখতে চেষ্টা ক'রল কথাটা তাকেই বলা হচ্ছে কি না জটাজুটধারী রোষকটাক্ষপাত ক'রে একজন খর্বাকৃতি কালো লোককে বলল দেখে আবার সে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রল। 'এই, এই তুই যে আবার নিচ্ছিস'

—আবার ভয় পেল নিরঞ্জন, কে জানে আবার তাকেই কেউ বলছে কিনা আশ্বস্ত হ'ল একজনের জবাব শুনে—কোথায় ডুবার নিলাম রে মুখপোড়া ? চোখে ধুতরোর ফুল দেখছ ভ্যাকরা মিন্‌সে ! বক্তা মহিলা, ছোট্ট ছোট্ট করে চুল ছাঁটা—অর্ধেক তার সাদা হয়ে গেছে অর্ধেক ধূসর। মাংসলুপ্ত শিথিলচর্ম সরু হাড়ের হাতে তোবড়ানো একটা এলুমিনিয়ামের বাটি ধরে অর্থ ভিক্ষা ক'রছে। দেহের তুলনায় কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক জোরালো। আর সেই সতেজ কণ্ঠে সে সম নে চিৎকার করে চলল—মুখে আগুন, মুখে আগুন অমন ওলাউঠোর। যমের অরুচি হতভাগা হাড়হাভাতে লক্ষ্মীছাড়া। আমার সঙ্গে লেগে তুই কি সুখ পাস রে সব্‌বোনেশে ?—অন্যসকলে এমন কি যাকে উদ্দেশ্য ক'রে কটূক্তি মুষলধারে বর্ষিত হচ্ছিল সে পর্যন্ত ভিক্ষাদাতৃকে নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে ততক্ষণে। কিন্তু সেই বুড়ী ভিক্ষার প্রতি নজর ছেড়ে তখনও একইভাবে গালি দিয়ে চলেছে একপাশে দাঁড়িয়ে। হাতের মগে ঠক ক'রে শব্দ হতেই নিরঞ্জন সরে এল ভেতর থেকে। পৃথক হয়ে সে দেখল সীতা তখনও ভিড়ের সঙ্গে লড়ছে একটি মুদ্রার জন্যে। আর ওই বুড়ী আকাশের দিকে চেয়ে অবিশ্রাম কুবাক্য বর্ষণ ক'রে চলেছে। অবশেষে এমন অশ্লীল বাক্য এক একটা প্রয়োগ ক'রতে আরম্ভ ক'রল যে নিরঞ্জন একটু অস্বস্তি অনুভব ক'রল। ওপাশটায় সরে যেতে গিয়ে নিরঞ্জন বুঝল কে যেন পেছন দিক থেকে তার জামাটা চেপে ধরেছে। পেছন ফিরে দেখল যে ছোকরাটি ভিক্ষেয় বসতে দেবার বিনিময়ে পঁচিশ পয়সা দাবী ক'রেছিল সে-ই হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছে তার জামা। নিরঞ্জন মুখ ফেরাতেই বলল, কি বে, হামার পৈসা না দিয়ে সড়াকসে ভাগলে কেন বে ?

সেথাকে পয়সা পেলাম নি যে—নিরঞ্জন জানাল।

পেলাম না কি হ'ল ? ও সব ছোড় হমার পৈসা দেও।

নিরঞ্জন ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলল—জামা ছাড়।

পৈসা দেও হমার।

আগে জামা ছাড় তারপর কথা বলব।

নেহাৎ মস্করা ক'রেই জামা ধরেছিল ছেলেটি তাই ছেড়ে দিয়ে মুখের সামনে হাতটা পেতে বলল—হমার পৈসা দেও আমি চালিয়ে যাবো। ছোকরাটি এমন নাছোড়বান্দা যে নিরঞ্জন ভেবেই পেল না কি ক'রবে। একলা সে পয়সা খুব বেশী হ'লেও ষাট সত্তরটার বেশী পায় নি। আর কিছু চাল পেয়েছে যাতে একবেলার ভাত হতে পারে। এর মধ্যে থেকে পঁচিশ পয়সা দিলে থাকবে কি তার ? আবার ভাবল এখানে এসে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারাও যাবে না। ছোকরাটি পশ্চিমা। পশ্চিমাদের সম্বন্ধে তার ভয় আছে। যত যায়গাতেই

সে গেছে দেখেছে দারোয়ান সব পশ্চিমাই হয় এবং তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। শুধু তাই নয় তাদের গ্রামের বজরঙলাল ইঁটওয়ালা পশ্চিমা, কি তার মেজাজ রে বাবা, কি বিক্রম! দুনিয়ার কাউকেই গ্রাহ্য করে না। এরা এমনই হয়ে থাকে অতএব এর সঙ্গে ঝগড়া না করাই ভাল। সেই ভেবে নরম স্বরে নিরঞ্জন বলল, দেখ বাপু পয়সা তো আজ পেলাম না। তুমি এই নাও— বলে দশটা পয়সা তার হাতে গুঁজে দিয়ে হাত চেপে ধরল।

ছোকরাটি হাত ছাড়িয়ে পয়সা গুণে দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল, ওসব হোবে না। আউর পনর পৈসা দেও।

ওই নে ভাই।

মুহূর্তের মধ্যে চোখে মুখে উগ্র ভাব ক'রে ছেলেটি বলল—আউর দেও।

কেমন একটু ভড়কে গেল নিরঞ্জন। আর একটি পাঁচ পয়সার মুদ্রা হাতে তুলে দিয়ে বলল—যা বাবা যা, আজ এই নে যা।

ঠিক আছে ও বেলা আউর দশ লিবো—জানিয়ে প্রস্থান ক'রল ছোকরাটি।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চেয়ে দেখল সীতা আসছে। তার আঁচল ধরে মদন আসছে হাঁটতে হাঁটতে। ওরা আসতেই নিরঞ্জন রাস্তার ধারে যেখানে জিনিষগুলো নামিয়ে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল সেখানে পৌছে দেখল তার ছোট পোটলাটি নেই। বিছানা ঠিক পড়ে আছে অথচ পাশের ছোট্ট পুঁটলিটা নেই যেটায় তার একটা ধুতি এবং সীতার অবশিষ্ট একটি আধ ছেঁড়া শাড়ী ছিল বাঁধা। মদনের একটা সার্টও ছিল তাতে। সার্টটা এবার পুজোয় অনেক কষ্টে কিনে দিয়েছিল সীতা। আর যে কি কি ছিল সব সুনির্দিষ্ট ভাবে মনে পড়ে না। কতগুলো কৌটো আর কলাইকরা থালা ছিল দু খানা, এটা এখনও স্মরণ ক'রতে পারছে নিরঞ্জন। কিন্তু পোটলাটা গেল কোথায়? চারিদিকে খুঁজতে লাগল। সীতা জানতে চাইল—কি খুঁজতেছ?

মাল ক'টা এখেনেই রেখি গেলাম কোথায় যে গেল বুঝতিছি না তো!

হেথাকে রাখলে কেন?

ভিখ মাগতে গেলাম যে—।

চারিদিকে খুঁজল সীতা কিন্তু এত বড় উন্মুক্ত পথে কোথাও সে তার পোটলাটা দেখতে পেল না অথবা এমন একজন কাউকে দেখল না যার কাছে অনুসন্ধান ক'রতে পারে। সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেকে সজোরে একটি চড় লাগিয়ে বলল—ওর জন্যেই তো যত।

ও কি ক'রল—নিরঞ্জন প্রতিবাদ ক'রল।

কেন, বসতে পারে না এক জায়গাতে? জিনিষের কাছে বসতে পারে না? সব সময় সাথে চলবে—বলেই আর এক চড় কসিয়ে মনের ঝাল মেটাল।

জিনিষপত্র সব হারিয়ে যাওয়াতে নিরঞ্জনের মন ভাল ছিল না বলে সে আর খাদ্য প্রতিবাদের মধ্যে গেল না। কে যে নিল এই অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁজতে থাকল বাঁ দিকের রাস্তায়। সীতা দাঁড়িয়ে মনকে প্রবোধ দেবার জন্যেই চারিদিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসে টস টস ক'রে পড়তে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ এধার সেধার ঘুরে ফিরে এল নিরঞ্জন। কেউ চুরি ক'রেছে এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতার জন্যে আদৌ প্রস্তুতি না থাকায় ঘটনাটা হকচকিয়ে দিল তাকে। সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়ল সীতার মুখোমুখি হয়ে, সে সীতার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারল না। বিশ্ব সংসারে নিজের বলতে যা কিছু আছে সবই ছাড়তে ছাড়তে নিঃস্ব সীতা শেষে সংসারের যে অবশিষ্ট অংশটুকু পূর্ণাঙ্গের মত বয়ে বেড়াচ্ছিল সেটুকুও এভাবে অপহৃত হওয়াটা যে তার কাছে ঘর ছাড়ার চেয়ে কিছু কম বেদনাদায়ক নয় একথা সহজাত্মমেয় বলেই নিরঞ্জন কি বলবে বা কি ক'রবে কিছুই ভেবে পেল না। মাথার ওপর ততক্ষণে রোদ লাগতে সুরু ক'রেছে প্রচণ্ড। সেই উত্তাপে যেন সমস্ত শরীর জ্বলছিল মরিচ স্পর্শের মত। দুজনে একই সঙ্গে পশ্চিম মুখে এগিয়ে চলল। নিরঞ্জন লক্ষ ক'রল এখানে আগের দেখা সেই রকম সব বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো গোছানো বাড়ী কোথাও নেই। বরং যেখানে সেখানে রাস্তায় যথেচ্ছ জিনিষপত্র এবং আবর্জনা পড়ে আছে। সামনের হলুদ রঙের বাড়ীটা মোটামুটি বড় হ'লেও জানলা দরজা বন্ধ এবং মনে হচ্ছে বাড়ীটার ওপরে ধূলোর পর্দা পড়ে গেছে। রাস্তার ধারে এখানে ওখানে ঝুপরি খুপরি। নানা রকম বাজে জিনিষ দিয়ে কোনক্রমে মাথা গোঁজবার জায়গা ক'রেছে কতজনে। নিরঞ্জন ভাবতে লাগল কাদের আস্তানা এগুলো কে জানে। বাঁ দিকেই ছোট্ট একটু মাঠ তা আবার কত রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। মাঠের পাশে পায়ে চলার পথের ওপরে ত্রিপল, চট বা ভাঙ্গা টিন চাপা দিয়ে ঘর ক'রে নিয়ে বাস ক'রছে গুটিকতক লোক।

ইঁটের উনোন তৈরী ক'রে ফুটপাথের ধারে রান্না চড়িয়েছে একজন। এখানে যখন অনেকেই বাস ক'রছে নিরঞ্জন ভাবল এখানেই আজকের মত রান্নার ব্যবস্থা করা যাক। সীতাকে কোন কথা বলবার প্রয়োজন হ'ল না। পার্কের প্রাচীর ঘেঁষে বিছানা নামাতেই সীতা পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে নিজের ও নিরঞ্জনের চালের পুঁটলি দুটো খুলে চাল একত্র ক'রল। ভাবল এবেলা রান্নাই বা ক'রবে কি ক'রে কারণ রান্নার কোন জোগাড়ই নেই, উপরন্তু যা দুটো থালা একটা এলু-মিনিয়ামের গ্লাস ছিল তাও তো চুরি হয়ে গেল আজ। রান্নার সামগ্রীর মধ্যে আছে শুধু দুটো চাল, আর কিছু তো নেই। আগুন করবার আয়োজনও নেই

কাজেই রান্না করার ইচ্ছা বাদ দিয়ে সীতা এ বেলাকার মত অন্য কোন বন্দোবস্ত করায় আগ্রহ প্রকাশ ক'রল, বলল—রান্না করা হবে কি সে ?

এতক্ষণ এই ভাবনাটা নিরঞ্জনের মনে না আসায় সে বিস্ময় বোধ ক'রল। এবং সীতার কথায় সায় দিয়ে ভাবতে সুরু ক'রল কি ভাবে এ বেলাকার অন্নের সংস্থান করা যায়। দুজন মিলে যা পয়সা পেয়েছে তাতে কিনে খেতে গেলে তিনজনের কুলোবে না। তাছাড়া এই অজানা অচেনা জায়গায় খাবার জোগাড় ক'রতেই বা সে যাবে কোনদিকে ? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে বলবে খাবার দাও। বড়ই চিন্তায় পড়ল নিরঞ্জন।

সীতা চেয়ে দেখতে লাগল ওপাশে বুড়ীটা বসে রান্না ক'রছে। বোধহয় ডাল চড়িয়েছে মাটির বড় সরায়। ছোট্ট খুপরীটার মধ্যে আর একটা অল্প বয়সী মেয়ে একান্তে বসে চাল বাচছে। যে রাঁধছে তার দিকে তাকিয়ে সীতা দেখল রুক্ষচুলগুলোর চারদিকে কিছু কিছু কাঁচার আভাস, মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে এবং মুখ খানা তোবড়ানো। চুলের তামাটে রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রেই যেন রঙ ধরেছে মুখের চামড়ায়। দুটো চোখ তার এত বেশী কোটরে প্রবিষ্ট যে এই দূরত্ব থেকে তাতে কোন দীপ্তি আছে কিনা দেখাই যায় না। একখানা ছোট রঙীন কাপড়ে কোন রকমে গোপনাঙ্গের মর্যাদা রক্ষা ক'রছে মাত্র। তাও তাতে এত জায়গায় এত রকমের তালি যে আর কিছুদিন বাদে মূল কাপড়টির বর্ণই অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে সীতা নিজের পরিধেয়টির কথা ভাবল এবং তুলনামূলক বিচার ক'রে দেখল অনেক ভাল ওই বুড়ীটার চেয়ে। একদিন তার কাপড়টিও যে অমনি হয়ে যাবে এ কথা ভাবল না সীতা, আর এক জনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কাপড় সে পরে থাকতে পেরেছে এরই জন্যে কিঞ্চিৎ আত্মতুষ্টি লাভ করা সম্ভব হ'ল তার পক্ষে।

নিরঞ্জন ভাবছিল অন্য কথা। আসবার সময় পথের পাশে বাঁ দিকে যে হোটেলটা দেখেছিল সেখানে বাসি ভাতটাত দুটো কি পাওয়া যাবে না ? দেখবে না কি একবার গিয়ে ? বাসি দুটো ভাত পেয়ে গেলে মন্দ হ'ত না। একবার নিরঞ্জন ভাবল সে নিজেই যায় ভাতের চেষ্টায় আবার ভাবল সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মেয়েছেলে দেখে দয়া ক'রতে পারে হয়ত। কাজেই সীতাকে বলল—চল বউ, দুটো ভাত পাওয়া যায় কিনা দেখে এসি।

কথাকে যাবা—সীতা প্রতিপ্রশ্ন ক'রল।

উই হোটেলটির পানে।

সেথা তুমার লিগে কি খাবার নিয়ে বইসেছে সব ?

পয়সা দিলে ভাত মিলবে নাই ?

মিলবে কেন নাই ? পয়সা কোথাকে পেল্যা ?

এবেলা যা পেলাম ওই পয়সা দিয়ে কিনব।

সেব্‌লা কি ক'রবে তবে? সব তো হারিয়ে বসলে রান্নার ব্যবস্থা ক'রতে হবে নি?

......তাও তো বটে, নিরঞ্জন ভাবল, বরং এবেলা কিছু খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে সন্ধেবেলায় ছুটো চাল ফুটিয়ে পেট ভরে খাওয়া যাবে। ঠিক ক'রল হোটেলের লোকের কাছে গিয়ে চেয়ে দেখবে ওদের বাসি ভাত ছুটো পাওয়া যায় কিনা অমন কত ভাতই তো রোজ রান্না হয় নষ্টও নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে, কাজেই সেই নষ্ট ভাতগুলো ফেলে না দিয়ে কি ওরা গরীবকে দেবে না?

নিরঞ্জন অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল।

সীতা নিরঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল নিজের চার-পাশে। যেখানটায় সে বসে আছে সেখানটা ঝাঁট দেবারও উপায় নেই একটু; কি দিয়ে দেওয়া যেতে পারে ভেবে পেল না। রাতটা যে এখানেই কাটাতে হবে তাতে সন্দেহ কি? তাই জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন। মদনকে তুলে কাপড়ের আঁচলটা দিয়ে আলগা ভাবে পাতলা ধূলোগুলো উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রতেই তীব্র স্বরে বাধা এল অদূরবর্তিনী রন্ধনরতার কাছ থেকে, ছ্যাখছ নি তামসা? এই দিকে যে রান্দি দেখস না? চক্ষু দুইটা খাইছস নি মাউগ্যা?

মহিলাটির বাক্য একবর্ণও বুঝল না সীতা, কেবল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল সরোষ কটাক্ষে তার কাজের প্রতিই ক্রোধ বর্ষণ ক'রছে। তাকে দেখে হাত মুখ নেড়ে প্রৌঢ়া বলল—এই দিকে যে রান্তাছি আর তুই ধূলা উড়াস ক্যান রে পোড়াকপাইল্যা?

সব কথা না বুঝলেও গালাগালিগুলোকে বুঝতে পারছিল সীতা অনুমানে। তাই প্রতিবাদ ক'রল—গালাগালি দিতেছ কেন গো?

ক্যান দিতাছি বুঝস না? আমি এইখানে রানতাছি তুই ধূলা উড়াস ক্যা রে মাউগ্যা? অরে গালি দিবো না কুলে কইর্‌য়া চুমা খাইব, অ্যা, রে আমার সুহাগ রে—?

ভাল কথা বললেও বুড়ীটা গালাগালি দেয়! ভয়ানক বদমাস তো, সীতা ক্ষেপে গিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে শাসাল—ফের যদি গালাগালি দেবে তো বুঝতে পারবে—।

এতক্ষণ যেটুকু সংযম ছিল সেটুকুও ছুঁড়ে ফেলে প্রৌঢ়া কর্কশতম স্বরে বলে চলল—তবে রে ওলাউঠা সর্বনাশী মাগী তর চক্ষু উলটাইয়া ফালামু যদি আবার ধূলা উড়াস।

আঁচলাটা কোমরে জড়িয়ে সীতা রুখে দাঁড়াল—আয় না দেখি তোর সাহস

কত। আয় দেখি কি করিস তুই, দেখি তোর কত বড় ক্ষ্যামতা।

ঝাড় তুই ধূলা, ঝাইড়া গ্যাখ তর কি করি—প্রৌঢ়া পাণ্টা শাসাল সীতাকে। যে লোহার টুকরোটা খুন্তির কাজে ব্যবহার ক'রছিল সেটাকে নামিয়ে বসে বসেই বলল সে নিজের প্রতি প্রভূত আস্থা সহকারে।

সীতা ব্যাপারটা খুব ভালভাবে বুঝল না এবং গলার স্বর নীচু ক'রে নিজের মনেই গজরাতে লাগল। ওদিকে প্রৌঢ়াটি কিন্তু থামল না তখনও, কণ্ঠস্বর সমান পর্দায় রেখে সে বলে চলল, আইজ দুই বছর ইখানে বইছি এখনতরি কেউ আমার লগে লাগতে আহে নাই। আর উনি আইলেন আইজ কাইজা করবার। ধূলা উড়ান! দিমুনে ধূলা গুয়ার মইধ্যে ভইরা।

আরও অনেক কটূক্তি বর্ষণ ক'রে গেল সে অঝোর ধারায়। সে সবের অর্দ্ধেক সীতা বুঝল অর্দ্ধেক বুঝল না। অবশ্য না বোঝার সুফল হ'ল এই যে ঝগড়াটা তখন আর বেশীদূর গড়াল না।

ঝুপড়ির মধ্যে যে অল্প বয়সী মেয়েটা বসে এক মনে চাল বাচছিল এবার সে তাকিয়ে দেখল এদিকে। সীতা অনুমান ক'রল বয়স তের চোদ্দর বেশী হবে না। অনাহারে দেহখানা রোগা, অনেকটা পাকানো, ফলে সময়োচিত বৃদ্ধি নেই কোন স্থলেই। রং জলে যাওয়া ময়লা একটা শাড়ী নিজের জীর্ণতা সত্ত্বেও ধারকের দেহকে আচ্ছাদনের তুষ্টি দিচ্ছে মাত্র। মেয়েটা সীতাকে একবার দেখে নিয়েই নিজের কাজে মন দিল। সীতা কিন্তু তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে, দেহে পরিপুষ্টির অভাব থাকায় কিশোরীর পূর্ণতা আসে নি তবু কি যেন এক উজ্জ্বলতা এসেছে। সেই উজ্জ্বলতায় ভালই দেখাচ্ছে তাকে। ভাল দেখালেও মেয়েটির প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারল না সীতা, ওর মায়ের কটূ বাক্যগুলো সীতাকে মেয়েটির প্রতিও নীরব বিরক্তিতে পূর্ণ ক'রে তুলল। ওই মায়েরই মেয়ে তো কত আর হবে। আরও রাগ হচ্ছিল সীতার একাকীত্বের জন্যে। নতুন জায়গায় একা একা তাকে সহ্য ক'রে যেতেই হবে—বাধ্য হয়েই সীতা ধূলো পরিষ্কার করা বন্ধ ক'রে নোংরার ওপরেই বসে রইল। একবার কেবল ভাবল এই খোলা জায়গাতেই বসে থাকতে হবে কিনা, সে তা কিছুতেই পারবে না, ঘর না থাক মাথার ওপরে একটা আচ্ছাদন না থাকলে চলে কি করে? দেশ ছেড়ে আসাই ভুল হয়েছে সীতার মনে হ'ল। কলকাতার আশায় এতদূর এসে কি লাভ হয়েছে তার? পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, একটু রাত কাটাবার আশ্রয়ও কোথাও জুটছে না। আর সেই যে লোকটা কখন গিয়েছে এখনও ফেরবার নাম নেই! কোথায় যে গেছে কে জানে। মনে মনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হ'ল সীতা, ওঃ লোকে একেবারে ভাত নিয়ে বসে আছে ওনাকে দেবার জন্যে। কলকাতায় যে কত সুখ তা সে হাড়ে হাড়ে টের

পাচ্ছে, যা জীবনে কেউ কখনও ক'রে নি তাই করতে হ'ল তাকে। কোন পুরুষে কেউ রাস্তায় শুয়েছে কখনও? কোনদিন তার কোন কূলে কেউ দোকান ঘরের তলায় শুয়ে রাত কাটিয়েছে? তাও ক'রতে এই হ'ল এই মানুষের পাল্লায় পড়ে। এখনও যে কত কি করতে হবে তা কে জানে। ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তা সীতা অনুমান ক'রতে পারছে না। ওর কথা শুনে কলকাতায় না এলেই ভাল হ'ত। চিকিৎসা তো ছাই হচ্ছে। থাকবার খাবারই জায়গা জুটল না তার আবার চিকিৎসা। এর চেয়ে দেশে থাকলে বাবুদের কাছে চেয়ে একটু জমিতে আবাদ ক'রতে পারত তারা। কর্মশূন্যতার অবসরে নানা ভাবনার ভীড়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল, মদন দেয়াল ঘেঁয়ে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে খেয়ালও ক'রল না।

সাধারণ মানুষ পৃথিবীকে দেখে বাইরে থেকে। সেইভাবে দেখেই সব কিছুর বিচার করে তারা, বিচার করে মানুষেরও। জাহাজযাত্রী সবাই ডুবুরী নয় বলে সবাই দেখে সমুদ্রের জল নীল, দেখে অতল। এই দৃষ্টিতে দেখেই খাবার পাবার সহজ আশায় নিরঞ্জন অনুপ্রাণিত হয়ে পথের পাশের হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একরাশ এঁটো পাতা দোকানের সামনে রাস্তায় নর্দমার ওপরে পড়ে স্তূপ হয়ে আছে। নিরঞ্জন অবাক হয়ে দেখল একটি অস্থিচর্মসার লোক আর দুটো কুকুর একই সঙ্গে পাতাগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খাবার সংগ্রহ ক'রে খাচ্ছে। কুকুর দুটো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে দূরত্ব বজায় রেখেছে তা একটু ক'মে গেলেই গর্জন ক'রে উঠছে দুটোই কিন্তু লোকটি অম্লান মুখে পাতা সরিয়ে সরিয়ে খাবার খুঁটে খুঁটে খেয়ে চলেছে মুখ নীচু ক'রে। কখনও বা কোন পাতা তুলে নিয়ে চাটছে কখনও চাটছে হাত। নিরঞ্জন লক্ষ্য ক'রল লোকটির মুখে বেশ তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য হয়ে গেল এইভাবে খেতে দেখে। লোকটির মাথায় একমাথা উঠে উঠে পাতলা হয়ে আসা চুল, লম্বা লম্বা কিন্তু সংখ্যায় অল্প দাড়ি সারামুখে। পরণে যে কোন শ্রেণীর বস্ত্র তা নিরঞ্জন অনুমান ক'রতে পারল না, কেবল অনাবৃত উর্দ্ধাঙ্গের দিকে চেয়ে সে দেখল পাঁজরাগুলো বুঝি সবই গোণা যাবে লোকটির। তবে পাঁজরাগুলো যে চামড়া দিয়ে ঢাকা অত্যধিক ময়লা তার ওপরে চাপ চাপ হয়ে জমে থাকায় বর্ণ বুঝতে পারল না। নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে ভোজন ক'রে চলেছে লোকটা। বুকের লোমের ওপরে ভাল না কি লেগে রয়েছে নিরঞ্জনের লক্ষ্য পড়ল। কালো রোঁয়া ওঠা কুকুরটা ওর গায়ের কাছাকাছি এসে অভিনিবেশ সহকারে পাতা চাটছে, গায়ে গা-টা একবার ঠেকে গেল কিন্তু লোকটির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগল, ভাবল নিরঞ্জন। ভেবে তৃপ্তি পেল কারণ সুস্থ কোন মানুষের এই পরিণতির কথা ভাবতে পারল না সে। লোকটা একটা মাটির

ডাঁডকে আছড়ে ভাঙল। সেই শব্দে নিরঞ্জন বুঝল সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মনে পড়ল তার খাবার চাই। সাহস ক'রে এসেছিল কিন্তু কেন যে সেই সাহস আর খুঁজে পেল না সে বুঝল না তা নিজেই। হোটেলে উদ্বৃত্ত ভাত চাইতে এসেছিল সে মনে হ'ল কাদায় তার দুটো পা একসঙ্গে পুঁতে গেছে। হোটেলের দরজার মুখেই একমুখ দাড়ি সমন্বিত পাগড়ী মাথায় যে লোকটি বসে আছে তার মুখে কি নিদারুণ কাঠিন্য। একটু লক্ষ ক'রে নিরঞ্জন দেখল লোকটি পয়সা নিচ্ছে গুণে গুণে। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই আরও দমে গেল সে। অমন কঠিন মুখে যে টাকা গুণছে সে বিনা পয়সাতে কিছু দেবে না·· নিরঞ্জন ভাবল। উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা ক'রল আর কেউ আছে কিনা—ওই লোকটিকে এড়িয়ে যার কাছে যাওয়া যেতে পারে। তেমন কেউই নেই। নিরঞ্জন গভীর নৈরাশ্য সত্ত্বেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হোটেলের সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ডান হাতটি কপালে ঠেকাল অভিবাদনের ভঙ্গীতে। লোকটি নজর করল না দেখে ডাকল—বাবা!

নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে তাকে আর একবার নমস্কার করবার অবকাশ পর্যন্ত দিল না হোটেলওয়ালা, হাতের ইশারায় পথ দেখিয়ে দিল যাবার জন্য। নিরঞ্জন সেই অবসরে একবার নমস্কার ক'রে নিয়ে দুই হাত একসঙ্গে পেতে করুণভাবে বলল—কিছু খাইনি বাবু, দুটো ভাত—।

শুনেই লোকটির মুখের মাংস বদলে গিয়ে যেন ধাতু মূর্তি হয়ে গেল। সেই নির্মমতার দিকে চেয়ে নিরঞ্জন আবেদন খুঁজে পেল না। ছোটবেলায় ডাংগুলি খেলার সময় শক্তহাতের মুঠোয় ধরা ডাংয়ের আঘাতে যেমন ভাবে গুলিটাকে দূরে পাঠিয়ে দিত নিরঞ্জন তেমনিভাবেই তার নিবেদনের চেষ্টা উড়িয়ে দিল হোটেলওয়ালা রক্ত চোখের ভ্রূকুটিতে।

খানিকটা দূরে সরে গিয়ে নিরঞ্জন পথের ধারের আবর্জনাটার দিকে তাকিয়ে দেখল পাগলটা তখনও খাচ্ছে, একজন সুবেশ লোক পথের সেই অংশটি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পেরিয়ে গেল। নিরঞ্জন ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করল; সত্যিই দুর্গন্ধ ভেসে আসছে পচা খাবার আর নানা কিছুর সংমিশ্রণ থেকে। তবু করুণ দৃষ্টিতে তাকাল নিরঞ্জন, নিজেকে তার ওই পাগলটার চেয়েও অসহায় মনে হ'ল। সীতাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে সে, কি নিয়ে ফিরবে এখন? পেটে খিধের শূন্যতা নিয়ে বসে আছে তারা তারই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। এখন কোন মুখে সে শূন্য হাতে ফিরবে তাদের কাছে? কোন কিনারা না পেয়ে অন্তর তার কাঁদতে লাগল অব্যক্ত যন্ত্রণার চাপে। অন্তর্লীন কান্নায় সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পথের ওপর, এক পা এগোনো অথবা পেছোনো কিছুই ক'রতে পারল না কোনমতে। অসহায় দৃষ্টিতে অকারণে চারিদিকে

তাকাল একবার। পাগলটা তখনও পাতা আর ভাঁড় চাটছে। খেয়ে যারা পাতা ফেলেছে তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে ফেলেনি। তবু যে মানুষটা সেই শূন্য পাতায় কি চাটছে তা সেই জানে। ওই পাতার মধ্যেও যদি অন্তত বেশ কিছু ভাত কেউ না খেয়ে অথবা বাসি বলে হোটেলওয়ালা ফেলে দিত তাহলেও কুড়িয়ে নিত সে। কালো কুকুরটা দাঁড়িয়ে মুখ চাটছে, বোধহয় পেট ভরে গেছে ওর।

পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা ক'রছে, পা ধরে গেছে দাঁড়িয়ে আর হেঁটে। নিরঞ্জন নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও ফিরে চলল অনন্যোপায় হয়ে। কিছুটা দূর এসে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা ছোট মেয়ে বাঁ দিকের দোতলা বাড়ীটা থেকে নেমে এসে দুটো রুটি একটা গরুর মুখের কাছে ফেলে দিচ্ছে। নিরঞ্জন অনেকটা দৌড়ে হাজির হয়ে গেল দূর থেকে চিৎকার ক'রতে ক'রতে—খুঁকী ও কে দিও নি খুঁকী। আমায় দাও, আমায় দাও। কাছে গিয়ে গরুটার মুখ থেকে ছোঁ মেরে বাসি রুটি দুটো নিরঞ্জন নিয়ে নিল। ভয়ে গরুটার মুখে দিতে না পেরে ছুঁড়ে দেওয়ায় সামান্য একটু দূরে পড়েছিল রুটি দুটো। গরুটা শুয়ে শুয়েই জিব বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল বলেই নিরঞ্জন পেল। মেয়েটি হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে সে প্রশ্ন ক'রল—আর রুটি আছে খুঁকী? ভাত আছে? দুটো ভাত দেবে? মাকে গে বল না দুটো ভাত মাগছে।

মেয়েটি হকচকিয়ে গিয়েছিল নিরঞ্জনের প্রথম ব্যবহারে এবং গরুটা রুটি দুটো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধও হ'ল, তাই অপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই সে চেয়ে রইল নিরঞ্জনের দিকে,. এক পা এক পা করে ফিরে চলল কোন কথা না বলে। গরুটাও যেন অসন্তুষ্টি প্রকাশ ক'রল দুবার মাথা নেড়ে। নিরঞ্জন সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মেয়েটির বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেউ এল না।

অবশেষে শুকনো সেই রুটি দুখানা হাতে নিয়েই সে ফিরে গেল সীতার সামনে। মুখের ওপর ছায়া পড়ে ম্লান ক'রে রেখেছিল তার মুখাবয়ব, যা দেখে সীতার কোন কিছু অনুমান করাই আর কঠিন হ'ল না। জঠরের যন্ত্রণাকে সহ্য করার অভ্যেস তার অনেকদিনের। আজ এতদিনের অভ্যাসের দীর্ঘায়িত সীমাও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ব্যর্থ নিরঞ্জনকে ফিরতে দেখে পেটের আগুন দাবাগ্নির সঞ্চার ক'রল সারাদেহে। এছাড়াও তার ক্ষোভ জমে ছিল অপমানের—ওই যে বুড়ি আর ছুঁড়িটা পেছন ফিরে বসে বসে খাচ্ছে রান্না বান্না সেরে, ওই বুড়িটার কটূক্তির প্রতিশোধ তুলতে পারে নি সে। অপমান তীব্র জ্বালা ধরিয়েছিল মনে—তখনও জ্বলছিল। কাজেই ওইভাবে নিরঞ্জনকে ফিরতে দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল—এল্যা মানুষ খাকী মিনষা?

সীতার মূর্তি দেখে নিরঞ্জন রুটি দুখানা নামাতে পারল না। অনেকটা

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। মনে পড়ল কাপড়ের খুঁটে সামান্য কয়েকটা পয়সা বাঁধা আছে যা সকালে ভিক্ষেয় পেয়েছিল। ভেবেছিল পয়সা ক'টা যদি এবেলা খরচ ক'রে ফেলে ওবেলা দরকার হলে রান্না ক'রে খাবার সংস্থান থাকবে না। কিন্তু পরিস্থিতি সেই চিন্তাকে কার্যকর হতে দিল না। রুটি দুখানা সমেত হাতের টিনটাকে নামিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন বলল—তোরা খেয়ে নে। আমি আসতেছি।

নিরঞ্জন চলে যেতে অনন্যোপায় হয়েই সীতা রুটি দুখানা টেনে নিল। কিন্তু ভাবনা এল রুটি দুখানা ফেলে দিয়ে নিরঞ্জন যেভাবে চলে গেল তাতে তার খাওয়া হয়েছে বলে তো আদৌ মনে হল না! নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি তার। রাগ দেখিয়ে কোথায় যে মরতে গেল কে জানে? সীতার আরও রাগ হ'ল এমনি ভাবে না খেয়ে নিরঞ্জন চলে যাওয়ায়। এতক্ষণে যে কিনা খাবার জোগাড় ক'রতে পারল না দিনান্তের মরা সময়ে সে কি পারবে? কোথায় যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে কে জানে? অথচ এমন রাগ ক'রে কখনও তো যায় নি নিরঞ্জন, কত দিন তো কত ঝগড়া হয়েছে কখনও রাগ ক'রে ঘর ছাড়ে নি অথচ আজ পথের মাঝে তাকে ফেলে চলে গেল! এর চেয়ে তার সেই গ্রামেই না খেয়ে মরা ভাল ছিল। মদনকে তুলে শুকনো রুটি একখানা খাওয়াবার চেষ্টা ক'রতেই বিপর্যয় শুরু হ'ল। ভাত চাই তার, নইলে খাবে না। সীতা তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রল ভাত আজ পাওয়া যায় নি, কিন্তু পারল না। কাজেই রাগটা প্রয়োগ হ'ল মদনের ওপরেই। অবাধ্য ছেলেটা কয়েক ঘা মার অনায়াসে খেল, রুটি খেল না।

পাশের থেকে তীক্ষ্নকণ্ঠে বুড়িটা অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ইট্টুখান ছ্যামরারে অত মারে নি? ইস্‌রে, একেয়ারে মাইরা ফালাইলো!

মেয়েটি বসেছিল ফুটপাথের ওপরে। বুড়ির কথায় মুখ নাড়া দিয়ে বলে উঠল—অগো পোলা, হায় যদি মারে তুমি কথা ক্যান কও?

কমু না? মাইরা ফালাইতেছে পোলাটারে আর কমু না আমি?—এগিয়ে এল বুড়ি, সীতার দিকে তাকিয়ে বলল—ক্যান গো? ওইটুকু পোলারে ক্যান মারতে আছ?

সীতা বুড়ির প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না বলে মদনের হয়ে সে ওকালতি করাতে আরও দু'ঘা চড় কষিয়ে দিল নিজের ছেলেকেই। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার যেন সুযোগ পেল সে।

ওদিকে দ্বিগুণ ক্রোধে অভিসম্পাৎ দিতে লাগল বুড়ি সীতাকে। ছেলেকে ধরে মারছে বলে সহানুভূতিশীল হয়ে কথা বলতে এসেছিল সে কিন্তু তার কথা সীতা না মানাতেই রাগটা তার দ্বিগুণ হ'ল। নানা প্রকার কুবাক্যের

ব্যবহারে নিজেকেই যেন পরিতুষ্ট ক'রতে চেষ্টা ক'রল। সীতা বুড়ির আঞ্চলিক ভাষা ও গালাগালিগুলো পুরো হৃদয়ঙ্গম ক'রতে না পারলেও যতটা বুঝল তার ভিত্তিতেই জবাব দিয়ে চলল উচ্চকণ্ঠে। অবশ্য তার কথায় কটূক্তির চেয়ে যুক্তির অংশই বেশী কারণ তার প্রধান যুক্তি—আমার ছেল্যাকে আমি মারি বা যাই করি তা তোর কি রে মাগী? তোকে লাগে কেনে রে?

সে কথায় বুড়ি কান না দিলেও তার মেয়ে এ যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি ক'রে বলল—তোমার কি কাম মা? অর যা মনে লয় হ্যায় করবো তোমার কি দরকার সেইটায় টোপ ফ্যালনের?

তুই থাম—বুড়ি এক ঝামটায় থামিয়ে দিল মেয়েকে আর তারস্বরে চিৎকার জুড়ে বলল—হইল অর'পোলা, তার গতিকে মাইরা ফালাইবো পোলাটারে?

মেয়েটি আর অনর্থক বাক্যব্যয় না ক'রে নিজেদের চালার মধ্যে গিয়ে একখানা ভাঙা আয়না সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে বাইরেটায় বসে বসে কেশ পরিচর্যায় মনোনিবেশ ক'রল।

মেয়েটির কৃশতনুতে প্রথম যৌবনের স্পর্শ তখন সদ্য এনেছে চিররহস্যের ইঙ্গিত। পল্লবিত বক্ষে মুকুলিত বিস্ময় যুবচিত্তে বসন্তের সুরের ক'রছে সঞ্চার। পথিক পুরুষের দৃষ্টির আকর্ষণে বিব্রত না হয়ে মেয়েটি তাই গর্বিত। অদূরের শিরিশ শাখায় যে গর্ব ফুটে ওঠে বসন্তে, তারই প্রতিচ্ছায়ায় উচ্ছলতা এনেছে মেয়েটির মুখে। লোকে তাকায় তাকাক না, দেখছে দেখুক না তাকে। বিশেষ ক'রে মেঠাইয়ালা—মা যাকে বলে বদমাস। তা হোক না, কিন্তু কেমন ভাবে তাকিয়ে থাকে তার দিকে—খারাপ লাগে না। বরং কেউ তাকে অমন ভাবে দেখছে জানলে ভালই লাগে। মেঠাইওয়ালা এসেই প্রথম বুকের দিকে তাকায় তারপর মুখের দিকে। প্রায়ই বিকালের দিকে আসে, আজও হয়ত আসবে। মা অনুচ্চস্বরে গালাগালি দেয় লোকটিকে, অনেকটা আপন মনে দেয়, ওর ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ করে কিন্তু তা হলে কি আর উপায় আছে? টিকতে পারবে সে? কাজেই চুপ ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে আড়চোখে লোকটাকে দেখে, তেল চকচকে চেহারা, লম্বায় বেশী নয় চওড়ায় অনেকটা, মোটা মোটা হাত পা, খালি গায়ে এলে দেখা যায় কি চওড়া বুকের ছাতি। মুখে বেশ লম্বা গোঁফ আছে যা এখানে এলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাকায়, একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে। অনেক দিন আগে একবার ওপাশের রাস্তায় গিয়ে দোকান দেখে এসেছিল লোকটির, কতরকম খাবারই না সাজান থাকে—মণ্ডা, মেঠাই, সন্দেশ, লুচি, ওঃ কত কি! লোকটা মাঝখানে বসে থাকে। তখন সে বেশ ছোট ছিল। তবু এখনও মনে আছে তাকে সঙ্গে নিয়ে তার মা একবার হাত পেতেছিল দোকানে গিয়ে কিন্তু কিছু দেয় নি লোকটি। অনেক লোভ হয়েছিল তার, অন্তত পক্ষে একটা

জিলিপি পেলেও খুশি হ'ত, তাও পায় নি অবশ্য তাতে তারা কিছু মনে করেনি কারণ প্রত্যেকের কাছে চাওয়া এবং অনেকের কাছে না পাওয়া তাদের সমান অভ্যাস।

আমার পানের কৌটাটা কই রাখছস রে রেখা—বুড়ি খুপরীর মধ্যে থেকে জানতে চাইল। রেখা ভাবল উঠে গিয়ে খুঁজে দিয়ে আসে কিন্তু চুলের গোড়ায় ফিতেটাকে সগু জড়িয়েছে বলে আর না উঠে বলল—চিপ্যার পাশেই তো রাখছি। পাও নাই ?

অল্পক্ষণ বাদে বুড়ি জবাব দিল—কই থস্ আর কই কস্। চিপার ফাঁকে স্থান পয়সার কৌটা রাখছস।

পানের কৌটা পাও নাই ?

হ। পাইছি। তামুক পাতা তো নাই দেখি।—বলতে বলতে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এল বুড়ি। মেয়েকে বলল—দেখি তামুক পাতা কিন্যা আনি।

রেখা আর কোন কথা বলল না। বুড়ি তার নেশার সামগ্রী সংগ্রহে বেরিয়ে গেল। পয়সা খরচ হলেও এই জিনিষটা পয়সা দিয়ে কেনে রেখার মা। পানটা নেশার সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই সেটা বিনা পয়সায় সংগ্রহ ক'রে আনে। কখনও পচে ওঠা পান চেয়ে নিয়ে আসে, কখনও বাজার থেকে কুড়িয়ে আনে দু একটা, আবার কখনও অনেক পান দেখতে দেখতে কাপড়ের তলায় ক'রে লুকিয়েও নিয়ে চলে আসে।

রেখার নজর পড়ল পাশের ওই নতুন আসা বউটা কাঁদছে। কাঁদছে কেন ? রেখা ভাবতে চেষ্টা ক'রল। কান্নাকাটি তার ভালো লাগে না। চুলটা জড়াতে জড়াতে সে সীতার দিকে চেয়ে জানতে চাইল—কি হইছে, ক্যান কান্দ ?

সীতা তার দিকে তাকালও না এবং কোন জবাবও দিল না। রেখা ভাবল তার কথা শুনতে পায়নি বলেই বোধহয় উত্তর দিল না। চুলটা জড়িয়ে বেঁধে সীতার কাছে গিয়ে নিজের ভাষা ছেড়ে সস্নেহে প্রশ্ন ক'রল, কান্ছ কেন ?

সীতা আদৌ সন্তুষ্ট হ'ল না মেয়েটার গায়ে পড়া ভাবে। ওর মায়ের ব্যবহারে তার মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ছিল বলে মেয়ের কথা সে কানেই তুলল না। রেখার কথায় যে আন্তরিকতা ছিল সেটা তাকে স্পর্শ ক'রতে পারল না মনের প্রবল বিরূপতার জন্যে।

রেখা মনে কিছু ক'রল না, তবে আর কথা বলার প্রেরণাও পেল না। কিছুক্ষণ বোকার মত বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে ঝুপড়ির ওপাশে চলে গেল। মাকে রেখার প্রচণ্ড ভয়। যদি কখনও ওর মা এসে বৌটার সঙ্গে কথা বলতে দেখে হয়ত কোন কথা না বলেই মেরে বসবে তাকে। অবশ্য তামাক পাতা কেনবার নাম করে ওই যে বুড়ি গিয়েছে এখন আর সহজে

ফিরবে না রেখা জানে। এখন সে সমস্ত রাস্তায় ঘুরবে, এখানে সেখানে নানারকম জিনিষ দেখবে, আধা পরিচিত লোক পেলে তাদের সঙ্গে গল্প ক'রবে তবে ফিরবে। এর আগে যখন শিয়ালদহ স্টেশনে দেশের আরও অনেক লোকের সঙ্গে ওরা থাকত, তখন বেশী দেরী ক'রত না ওর মা। হয়ত এখানে সেখানে যেত পেটের টানে, সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসত। তখন প্রথম প্রথম রোজই গুজব শোনা যেত গাড়ী এসে ওদের সকলকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। রেখার মা সেই ভয়েই কোথাও যেতে পারত না। তার বড় আশা ছিল কোন ক্যাম্পে আশ্রয় পেলে একটু গুছিয়ে নিয়ে নতুন ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করা যাবে। কি বীভৎসভাবে যে তারা পাকিস্থান থেকে দেশের একদল প্রতিবেশীর সঙ্গে পালিয়ে এসেছে সে আজ ভাবতে ভয়। সেই ভীষণ দিনের কথা আজও চেষ্টা করলে মনে করা যায়, করতে পারে রেখা। তখন বয়েস যদিও খুব কম ছিল তবু রেখার আবছা মনে আছে সেদিনের দৃশ্যগুলো। পাশের বাড়ীর রাঙ্গা কাকা আসতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে সেই যে হারিয়ে গেল কাকী শিয়ালদহ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে এসেও আর তাকে কোনদিন খুঁজে পায় নি। রাঙ্গাকাকার ছেলেগুলো শিয়ালদহ স্টেশনের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়াত হঠাৎ একদিন কাকী তাদের নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। তাদের পাড়ার মধ্যে চোখে লাগার মত মেয়ে ছিল সবিতা। হারাণদাদুর মেয়ে। হারাণদাদু বলেছিলেন সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তিনি দেশ ছাড়বেন না। অথচ সবাই যেদিন চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত সেদিন রসুল মিয়ার লোকজন এসে হঠাৎ তুলে নিয়ে গেল সবিতাকে। কেউ আটকাতে পারল না। হারাণদাদুর বৌ মাটিতে আছড়ে কত কাঁদলেন কোন ফল হ'ল না। রেখারা সকলে মাসী বলত সবিতাকে। সবিতার ছোট বোন নমিতা তাদের সমবয়স্ক —সে বেচারীও রেখার মতই হকচকিয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে তার দিদিকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়াতে। তারপর শিয়ালদহ স্টেশনে থাকার কালে অনেকদিন পরে একদিন দেখেছিল হারাণদাদু সকলকে নিয়েই দেশ থেকে চলে এল কেবল সবিতা তাদের মধ্যে নেই। সকলে শীর্ণকায় হারাণদাদুকে ঘিরে ধরল কত প্রশ্ন ক'রল, জবাব শুনে সকলেই দুঃখপ্রকাশ ক'রতে লাগল এসব কথা আজও মনে আছে রেখার। কেবল প্রশ্নগুলো সে শোনে নি এবং জবাবও শোনে নি বলে সে সব কিছু জানা নেই তার। তারপর হারাণ দাদুকে কয়েকদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ হয়ে যেতে দেখল অভাবে, চিন্তায় এবং অনাহারে। ভাল ভাল প্যাণ্ট এবং চকচকে সার্ট পরা এক একদল লোক প্রায় প্রত্যেকদিনই আসত। এক একদল লোক এক এক রকম প্রশ্ন ক'রত কি কি লিখে নিত তারপর চলে যেত। প্রত্যেকদিনই তারা আশা ক'রত এরা

লিখে নিয়ে গেল এবার সাহায্য আসবে কিন্তু কোনদিনই সেই সাহায্য এল না। অবশ্য সাহায্য করার লোকও ছিল—একদল লোক বড় নিশান টাঙিয়ে চিড়ে গুড় কখনও বা খিচুড়ি খাইয়ে যেত তাদের প্রথম প্রথম। কোন কোন দল পুরানো জামাকাপড় সংগ্রহ ক'রে এনে দিয়ে যেত ছোট ছেলেমেয়েদের। মাঝে মাঝে দু-একটা শাড়ী যে জুটত না এমন নয়। নেহাৎ অপ্রচুর ওইসব সাময়িক সাহায্য পেয়ে লাভ যা হ'ত তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কোন সূর্যকরোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকবার ভরসা পেত মাত্র। তারপর জনস্রোত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে ভরে গেল শিয়ালদহ স্টেশন। সরকারী গাড়ী এসে সদ্য আসা দলকে কোথায় কোথায় নিয়ে গেল, কেউ কেউ নিজেরাই চলে গেল, হারাণদাদু গেলেন না। অনেকে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও তিনি নড়লেন না। তাঁর আশা যদি কোনদিন ছাড়া পেয়ে সবিতা ট্রেনে উঠে চলে আসে তাহ'লে তাঁদের না পেয়ে হারিয়ে যাবে কলকাতা সহরে। যাবে কোথায় বেচারী? কাজেই পাকিস্থান থেকে আসা প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রীর মুখে তিনি তাঁর প্রশ্ন বুলিয়ে যেতেন সে এল কিনা? তাদের গ্রামের মৃত ও নিহত বাদে প্রায় সব লোকই চলে এসেছিল তাই আশেপাশের গ্রামের কোন লোক এলে বা তাঁর পুরানো দিনের কোন ছাত্র এলে জানতে চাইতেন—মাইয়াডার সংবাদ কিছু জান নি? মাথা নাড়ত সকলেই নেতিবাচক ভাবে। রেখাও লক্ষ্য রাখত হারাণদাদুকে। কোন নতুন ট্রেনের আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলবার পরই তার মুখে নিঃস্ব ঔদাসীন্য ফুটে উঠত আর প্রলম্ব নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অবহেলায় বেড়ে ওঠা দাড়িগুলো কেঁপে উঠত গুলতির আঘাত লাগা মুমূর্ষু পাখির মত। দিনে দিনে হারাণদাদু একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন কারণ কেউই কারও দিকে চাইবার তখন অবকাশ পেত না। প্রত্যেকেরই অবস্থা তখন দিনে দিনে শোচনীয় হয়ে চলেছে প্রত্যেকেই কোনক্রমে নিজেকে বাঁচাবার একটা পথ খুঁজে পাবার চেষ্টায় উন্মুখ।

এমনি একদিন হঠাৎ হারাণদাদুর ছোট ছেলেটি মারা গেল। কোন চিকিৎসা করা গেল না, কোন রকম প্রতিরোধ দূরের কথা কি যে হয়েছিল কেউ জানতেই পারল না। রেখার মা-র মত দু-একজন লোক তখনও সেইখানে ছিল তারা দুঃখ ক'রে বলেছিল কি মানুষের কি অবস্থা আজ। আর হারাণদাদু—তার এখনও বেশ মনে আছে চুপচাপ বসেছিলেন মরা ছেলের সামনে—না ছেলের দিকে তাকিয়ে নয়, উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আর হারাণদাদুর স্ত্রী তখন জীর্ণ শরীরে আকুলি বিকুলি কাঁদছেন—অ আমার কি হইল গো। আমার গোপালরে ক্যাডা নিল গো?—তাঁর শরীরের দুর্বলতার জন্তে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল তাই রেখার মা তাঁকে থামাবার

চেষ্টা ক'রলেও কোন ফল হচ্ছিল না। রেখার মাকে জড়িয়ে ধরে প্রৌঢ়া কাঁদছিলেন—লক্ষ্মী তুমি কইয়া দাও আমার গোপালরে কে নিল গো!—রেখার মা এই ক'বছরে এমনই জীর্ণ হয়েছে নইলে তখনও এত বয়স মনে হ'ত না। অন্তত হারাণদাদুর স্ত্রীর তুলনায় বয়স যে কম সে কথাটা ধরা যেত। অথচ আজ যদি হারাণদাদুর স্ত্রী থাকতেন মা-কে তাঁর চেয়ে বেশী বয়স হয়ত মনে হ'ত। মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে হারাণদাদুর স্ত্রী ডুকরে উঠেছিলেন—লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী পোলা আমার কথা কয় না ক্যান? রা করে না ক্যান, লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—আর্তনাদ ক'রে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। রেখার মা অর্থাৎ লক্ষ্মী সে কথার জবাব দিতে পারে নি সেদিন, তাও রেখার মনে আছে, সে দেখেছিল। একবেলা পার হলে একজন পুলিশ আর কতগুলো লোক এল নাম ধাম লিখে হারাণদাদুর ছোট ছেলের লাশ নিয়ে চলে গেল। ওঃ তখন কত দর্শকই না জমেছে! অথচ এত মানুষের মধ্যে মানুষের মৃতদেহের কিছুমাত্র মর্যাদা ছিল না তখন। হারাণদাদুর মত মানী মানুষের ছেলের মড়া ফেলতে হ'ল ডোমকে দিয়ে। ধর্ম, মান, মর্যাদা কিছুই রইল না আর —এই কথাই মনে হয়েছিল সেদিন রেখাদের সহবাসিন্দাদের যাদের মধ্যে তখনও এই ধারণা ছিল যে তাদের জাতি, ধর্ম, অবশিষ্ট আছে। আজও রেখা মনে ক'রতে পারে সেদিনের কথা, ছবির মত মনে আছে তার। একবারে কোণটায় ঘুপচির মধ্যে থাকত বিলাসী। সকলে ওই নামেই ডাকত তাকে। কেউ ছিল না বিলাসীর, সে একলা দেশের লোকের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় উঠে এসে পড়েছিল। তবে দেশের কোন লোকের সঙ্গেও মিশত না। দেখে সকলেই ভাবত মেয়েটা বুঝি পাগল হয়ে যাবে। অথচ ওর দেশের সকলেই বলত মেয়েটা চিরদিনই নাকি ওইরকম। চিরদিনই অল্প কথা বলে। ওর কেউ নেই দেশে। সম্পর্কে কাকা আছে আর গ্রামের লোকজন মিলে ওর বিয়ের ঠিক ক'রেছিল। সবই হয়েই গিয়েছিল শুধু শুভ কর্মটি ছাড়া, ঠিক এমনি সময় একদিন খবর পাওয়া গেল পাশের গ্রামের যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ের ঠিক কে বা কারা যেন ক্ষেতের মধ্যে মেরে রেখে গেছে তাকে ভরা দুপুরে। সন্ধেবেলাই হত্যারহস্য ফাঁস হয়ে গেল। তারপরই গ্রাম থেকে লোক ভাঙতে সুরু করে এবং সকলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিলাসীকেও গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে আসে। এখানে এসে সে কারও সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি। বিলাসী এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে চুপচাপ বসে থাকলে কি হবে পচা খাবারের সামনে যেমন মাছি ভ্যান ভ্যান করে তেমনি ভাবে তার চারপাশে অজ্ঞাত-কুলশীল যত বদপ্রকৃতির লোক ঘুর ঘুর করত সময়ে অসময়ে। তাদের কেউ কেউ সর্বসমক্ষে বিলাসীকে লক্ষ্য ক'রে এমন এক একটি অশ্লীল উক্তি ক'রত

যে তা কানে শোনা যায় না অথচ সবাই শুনত কিন্তু রেখা, কোনদিন কাউকে প্রতিবাদ ক'রতে শোনে নি। অত উদ্বাস্তু ছাড়াও বিলাসীর দেশের লোক তো কত ছিল কিন্তু একজনও একদিনও প্রতিবাদ করে নি এই ঘটনার যা দিনের পর দিন ঘটেছে। আশ্চর্য সহনশীল হয়ে পড়েছিল লোকগুলো। কেবল সহনশীলতা ছিল না মায়ের। ওই অবস্থার মধ্যেও তার উগ্রতা ছিল তীব্র। অবশ্য তার মা-ও বিলাসীর জন্যে কারও সঙ্গে ঝগড়া করে নি কিন্তু সামান্য কারণে সহবাসীদের সঙ্গে সহজেই ঝগড়া ক'রত। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নির্মমভাবে মারত রেখাকে ধরে আর এই জন্যেই মাকে ভয়ের অন্ত ছিল না রেখার। সে ভয় আজও আছে। এখন আর ধরে মারে না তবে কথার বিষ মারকেও ছাড়িয়ে যায়।

ওর মা একটু এদিক ওদিক দেখতে পারে না। বিশেষ করে তার কথার একটু অমান্য ক'রলে অথবা কথা মত কাজ ক'রতে দেরী ক'রলে নিস্তার থাকে না আর। আর এত বেশী অবুঝ তার মা যে রাগ হ'লে আর কোন কথা কানেই তুলবে না। একবার কাউকে গালাগালি দিতে আরম্ভ ক'রলে অক্লান্ত ভাবে দিয়েই যাবে। রেখার মনে হয় তাকে যখন তার মা বকতে লাগে তখন যেন অন্য কোথাও উৎসাহ পায় যার ফলে দ্বিগুণ বেগে নির্মমভাবে বকে চলে। আর গালাগালির চেয়ে খারাপ শাপ-শাপান্তি করা—এমনভাবে এমন সব শাপ দিতে থাকে যে মনে হয় শাপগুলো বুঝি সব জীবন্ত হয়ে উঠল। সত্যিই বুঝি সঙ্গে সঙ্গে ফলে যাচ্ছে অভিশাপের কথা। আবার যেদিন ভিক্ষে তেমন না জোটে সেদিন যেন অনেক বেশী পরিমানেই রেগে যায় বুড়ি। নিজের পেটের মেয়ে হয়েও মায়ের মনের ভাব বুঝতে পারে না রেখা, বিশেষ ক'রে বুঝতে পারে না কখন কি মর্জিতে থাকে। কোন কাজে রাগবে না এই ভেবেই আড়ষ্ট হয়ে থাকে সারাক্ষণ। তবে একটা জিনিষ রেখা লক্ষ ক'রেছে শিয়ালদহে থাকতে যে সব ঘটনায় রেগে যেত এখন তেমন অনেক ঘটনায় রাগে না। তখন এমন অনেক কিছু অপছন্দ ক'রত এখন সেগুলো অপছন্দ ক'রে না। এই যেমন ভিক্ষে করার কথা—আগে ষ্টেশনে থাকতে কখনও পয়সার জন্যে ভিক্ষেয় বেরোতে বলে নি রেখাকে বা কখনও ভিক্ষে চাইতে দেখলে জ্বলে উঠতো। নিজে ঘুরে ঘুরে কোথা থেকে সব জোগাড় ক'রে আনত তা ভাববার পর্যন্ত অবকাশ পেত না রেখা। আর ভাববার দরকারই বা কি ছিল? কিন্তু আজও রেখা ঠিক ক'রতে পারে নি কি জন্যে তার মা তাকে এভাবে আড়াল ক'রে রাখতে চাইত। ঠিক তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রে তোলবার আশা যে ক'রত এমন প্রমাণ রেখা কখনই পায়নি। তবে সরকারী সহায়তায় কোন জায়গায় নতুন বসতি স্থাপনের আশা তার মা ক'রত। এই নতুন ঘরের আশায় ওর মা প্রায়ই এসে

জিজ্ঞেস ক'রত—আইছিল কেও ?

রেখা মাথা নাড়ত। কেউ আসেনি। অর্থাৎ তাদের নতুন বসতি গড়ে দেবার আহ্বান আসেনি সরকার পক্ষের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্যে অবশ্য অনেক দিনই অনেক সরকারী কর্মচারী এসেছিল, অনেকেই নাম পূর্ব নিবাস প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে গিয়েছিল, ওর মা-কে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক কাগজেই কিন্তু এক ছিটে জমিতে মাথা গোঁজবার মত ছাউনি গড়ে দিল না কেউ। ওদের মধ্যে অনেকেই কোন দপ্তরে যেন ধর্না দিয়ে শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা ক'রে নিল এবং চলেও গেল একদিন। দেখাদেখি ওর মা-ও সেই অফিসে গিয়েছিল, সারাদিন সামনে অসংখ্য জনতার সঙ্গে বসে থেকে অবশেষে সন্ধ্যের সময় ক্লান্ত পায়ে ফিরে এসেছিল নিজেদের আস্তানায়। অনেকের কাছে বুদ্ধি নিয়ে পরেও একদিন গিয়েছিল, দীর্ঘ লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে একটুকরো কাগজ সংগ্রহ ক'রে অনেক আশায় ফিরে এসেছিল তারপর সেই আশা নিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে মরেছে কোন হদিস মেলে নি। পুরোনো শহরবাসীদের অনেকে এখানে সেখানে সরে গেছে, নতুনেরা এসেছে স্টেশনভরে, রেখারা তাদেরই সঙ্গে বাস ক'রেছে আর যে দু চারজন পুরোনো লোক তখনও কোথাও জায়গা পায়নি তারা বলেছে ওর মা-কে দিয়ে সই করিয়ে সে জায়গা কোন সরকারী কর্মচারীই নিয়ে নিয়েছে বা বিক্রী ক'রে দিয়েছে কারও কাছে। অমন অনেকবারই তো অনেক লোক কাগজপত্রে টিপ সই করিয়ে নিয়েছে কাজেই হতেও পারে—ভেবে নিরাশ হয়ে গেছে ওর মা একসময় এবং ধরে নিয়েছে আস্তানা আর জুটল না তাদের কপালে। অবশ্য সে অনেক দেরীতে। এবং দেরীতে না হ'লেই বা কি আর করবার ছিল তাদের ? কোথায় আর যেতে পারত ? অবশেষে স্টেশনে পড়ে রইল তারা যেমন রইল আরও অনেকে তাদেরই মত। কিছুদিন আরও হয়ত থাকত তারা সেখানেই, অথবা কতদিন থাকত কিছু বলা যায় না হঠাৎ এক রাতে যদি না ঘটে যেত ঘটনাটা। ভোরের দিকে একটা অস্পষ্ট চিৎকারে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। শিয়ালদহের মত একটা ব্যস্ত স্টেশনে শব্দ কিছু নতুন নয়, অহরহ কত শব্দ, কত চীৎকার তো হচ্ছেই। কাজেই অনেকে সেই শব্দে জাগল না। তবু অস্বাভাবিক ভাবে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল তাদের কাছেই এবং সময়টা এমনই যে ঠিক ওই সময়ই—স্টেশন প্রায় নিস্তব্ধ থাকে। তা ছাড়া নতুনত্ব ছিল এই যে আর্তনাদের মত সেই শব্দটা একবার উঠেই থেমে গেল—যেন কেউ বন্ধ ক'রে দিল তার উৎস। পাতলা যাদের ঘুম তারা সব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল কোণের দিক থেকে তখনও অস্পষ্ট গোঙানীর শব্দ উঠছে একটা। শব্দ আসছে বিলাসীর ওদিক থেকে। আর চেতনা হন্তারক যে দৃশ্য সেই অস্পষ্ট আলোতেও তারা প্রত্যক্ষ

ক'রল তাতে অনেকেই যেন বোবা হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। বিলাসীর বুকের ওপর কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে মুখ টিপে ধরে রয়েছে তার। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রতে কারোই দেরী লাগল না এবং রেখার মা-ই বুঝি প্রথম প্রচণ্ড চিৎকার ক'রে জাগিয়ে দিল আরও অনেককে। সঙ্গে সঙ্গেই আরও অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, এবং একটা প্রবল হৈ চৈ এর মধ্যে বিলাসীর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে থামের আড়ালে সরে গেল লোকটা। দু একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে তার পেছনে দৌড়ে বাইরে পর্যন্ত গিয়েও ধরতে পারল না তাকে। তবে চেনা গিয়েছিল স্টেশনেরই কোন কুলি লোকটা। রেখার মা ততক্ষণে উঠে বিলাসীর কাছে পৌঁছে গেছে আর তারস্বরে চীৎকার ক'রে শাপশাপান্ত এবং বাপান্তও ক'রে চলেছে দুষ্কৃতকারীর উদ্দেশ্যে। আরও কয়েকজন মেয়েছেলে বিস্রস্তবাস ও বেপমান বিলাসীর চারপাশে বসে নানা প্রকার অনুসন্ধান কাজ ও প্রশ্নাদি ক'রে চলেছে। আর লজ্জিত ও ভীত বিলাসী উঠে বসে নিজের কাপড় চোপড় গুছিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রছে নিঃশব্দে।

পরের দিন সকাল থেকেই সলা পরামর্শ সুরু হয়ে গেল সকলের মধ্যে। সকলেই প্রতিকার চায়, দু একজন তো এমন ক্রোধ প্রকাশ ক'রল যে ভাব দেখে মনে হ'ল দুরাচারীর মুণ্ডুটাকে তারা বুঝি তার ধড় থেকে নামিয়েই আনবে। কিন্তু লোকটা স্টেশনের কুলি এটা বোঝা গেলেও কোন জন যে ক'রেছে ঠিক ভাবে বোঝা গেল না। তবে যার কথা অনুমান করা গেল তার নাম এবং নম্বর কেউই না জানার ফলে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হ'ল না। নরমপন্থী যারা ছিল তারা সংখ্যায় ভারী হয়ে যাওয়াতে সিদ্ধান্ত করা হ'ল নিজেরা কোন গণ্ডগোল না ক'রে আইনের সাহায্য নেওয়ার। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ঠিক ক'রল প্রধান স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে নালিশ জানাতে হবে তা হ'লে প্রতিকার হতেও পারে।

সকলে মিলে পরের দিন স্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়ে জানাতে গেল ঘটনাটা, কিন্তু প্রবেশাধিকার পেল না তার ঘরে। ঘরের দরজার সামনে বসেই রইল, কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ পুলিশ এল। যে পুলিশ কর্মচারীটি পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল তার কাছে সব বলা হ'ল। সে আশ্বাস দিল এ ব্যাপারে কিছু একটা করবার চেষ্টা পুলিশ কর্তৃপক্ষ ক'রবে। সেই কথার ভিত্তিতে সরে এল সকলে কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে গেল কিছু একটা করবার কোন নমুনা দেখা গেল না। উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এসেছিল বলেই নতুন ক'রে কিছু করবার জন্য উদ্যোগী হ'ল না কেউ। তাছাড়া সকলেই তখন এমন এক অনিশ্চয়তার অশান্তিতে বিপর্যস্ত যে কেউই আর কিছু ভাবতে পারছে না। এমন কি দু'চারজন তো নিজের কথা ভাবতেই ভুলে গেছে। আর বিলাসী

অটল শূন্যতা নিয়ে সেই কোণটাতেই শামুক হয়েছে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলছে বিলাসী। একা একাই বলছে, যাদের নজরে পড়ল কেউই গ্রাহ্য ক'রল না। কেউ তখন কারও কথা ভাববার মত অবস্থায় নেই। কেবল দু একজন মহিলা গিয়ে বিলাসীকে নানারকম প্রশ্ন ক'রল যে সব প্রশ্নের একটারও জবাব দিল না; বরং কেউ গেলে একা কথা বলাও বন্ধ ক'রে দিল। কেউ না থাকলে কাকে যেন উদ্দেশ্য ক'রে বকতে থাকে। রেখার মা একদিন গিয়ে বলল, কি কস্ রে বিলাসী?

বিলাসী জবাব দিল না। বরং যে কথা বলছিল তাও বন্ধ ক'রে দিল। রেখার মা লক্ষ ক'রে দেখল চোখের দৃষ্টি বিলাসীর উদ্‌ভ্রান্ত। সে দৃষ্টিতে অর্থহীনতা এবং শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। অনেকক্ষণ কথা বলবার চেষ্টা ক'রে রেখার মা বুঝল যে বিলাসী আর কোনদিনই হয়ত কথা বলবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে এল হতাশাকে সঙ্গে নিয়ে। সকলের কাছে জানিয়ে দিল, মাইয়াটারে ডাক্তার দ্যাখাইলে অখন'তরি ভাল করণের সময় আছিল।

ভাল করবার সময় যে ছিল এটা সকলের ভালভাবেই জানা কিন্তু সকলেই সমান অসহায় হওয়াতে চুপ ক'রে কথাটা শুনল। কারও কোন রোগেরই তেমন চিকিৎসা হচ্ছে না, বিরাট কাপড়ে লাল যোগ চিহ্ন আঁকা আছে এক জায়গায় তার নীচে চেয়ার টেবিলও পাতা আছে, শোনা যায় ডাক্তার আছে সেখানে একজন, তাঁকে সাহায্য করবার লোকও বেশ কিছু সংখ্যক আছে কিন্তু সামান্যই কাজে লাগতে পারেন তাঁরা। এত লোক অব্যবস্থায় এবং দুরবস্থায় এত রোগ ও এত বেশী রোগী যে তাঁদের হিমসিম খেতে হয় ছোট ছোট ছেলেগুলোকে দায়সারা গোছের চিকিৎসা ক'রতেই। তাও সকলের হয় না। মাঝে মাঝে কোত্থেকে লোক এসে চারপাশে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে যায়; তাতে কতটুকু যে ফল হয় বোঝা যায় না। আর এ সবে বিলাসীর যে কোন উপকার হয় না এ তো খুব স্বাভাবিক। দিনে দিনে তার স্বগতোক্তির মাত্রা বেড়েই চলল। খাওয়া দাওয়া আগে যদি বা জুটত এখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল জুটল না বলে। অনুকম্পা অনেকের মনেই ছিল কিন্তু কারও নিজেরই খাবার জোটে না ঠিকমত কে আবার খাওয়াবে বিলাসীকে? তবু মাঝে মধ্যে কেউ এক আধমুঠো উদ্বৃত্ত খাবার রেখে দিত সামনেটায়। কখন হয়ত খেত কখনও বা তাকিয়ে তাকিয়ে হাসত বিলাসী। এমনি ক'রে চলতে চলতে একদিন দেখা গেল বিলাসী নেই। রাত্রের অন্ধকার না ফুরোতে জনারণ্যে মিশে গেছে সে কলকাতায়। হারিয়ে গেছে কলকাতার অট্টালিকার ভিড়ের আড়ালে। কোনদিন সে আর বাস্তু চাইবে না, কোনদিন সে আর প্রতীক্ষা ক'রবে না সানাই বাঁশীর দিনের। কলকাতার পাথর বাঁধানো পথের ওপর

দিয়ে চলে চলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে আপনা-আপনি। গ্রাম বাংলার সবুজ আস্তরণ বিছানো শ্যামল মাটির ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে দীঘির ঘাটে গিয়ে যে মেয়েটি নিজের যৌবনের পূর্ণতার প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত, একদিন যে বীভৎসতার ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল তারই চেনাশোনা গণ্ডীতে, সেই মেয়েই একদিন নিঃশেষ হয়ে মিশে যাবে মাটিতে— অবীরা সে এই জানার অনুভূতি এবং না জানার আকৃতিশূন্য শূন্যতায় অবস্থান ক'রে এখনও যেন সেই মৃত্যুর আশ্রয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে মহাকালের নির্দেশে।

বিলাসীর পরিণতি দেখে অকারণেই যেন ভয় পেয়েছিল রেখা। বিলাসীর বয়সের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য নেই, কোন দিক দিয়েই কোন সূত্র নেই সংযোগের, তবু রেখা ভয় পেয়ে মনে মনে যেন কুঁকড়ে গিয়েছিল অনেকটা। তার অপরিণত বয়সের অপুষ্ট মনে আতঙ্ক জেগেছিল মানুষের পরিণতি দেখে। স্টেশনের চত্বরে দীর্ঘদিন পড়ে থেকে থেকে নিজেদের অবস্থার তারতম্যটা ভুলেই গিয়েছিল সকলে, বিলাসীই যেন নিজেদের অবস্থা বুঝতে সাহায্য ক'রল। কিন্তু অনন্যোপায় তারা বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কোন পন্থা না থাকায় মুখ লুকোনো কচ্ছপের মত সেখানেই পড়ে রইল স্থিরভাবে। অনেকেই অবশ্য পথ পাবার আশাটাকে টিকিয়ে রাখল মনে। রাখল রেখার মা-ও। একদিন সেই আশা পূরণ হ'ল তার। একজন লোক স্টেশনের আশে পাশে প্রায়ই ঘোরাঘুরি ক'রত আরও অনেকের মত। সেই লোকটি একদিন নিজেই প্রস্তাব ক'রল—তোমরা তো কেবল দুজন, তা এখানে পড়ে আছ কেন এতদিন ?

কি করুম বাবা, ভাইগ্যের লিখন যাইব কই—রেখার মা জানাল।

তা যা বলেছ। ভাগ্যের গ্রহ না কাটলে কখনও ভোগ কাটে না।

যে কয়দিন কপালে আছে ভুগতে তো হইবই।

লোকটা একটা কম দামী সিগারেট পকেট থেকে বার ক'রে আগুন ধরিয়ে বলল—তবে কি জান, অনেক সময় মানুষকে দিয়ে মানুষের উপকার হয়।

হইব না ক্যান—সায় দিল রেখার মা।

এই ত্যাখ এতদিন তোমরা এখানে আছ আর আমিও প্রায় রোজই এখানে আসি অথচ একদিনও আমার তোমাদেরকে চোখে পড়ে নি, নইলে কত আগেই তোমাদের এই উপকারটুকু করতে পারতাম।

রেখার মা উপকারের স্বরূপ না বুঝতে পারায় চুপ করে রইল। সেই লোকটিই বলল—আমি তোমাদের থাকবার একটা জায়গা দিতে পারি। কলকাতায় কত লোক জান তো ; দু-একজন এমন লোকও এখানে আছে যারা অনেক লোককে আশ্রয় দিয়ে থাকে। এমনি একজন লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। খুব বড়লোক বুঝলে, দয়ালু। অমন অনেক অনাথাকে আশ্রয়

দিয়েছে। তাদের জন্য কাজকর্মও দেখে দেয় ভদ্রলোক, কাজকর্ম পেলে মেয়েরা চলে যায় অনেকে।

আমাগো কি আর অত ভাইগ্য হইবো, বোঝেন না আমরা হইলাম গিয়া পোড়া কপাইল্যা।

তুমি যাই হও না কেন তোমার এই মেয়ে তো ভাগ্যবতী গো। ওর বরাতেই তোমার অভাব ঘুচে যাবে।

হঃ—নৈরাশ্যের সুরে রেখার মা বলল—ভাইগ্যবতী না আরও কিছু। দ্যাশ ছাইড়া ঘর ছাইড়া আপন আত্মীয়-স্বজন ছাইড়া এইখানে আইয়া রাস্তার উপর হুইয়া যে রইল তার আবার ভাইগ্য, হায় আবার ভাইগ্যবতী!

হবে, হবে, সব হবে। ওই মেয়ের তুমি দেখে নিও সব হবে, বিয়ে হবে ও কত পয়সার মালিক হয় তাই দেখে নিও।

এমন ধরণের আশার বাণীর নিশ্চিন্ততায় রেখার মা'র মন থেকে চাপ চাপ নৈরাশ্যের বোঝা যেন হঠাৎ একপাশে সরে গেল, খুশী হয়ে সে বলল—আপনাগ' দয়া হইলে তো অনেক কিছুই হয়।

বেশ আমার কথা দেখে নাও হয় কিনা। চল তবে নিয়ে যাই তোমাদের।

রেখার মা অবাক হয়ে গেল শুনে। বলে কি লোকটা! এখনই নিয়ে যাবে তাদের? সে তো ভেবেছিল লোকে যেমন কথার কথা বলে তেমনই বলছে লোকটাও। মৌখিক সান্ত্বনা জোগাচ্ছে। ভুয়ো আশ্বাসবাণী শুনিয়ে যাচ্ছে সরকারী লোকগুলোর মত। বিস্মিত সে প্রশ্ন ক'রল—অখনই যাইতে হইবো!

এখন যেতে চাওনা না কি?

যামুনা ক্যান? কই যে অখনই লইয়্যা যাইবেন আমাগো?

হ্যাঁ, চল—।

সুসংবাদটা সকলের মধ্যে ছিটিয়ে দিল রেখার মা। মুখে খুশীর ভাব প্রকাশ ক'রে অনেকেই মনে মনে পরশ্রীকাতরতায় ভুগতে লাগল, অনেকে সংশয়ী হয়ে উঠল, আর অনেকে ভাবলেশহীনভাবে শুনল কেবল সংবাদটা। রতির মা কেবল অনেক ক'রে অনুরোধ ক'রল—তোমাগো একটু সুবিধা হইলে আমার কথাটা মনে কইরো দিদি। পোলা মাইয়া কয়ডারে লইয়া যদি একটু আশ্রয় পাই তো কোনরকমে অ গো বড় কইরা তুলুম। মনে রাইখো দিদি।

হ, হ, রাখুম। আপনের কথা মনে রইব। আমি যদি ভাল বুঝি আপনেগো খবর নিশ্চয়ই দিমু আমি—আশ্বাস দিল রেখার মা। তারপর সেই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে স্টেশন ছাড়ল শুধুমাত্র মেয়েটির হাত ধরে।

বাসে চড়িয়ে রেখা ও তার মাকে লোকটি যেন এক ছবির রাজ্যে নিয়ে এল। খুব বেশী দূর নয় কারণ সময় বেশী লাগল না তবে এই সামান্য দূরত্বের মধ্যেই

এমন এক বিস্ময়ের জগৎ আছে দেখে চাপা আনন্দের প্রকাশহীন ঔৎসুক্যে রেখার সদ্য চৌদ্দর মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠল। বুকচাপা আনন্দের বেদনায় উত্তেজিত হয়ে উঠল তার হৃদয়। মন জিজ্ঞাসু হ'ল, কি নাম এই জায়গার ? প্রশ্ন করতে না পেরে যেন আনন্দের আধিক্যকে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত করে রাখল। শিয়ালদহ স্টেশনেও প্রচুর মানুষের ভীড় প্রচুর গাড়ী চলে তার সামনের রাস্তা দিয়ে, স্টেশনের ভিতর দিয়ে গল্পে শোনা পাহাড়ের স্মৃতি-উদ্রেককারী অট্টালিকা দেখা যায় কিন্তু কোথায় যেন তারতম্য আছে এ জায়গা থেকে, তফাৎ আছে কোথায়। সে বাড়ীগুলো ঠিক যেন এ বাড়ীগুলোর মত নয় না কি সেখানের পথিকগুলোর পার্থক্য আছে এখানের পথিকদের থেকে অথবা....পার্থক্যের কারণ নির্ণয় ক'রতে পারল না রেখা। কেবল প্রায় উড্ডীয়মান যানবাহনগুলোর ফাঁক দিয়ে সে পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই দৃশ্যেরই মধ্যে নেমে পড়ল লোকটির পেছন পেছন। আর জীবনে প্রথম যে বাসে উঠেছিল রেখা সেই বাস গাড়ীটা তাদের নামিয়ে দিয়েই যেন হারিয়ে যাবার জন্যে মরিয়া হয়ে পাল্লা লাগাল অন্য গাড়ীগুলোর সঙ্গে। রেখা আর তার মা লোকটির পিছু পিছু অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত একটা পথে ঢুকে পড়ল। এতক্ষণে কথা বলল লোকটি—এই দেখ, অনেক লোকে আবার আসতে চায়না। যারা না আসে তারা অবশ্য ঠকে। এই তোমরা এলে বলেই না জিতলে। আগে যারা এসেছে তারা সব সুখেই আছে। প্রায় সব মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে বেশ আনন্দেই আছে তারা।

রেখার মা সেই অদৃশ্যপূর্ব অপরিচিত আশ্রয়দাতাটির বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। বিমুগ্ধ অন্তরে সে ভগবানের কাছে তার ভাল করবার জন্যে প্রার্থনাও করল একবার মনে মনে। প্রতিদানে সে তো কিছুই দিতে পারবে না তাই পূর্বাহ্ণেই প্রার্থনা জানিয়ে রাখল কৃতজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত নিদর্শনস্বরূপ। আর যে উপকারী নিঃস্বার্থ ব্যক্তিটি অর্থব্যয় ক'রে তাদেরকে সেই আশ্রয়দাতার সমীপে পৌছে দিচ্ছে সে পরিবেশটিকে আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলল —উপকারী লোকের একফোঁটা কাজও যদি করবার সুযোগ মেলে তো মানুষের তা করা উচিত। অথচ দু-একটা মেয়ে তা বোঝে না। এমন বেইমান সেগুলো যে একরকম বললে আর একরকম বলে সকলের কাছে।

ছি ছি—সেই সব অকৃতজ্ঞ মেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে ধিক্কার দিল রেখার মা। এই জন্যেই তো রসাতলে যেতে বসেছে, সে ধারণা করল।

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পথ চলতে তন্ময় রেখার সম্বিৎ ফিরল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলওয়ালা বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা লোক সামনেটাতেই বসে আছে। রেখার পেটের মধ্যে খিদেটা বদ্ধ টিনের

পাত্রে রাখা জিওল মাছের মত নড়ে চড়ে উঠল কাঁচের আলমারিতে রাখা নানাবিধ খাবারগুলো দেখে ; ভাবল এখানে বুঝি লোকটা তাদের খাওয়াতে এনেছে। লোকটা কিন্তু খুবই ভালো, রেখার মনে হ'ল। দোকানে বসা যে লোকটির সঙ্গে তাদের সঙ্গের লোকটি কথা বলছে সে-ই নিশ্চয়ই দোকানী হবে রেখা অনুমান ক'রল আর প্রথমেই তার নজরে পড়ল লোকটির লম্বা লম্বা চুল আর বিরাট গোঁফের দিকে। দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন বেড়ে উঠেছে ওগুলো। লোকটির চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল রেখা। কি রকম তাকায় লোকটা, যেন ছুরির ফলার মত তাকিয়ে আছে! কিছুক্ষণ ধরে অস্ফুটস্বরে কি সব কথাবার্তা বলে ফিরে এল তাদের সঙ্গী, জানাল—চল তোমাদের পৌছে দিয়ে আসি মালিকের বাড়ীতে।

অকারণ দ্বিধায় ভুগছিল রেখার মা। কি দ্বিধা সে নিজেই তা জানে না। লোকটির কথা শুনে যেন বোঝা নেমে গেল তার মনের। তবে আশ্চর্য হল এই যে একটিবার লোকটি তাদের দেখল না পর্যন্ত! সে ভেবেছিল কত কথাই হয়ত জানতে চাইবে যেমন সরকারী দপ্তরের লোকগুলি চাইত সে সব কিছুই নয় এমন কি দেখল না পর্যন্ত! বাস্তবিকই মহৎ লোকের নমুনাই বটে। তবে অত লোককে যে আশ্রয় দেয় তাকে যেমন আশা ক'রেছিল লোকটির পোষাক পরিচ্ছদ বা চালচলন সেদিক দিয়ে গেল না। তাদের গ্রামের মহাজন বাকের আলির ছেলে খুরশিদ বরং এর চেয়ে অনেক বেশী বাবুয়ানা করে।

আবার চলতে লাগল ওরা। আবার হাঁটাপথ। রেখা কিন্তু চলায় বিশেষ উৎসাহ অনুভব ক'রল না আশাভঙ্গের জন্যে। সত্যিই এখানে যদি খাওয়াত লোকটা তাহ'লে যত দূর বলত যাওয়া যেত। নিরুদ্যম গতিতে চলতে লাগল রেখা। সঙ্গী লোকটা ততক্ষণ তার মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে—ওই দোকানটা ওর নিজের। আরও দোকান আছে। অনেক পয়সা কিন্তু অমন ভাল লোক হয় না।

লোকটা যে ভাল একথা এত বুঝিয়ে বলতে হয় না। নইলে এত লোককে আশ্রয় দিতে যাবে কোন দুঃখে। যার তার কাছে শুনলে এমন লোকর কথা অবিশ্বাস্য মনে হ'ত। এখন তো আর অবিশ্বাস ক'রতে পারছে না তারা যাচ্ছেই সেখানে। আর লোকটির দয়া দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। যাই হোক ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছে নইলে এতদিন ওইভাবে পড়ে থেকে এখন হঠাৎ এমন আশ্রয় জুটবেই বা কেন, রেখার মা ভাবল। সঙ্গী লোকটি তখনও বলছে, গিয়ে দেখবে ওখানে আরও কত লোক আছে।

এতক্ষণে রেখার মা প্রশ্ন ক'রল—সবই কি আমাগ মত পাকিস্থানী নি কি?
হ্যাঁ পাকিস্থানের আছে অন্য সবও আছে অনেক! তবে বেশী মেয়েরাই

বিয়ে হয়ে গেছে, তারা যার যার লোকের সঙ্গে চলে গেছে।

মাইয়াগো বিয়ার খরচ দেয় ক্যারা ?

ওই বাবুই সব দেয়।

দানশীলতার পরিমাপ দেখে বস্তুতই রেখার মা চমকে উঠল মনে মনে। বাস্তবিকই এই আশ্চর্য জায়গার দৃশ্যই যে কেবল অদ্ভুত তাই নয় বিস্ময় আছে সর্বত্রই। মানুষের মধ্যেই এই বিস্ময় আছে বৈচিত্রের মূর্তিতে।

অপেক্ষাকৃত সরু একটা গলিপথের একটি ত্রিতল বাড়ীতে লোকটি তাদের এনে হাজির ক'রল। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল এবং কাউকে প্রশ্ন না ক'রেই মা মেয়েকে নিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল। উঠোনের মত একটু ফালি জমি আছে বাড়ীটার মধ্যে সেই উঠোনে রেখা লক্ষ ক'রল কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। কোনটার বয়সই ছয় বছরের বেশী নয় এবং একটার থেকে আর একটার পার্থক্য এক বৎসরের বেশী কোন মতেই হবে না। কি অদ্ভুৎ ভাষায় যে কথা বলছে ছেলেগুলো তার একবর্ণও রেখা বুঝল না। তাদের সঙ্গের লোকটি অসম সাহসে তাদের নিয়ে ঢুকলেও রেখা আর তার মার পা যেন আটকে গেল মাটিতে। লোকটি উঠোন পেরিয়ে হন হন ক'রে ভেতরে চলে গেলেও তারা দুজন চোরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। রেখার তো বিশেষ করে সেখানে দাঁড়িয়েই বুক কাঁপতে লাগল। জীবনে প্রথম সে এমন এক পরিবেশে এসে পড়ল যার স্বপ্নও দেখেনি কোনদিন।

কয়েক মুহূর্ত ব্যবধানেই লোকটির পুনরায় আবির্ভাব ঘটল এবং বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই সে বলল—একি ! তোমরা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে যে ! চল তোমাদের থাকবার জায়গা দেখিয়ে দিই।

রেখার মা কোন শব্দ না ক'রে রেখার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে তাকে এগিয়ে নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। একতলায় একখানা অন্ধকার অন্ধকার খুপরির ভেজানো দরজা ঠেলে লোকটি বলল—এই ঘরে তোমরা থাকবে।

রেখার মা একবার ঘরের মধ্যেটা দেখে নিয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর ঘরের ভেতরের অন্ধকার দেখে রেখার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠল। ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রীলোক এসে হাজির হ'ল যাকে দেখে মনে মনে আঁতকে উঠল রেখা। অত মোটা এবং গভীর কালো মানুষ সে জীবনে দেখে নি। গোল মুখমণ্ডলের আকৃতি এতই বিশাল যে তার মনে হ'ল ওই মেয়েছেলেটি ইচ্ছা ক'রলে যে কোন মানুষকে আস্ত গিলে খেতে পারে। ভয়ে ভয়ে সে তাকিয়ে রইল স্ত্রীলোকটির দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অমনি অদ্ভুৎ ভাষায় কি যেন বলল সে তাদের সঙ্গের লোকটিকে,

লোকটি তার জবাব ঠিক সেই ভাষায় না বললেও রেখাদের বোঝবার মতও বলল না। রেখা এবং তার মাকে বোঝাবার জন্যে মোটা মহিলাটি বাংলা ভাষায় বলল—তোমরা এই ঘরে থাক। বাংলা ভাষায় তার দৌড় আর না থাকায় স্বভাষায় আরও কি সব সে বলল তার ফলে লোকটি তাদের বলল—এই হ'ল এখানের বাড়ীওয়ালী। ওখানের দোকানে যাকে দেখে এলে তার বৌ। তোমাদের ঘর দেখে নিয়ে চান টান ক'রতে বলছে।

ঘরে পা দিতেই রেখার মা-র পায়ের তলায় পড়ে একটা আরশোলা সশব্দে ফেটে গেল। মোটা স্ত্রীলোকটি ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে বলল—ওই জানালাটা খুলে দাও।

একটু আলো দেখা যাচ্ছিল এক ছিদ্র পথে সেই দিকে নির্দেশ ক'রল স্ত্রীলোকটি। রেখার মা অতি সন্তর্পণে সেখানে গিয়ে বেশ উঁচুতে সেই ছোট্ট জানালাটি খুলে দিল। তাতে বোঝা গেল এই অন্ধকার ঘরের বাইরে পৃথিবীটা এখনও আছে এবং প্রচুর আলো আছে সেখানে সে আলো ঘরের মধ্যে ঢোকে না। হঠাৎ বাইরে থেকে তীব্র চিৎকার শুনে রেখার মা সেদিকে মনঃসংযোগ করে বুঝল কোন স্ত্রীলোক কটুকণ্ঠে একটি অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে উঠল যেন কাকে। বাড়ীওয়ালীর কানে পৌছাল সেই শব্দ, সে কোন কথা না বলে অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল। অমনি বাইরে উদ্দাম কলহের শব্দ শোনা গেল যে শব্দের একটুও বুঝল না রেখা বা তার মা। নতুন বলেই পরিবেশটা রেখার ভাল লাগছিল না প্রথম থেকে। এইসব হৈ হট্টগোল শুনে সে একেবারেই যেন দমে গেল এবং নিজের অজান্তেই মায়ের কাছে সরে এল ; যে লোকটি ওদের এনেছিল বলল আমি মধ্যে মধ্যে আসব, দেখে যাব তোমাদের।

অবশ্য কথাটা কাজে লাগল না কোন। কারণ ভয় ওদের আদৌ হয় নি কেবলমাত্র একটি বিস্ময় প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার মত ওদের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা বুঝতে পারছিল না পথ থেকে মানুষ কুড়িয়ে এনে নিজের বাড়ীতে শর্তহীন ভাবে আশ্রয় দেবার যে বদান্যতা আছে তার উদ্দেশ্যটা কি ? যাই হোক প্রশ্ন করা গেল না, লোকটি বেরিয়ে গেল। অনেকটা ভয়ে ভয়েই রেখার মা ঘরময় ঘুরে বেড়াল একবার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের কলহের আভাস পেতে চাইল অকারণ কৌতূহলের বশেই। রেখাও মায়ের পেছন পেছন দরজার বাইরে উঁকি দিল, দেখল একটি বউ তার দুর্বোধ্য ভাষায় বাড়ীওয়ালীকে কি যেন বোঝাতে চেয়েছে। বাড়ীওয়ালীও যেন কি বলে ধমকাচ্ছে তাকে যার একবর্ণও রেখা বা তার মা কেউ বুঝল না। রেখার মা-র ভয় হ'ল এই ভাষার তো একবর্ণও সে বুঝবে না। বাড়ীওয়ালী যদি এই ভাষাতে কথা বলে তো সে বুঝবে কেমন ক'রে ? না বুঝতে পারলেই বা চলবে কি ক'রে ?

সন্ধ্যা পর্যন্ত রেখার মা অবাক হয়ে গেল বাড়ীওয়ালীর ব্যবহার দেখে। অত লোকের আশ্রয়দাত্রী বলে কথিত এই বাড়ীওয়ালী ওদের মতই সব কিছু তদ্বির তদারক নিজেই করে। বাড়ীতে আরও দুটো বউ আছে তারা কেউ কথাই বলছে না, সব নিজেদের কাজে ব্যস্ত। বাড়ীওয়ালী ওই মোটা শরীরে টলতে টলতে বার বার তাদের ঘরে আসছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলছে, তাদের নির্দেশ দিচ্ছে তবে প্রয়োজনের বেশী কথা কখনই বলছে না বরং সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে বলে যাচ্ছে বাজে সময় ব্যয় না ক'রে। রেখার মা-র বরং এই স্বল্প ভাষণ এবং স্বল্প অবস্থান ভালই লাগছে কারণ যত ভালমানুষই বাড়ীওয়ালী হোক না কেন তার কেমন ভয় ভয় লাগছে ওকে। ওর আগমন অস্বাচ্ছন্দ এনে দিচ্ছে রেখার মায়ের মনে। হয়ত এটা সংকোচ বোধ কিন্তু রেখার মনে যে অনুভূতি তা সংকোচ বোধ নয়, ভীতি। প্রবল ভয় তাকে সংকুচিত ক'রে রাখছে আর সে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওই মহিলাটিকে দেখা মাত্রই। রেখার মা-ই বরং সাহস জোগানোর জন্যে বাড়ীওয়ালী বেরিয়ে গেলে বলছে, এমুন করস্ ক্যান লো? তরে কি খাইয়া ফালাইত্যাছে না কি?

রেখা মা-কে অস্পষ্টে বলে—অরে দেইখ্যা কেমুন ভয় করে আমার।

কিসের ভয়?

ভয়টা যে কিসের তা রেখা বলতে পারল না সে নিজেই জানে না বলে। ভয়কে জানতে পারলে তো তাকে জয় করাই যায়, জানে না বলেই তো ভয় রেখার। বাড়ীওয়ালীর দিকে তাকালেই যেন তার বুকটা শুকিয়ে যায়. বেশীক্ষণ ও এই ঘরে থাকলে যেন তার নিঃশ্বাসই বন্ধ হয়ে যাবে এমনই ভাব হয়। এখানে আসার পর সে একবার মাত্র পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে দেখেছিল বাড়ীওয়ালীকে সেই 'দেখার পর থেকে কি ভয় যে তার সারা মন জুড়ে বসেছে সে পরিমাপ ক'রতে পারছে না। মা যতই সাহস দিক না কেন সাহস পাচ্ছে না রেখা কিছুতেই। অথচ সে জীবনে এমন এমন দৃশ্যের সামনে দিয়ে এসেছে যার স্মৃতি জীবনের চরমতম দুঃস্বপ্নের চেয়ে মর্মান্তিক। সে যখন গ্রাম ছেড়ে মায়ের সঙ্গে জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে আসছিল চমকে উঠেছিল যা দেখে তা হচ্ছে কাশ বনের মধ্যে পড়ে থাকা একটি বিবস্ত্র নারীদেহ যে দেহ থেকে কোন জন্তু যেন মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে এমন কি স্তন দুটিও। শুধু তাই নয় আঁতকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতেও তার চোখে পড়েছিল দারুণ উত্তেজনায় বা ক্রোধে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য আঘাতে মেয়েটির মুখখানা ক্ষতবিক্ষত। আরও একটু এগিয়ে পুরুষের মৃতদেহ দেখেছিল যার মাথাটি দু ফাঁক হয়ে গিয়ে মাথার মধ্যেকার যা কিছু বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তবে দুটি মৃতদেহের একটারও হদিস পায়নি তখনও কাক কুকুরে। আর নেহাৎ অবুঝ হলেও সে

বুঝতে পেরেছিল চারপাশে পড়ে থাকা রক্তে তখনও সজীবতা ছিল। সেই স
বীভৎস দৃশ্য তাকে আতঙ্কগ্রস্থ ক'রেছিল বটে তবে জীবন্ত মানুষের মধ্যে তেম
আতঙ্ক যে থাকতে পারে এ সে এই প্রথম অনুভব ক'রল! সেই বিভীষিকা
তো একটা উৎস ছিল কিন্তু এই মহিলাটিকেই আতঙ্ক বলে মনে হ'ল রেখার
অতি সদাশয় ব্যক্তির সহধর্মী স্ত্রী হিসেবে প্রচারিত হবার পরও মহিলাটিবে
দেখে ভয়ের ছাড়া অন্য কোন অনুভূতির সঞ্চার হ'ল না তার মনে। রেখার
মা মেয়ের চোখে এই ত্রাসের ছায়া পড়তে পেরে বলল—ভয় পাস ক্যান?
হুদাহুদি অমন কইর‍্যা ভয় পাইলে কইব কি অরা?

রেখা জবাব দিল না কিছু। যে কেন ভয় পাচ্ছে সেই কথাটা একবারও ভাবতে চেষ্টা ক'রল না। ভয় হ'লে হয়ত সে তার উৎস পেতে চাইত আতঙ্ক বলেই তা খুঁজতে পারল না। কিন্তু মেয়ের মনের ভাবটা কোনক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়লে যে এখান থেকে হাঁড়ি তুলতে হবে এ কথা মনে মনে বুঝেই তার মা শংকিত হয়ে পড়ল। অথচ এখানে আসবার আগে ওরা সেই লোকটির মুখে এদের দয়ার যে ফিরিস্তি শুনেছিল তার প্রতি উপেক্ষা করবার অবস্থাও তাদের নয়। লোকটি স্পষ্টই বলেছিল ওদের নাকি ঘর হবে, বর জুটবে রেখার, সবই হবে। সেই আশাতেই তো কোনদিকে না তাকিয়ে এতদূরে চলে এসেছে ওই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে। বেঁচে থাকবার লোভেই মানুষ বেঁচে থাকতে চায় তারপরই কিন্তু জীবন চায় সে। শিয়ালদহ স্টেশনে বেঁচে থাকতে পেয়েছিল বলেই জীবন চাইল রেখার মা; নিজের জন্যে ঘর আর মেয়ের জন্যে বর। মনে মনে এ-ও ভেবে নিয়েছিল যে মেয়ের বিয়েটা সত্যিই কোনদিন দিয়ে দেয় ওরা তাহ'লে সে নিজের জন্যে ঘর আর চাইবে না বিব্রত ক'রবে না বরং নিজের একার পথ ঠিকই ক'রে নিতে পারবে। চলে যাবে এখান থেকে অনর্থক এদের গলগ্রহ হয়ে থাকবে না। যে উপকার ক'রছে এই ঋণই শোধ করতে পারবে না কোনদিন।

বাকী দিনটুকু ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিল রেখা, বাইরে বেরোল না অজানা আতঙ্কে। ওর মা ঘুরে এসে প্রশ্ন ক'রল—ঘরের মইধ্যে বইয়া থাকলেই চ'লবো? বাইরে বাইরাতে হইবো না? তারপর মেয়ের গোঁয়ার্তুমি দেখে ক্ষেপে গিয়ে চাপা গলায় ধমকানি দিল—পোরা কপাইল্যা আমারে জ্বালাইয়া খাইবো। বদমাসটা জানি কোইরখিকা আইছে একটা কথা নি শুনে?—সত্যিই কথা শুনল না রেখা। বুকের মধ্যে কি যে অহেতুক ভয় বাসা বেঁধেছে কে জানে। সেই ভয়ই তাকে নড়তে চড়তে দিচ্ছে না। এবং রাত্রেও তার ঘুম এল না সহজে। যদিও বা একবার এল মাঝরাত্রে তা অকস্মাৎ ভেঙ্গে গেল পাশের ঘরের চাপা গর্জনে। চারদিকে রাত নিঝুম, অন্ধকার যেন ঝিঁ ঝিঁ

পোকা হয়ে শব্দ ক'রে চলেছে একটানা ; এরই মধ্যে স্পষ্টই তার কানে এল পাশের ঘরে কে চাপা গলায় শাসাচ্ছে কাকে। ভাষা সে বুঝল না বটে তবে রহস্য ঘণীভূত হ'ল যখন সে বুঝল পুরুষ কণ্ঠের ধমকানির সঙ্গে সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠের* চাপা ক্রন্দন একটানা অনুনয়ের সুরে গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে। জীবনের এই নতুন অভিজ্ঞতার আতংকে সে তার মাকে না জাগিয়ে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে নতুন শব্দযোজনা না ক'রে মায়ের গায়ে ছোট ছোট ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল তাকে। ফিস ফিস ক'রে কানের কাছে বলল—ক্যারা জানি মারতে আছে কারে। কান পেতে শুনল রেখার মা। একটু শোনবার পর ব্যাপারটা অনুমান ক'রতে অসুবিধে হ'ল না এবং তার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে ঠিকমত বুঝতে পারল না এই চাপা তর্জন গর্জনের আর প্রতিপক্ষের মিহিকান্নার যথার্থ কারণ। জানবার প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল সে, পাশের ঘরের শব্দ পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে দুর্বোধ্য হ'ল রেখার কাছে তারপর থেমে গেল। অবশেষে রেখাও ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকারে যা থাকে অদৃশ্য তা দৃশ্যপটের রূপ গ্রহণ করে দিনের আলোয়. যা অস্পষ্ট থাকে অন্ধকারে তা আলোয় হয় প্রতিভাত হয় স্পষ্ট। তাই রাত্রির প্রশ্নকে দিনের আলোয় মেলে ধরে মানুষ। রেখার মা-ও ঘুম থেকে উঠেই রাত্রের ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা ক'রল। রেখা কিন্তু রাত্রের কোন স্মৃতির জের টানতে পারল না প্রত্যুষ পর্যন্ত। বরং আগের দিনের চেয়ে কিছুটা স্বাভাবিক লাগল তাকে সকাল বেলায়। রেখার মার ঘুম ভেঙ্গেছিল আগে। রেখা উঠতেই সে বলল—যা ওই কলপার থিকা মুখ হাত ধুইয়া আয় গিয়া।

একা এই ঘরের বাইরে বেরোবার কথা শুনে কেমন ভয় করতে লাগল রেখার। সে অমনি বলল—তুমি যাইবা না ?

যামু আমি ঘরডা একটু গুছাইয়া লই—ওর মা জবাব দিল। সামান্য কিছু জিনিষ এসেছে সঙ্গে ; অবশ্য জিনিষ বলে না তাকে জিনিষপত্রের ধ্বংসাবশেষ এনেছে বলাই হয়ত সঙ্গত। তার মধ্যে শোবার জন্যে ছেঁড়া কাঁথাও আছে কয়েকখানা সেইগুলোকেই গোছাবার কথা বলল রেখার মা। কিন্তু জিনিষ গোছানোর কাজে হাত দিতেই কে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—ঘুম থেকে উটলে বুঝি ?

রেখা ও তার মা একসঙ্গে তাকিয়ে দেখল দরজায় একটি কালোমত বউ দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে। রেখার মা-কে উদ্দেশ্য ক'রে বলল—রাতে ঘুম কেমন হ'ল ? নতুন জায়গায় বাপু আমার ঘুম ভাল হয় না কিনা সেইজন্যেই জিজ্ঞেস ক'রচি।

ভালই হইছে।—রেখার মা জবাব দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল—আপনেরে তো

চিনলাম না ?

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে মেয়েটি বলল—আমার নাম পছন্দ। ওই যে বাড়ী-উলী দেখলে আমি তার ছে‌লের বউ গো। ওর ধর্মছেলে রতনলালের সঙ্গে বে হয়েছে আমার।

রেখার মা লক্ষ্য ক'রল মেয়েটির পরণে একটা সুতীর ছাপা শাড়ী, গায়ে পাতলা আঁটসাট জামা এবং সমস্ত দেহে কেমন যেন চটুল ভঙ্গী একটা। ছিপ-ছিপে চেহারা হ'লেও স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল তার দেহ। বন্য কোন লতার মত একটুখানি হেলিয়ে সে এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। রেখার মা-র পক্ষে সদ্য এসে রতনলালকে চেনা সম্ভব নয় বলেই বিশেষ সমীহ ক'রে বলল—খারাইয়া রইলেন ক্যান, বহেন।

না বসব না এখন। এলাম তোমাদের দেখতে। তোমাদের খবর নেবার জন্যে পাঠাল আমাকে।

রেখার মা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন ক'রল—ইনারা তো বাঙ্গালী কইয়া মনে হয় না।

না। এরা পাঞ্জাবী। তবে ওই যে বুড়োকে দেখেছ দোকানে সেও জীবনে পাঞ্জাব দেখেনি। ওর বাবা আসামে কাজ করত। সে মরে যাবার পর ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় চলে এসে দোকান করে শুনেছি। এই যে বুড়ী মুটকীকে দেখছ ও তো পাঞ্জাবী নয় ও কি আমরা জানি না। এখানেই বিয়ে করা।

আপনে ··ভয়ে ভয়ে অধিকার ছাড়ানো প্রশ্ন ক'রল রেখার মা—আপনে তো বাঙ্গালী বইল্যা মনে লয়।

হ্যাঁ গো। বাঙ্গালী নয় তো কি ? আমার বাপের সঙ্গে রতনলালের খুব চেনা শোনা ছেল বলে ওর সঙ্গে বে দিল আমার।

আপনে কি এই পাশের ঘরেই থাকেন ?

না। আমি ওই পাশে। কেন, পাশের ঘরের মালতীকে চেন না কি ?

না, এমতেই জিগাই।

চিনবে, সবাইকেই চিনবে ত্'দিন থাকলে। যাও এখন মুখ হাত ধুয়ে এসো। তারপর কথা হবে।—বলেই বেরিয়ে গেল বউটা। চলার ভঙ্গীতেও কেমন অস্বাভাবিকতা নজরে এল রেখার মায়ের।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় রেখা মা-কে বলল—ওরা নিজেরা নিজেরা কি কয় কিছুই বুঝি না। কেমুন কইর‍্যা জানি কয়।

সত্যিই কেমন ক'রে যে বাড়ীওয়ালীরা নিজেদের ·মধ্যে কথা বলে তার বিন্দু বিসর্গ রেখার মা-ও বোঝে না। ভারী বিশ্রী লাগে যখন ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেরা কথাবার্তা বলে। তখন মনে হয় ওদের নামেই বুঝি কি

বলাবলি ক'রছে। কাজেই মনে মনে সাবধান হয় তখন। রেখা যেন মায়ের মনের কথাটাই মেলে ধরল মায়ের কানের কাছে। এই অস্বস্তি অনেকবার রেখার মাকেও ভুগিয়েছে। সেইসব সময় রেখা হয়ত মায়ের কাছেই থেকেছে, হয়ত একই অনুভূতি তার মনকেও কষ্ট দিয়েছে কিন্তু কেউ কারও মনের সন্ধান পায়নি। আজ পেল।

সেই কথাটা পছন্দকে বলল কিছুক্ষণ বাদেই। পছন্দ কোলের ছেলেটাকে নিয়ে এসে ঘরের মাঝখানটাতে বসে পড়ল, বলল—গল্প ক'রতে এলাম।

খুশী মনেই রেখার মা অভ্যর্থনা ক'রল পছন্দকে—আহেন। বহেন, কিন্তু কই যে আপনেরে বইতে দিমু ·

আঁচলটা পেতে দাও আর কি ক'রবে—বলেই পছন্দ ঠাট্টা ক'রে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সেই রসিকতার জবাবে রেখার মা বলল—আপনে গো মত লুকেরে কি আর ছিড়া আচলে বইতে দেওন যায় ?

তা হ্যাঁ গা রেখার মা—আঁচল থেকে এক খিলি পান খুলে নিয়ে মুখে পুরে জাবর কাটতে কাটতে পছন্দ বলল—তোমাদের কথা তো শুনলাম কাল, তোমার সঙ্গে নীতিনের কেমন ক'রে আলাপ হ'ল জানলাম না তো ?

নীতিন ক্যারা ?.

ওমা ওই যে তোমাদের নিয়ে এল এইখানে— ।

উনির লগে আলাপ তো নাই আমার। গিয়া আমাগো কাছে আহনের কথা কইতে আমরা রাজী হইয়া আইয়া পড়লাম।

একদিনেই ?

না। আগেও কয়দিন গেছিলো।

এমনি কথায় কথায় রেখার মা বলে ফেলল—এই যে আপনের লগে কথা কইতাছি কেমুন ভাল লাগতাছে। আর এই আপনে যখন অ'গ' লগে কথা কন শুইন্যা কেমুন জানি লাগে।

কেমন লাগে ?

এই ব্যাখায় কইতাছিল আর কি—একটু ভয়ে ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে সন্তর্পনে রেখার মা বলল—তিনিরা যা কন হেইয়ার কিছছু বুঝি না।

আস্তে আস্তেই বুঝবে। আমরাই কি আর বুঝতাম ? এখন বুঝি বলি।

অগ লগে আপনের কথা শুনলে বাঙ্গালী কইয়া বোঝনই যায় না।

মালতী কিন্তু অত ভাল বলতে পারে না। মালতীর কথা শুনেছ তো ?

হ শুনছি—। তিনির কথা কেমুন জরাইন্যা।

আরে না সে কথা বলছি না—গলা খাটো ক'রে পছন্দ বলল—বলছি ও কিন্তু রামলগনের বিয়ে করা বউ নয়, জানো সে কথা ?

কাইল যে আপনে বউ কইলেন ?

তাছাড়া আর কি বলব বল ? এই তিন বছরে চার চারটে বার ও পোয়াতী হয়েছে এর পরে বউ না বলে কি বলি ?

হেইড্যা ক্যামনে হয় আবার ?

তবে আর বলছি কি—অকারণেই চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিল পছন্দ তারপর দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলল—আসলে মালতী বিধবা। খেতে পেত না বলে মালিকের হোটেলে ঝি গিরি ক'রতে এসেছিল।

রেখার মা যেন চরম বিস্ময়ে গিলতে লাগল কথাগুলো।

পছন্দ বলে চলল—চোখ লেগে গেল রামলগন ভাইয়ার অমনি নিয়ে এল। বরাত যার ভাল আছে ঝি গিরি কেন ক'রতে হবে তাকে ?

তিনি এই বাবুর কে হইলেন ?

রামলগনের কথা বলছ ?

হ।

কে আর হবে, প্রথমে দোকানের কর্মচারী ছিল এখন ব্যবসার অংশীদার।

অনেক ব্যবসা আছে বুঝি কর্তার ?

অনেক নেই তবে যা আছে ভাল ব্যবসাই আছে।

হঠাৎ রেখার মা-র মনে সেই প্রথম রাত্রের স্মৃতি এসে হাজির হ'ল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বলল—আমি ভাবছিলাম আপনেই বুঝি থাকেন আমাগ ঘরের পাশে।

ওই রামলগনটা লোক কিন্তু খুবই বদ।

ক্যান ?

সবই বুঝবে। দিন যাক তখন আর আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে না।

পছন্দর কথায় আস্কারা পেয়েই রেখার মা সাহস ক'রে বলল, আপনে না বুঝাইয়া কইলে ক্যামনে বুঝুম কন ?

থাক না দুদিন কেমন ক'রে বুঝবে তা আর বলতে হবে না।

রেখার মা ভাবল এই সুযোগে গত পরশু রাত্রের ঘটনাটা প্রকাশ করে। আবার ভাবল তাতে কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হয়ত হয়ে যেতে পারে, এই ভয়েই সে কথাটা ঘুরিয়ে বলল—মালতী দিদির লগে তিনির বনিবনাত হয় কেমুন ?

কেমন ?—আর থাকতে পারল না পছন্দ, বলে ফেলল—মারধোর তো প্রায় রোজই খায় মালতী। আর বনাবনির কি দরকার বাপু রামলগন হচ্ছে গোঁয়ার লোক তার কথার একটু এদিক ওদিক হলে আর সহ্য ক'রবে না। আরে বাপু মানুষ কি মেশিন না কি ? একদিন ছুটি দেবে না। ওই তো রোগা শরীর

দেখছ কিন্তু বেচারীর পেট কোনদিন খালি দেবে না। ওই শরীরে এরকম হাল হলে ক'টা দিন বাঁচবে বল ?

রেখার মা নির্বাক হয়ে শুনতে লাগল মন্তব্য না ক'রে।

ক্ষণিক বিরতির পর পছন্দ আবার বলতে শুরু ক'রল—লোকটার মনুষ্যত্ব বলতে কিচ্ছু নেই। পরের দিকে একবারে তাকায় না। মেয়েটাকে যেভাবে করে জন্তু জানোয়ারও বোধ হয় এমন নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার ক'রতে পারবে না।

হঠাৎ রেখার মা বলে ফেলল—মালতী না করে না ক্যান ?

তাহ'লে আর রক্ষে আছে ? মেরেই অর্ধেক ক'রে দেবে না ? শেষ কালে সেই ছাড়বে তো না-ই উপরন্তু মার খেয়ে মরতে হবে। আপত্তি কি আর মালতী না করে, শুনছে কে ?

এমুন ক্যান লুকটা ?

আগে একএকদিন সকালে মালতী কাঁদত। যন্ত্রণায় উঠতে পারত না বিছানা ছেড়ে, আমি দেখতে গেলে আমাকে কিছু কিছু বলেও ফেলত। দেখতেও পেতাম জানোয়ারের মত অত্যাচার করেছে লোকটা।—পছন্দ থামল। আবার বলতে লাগল—আমার বাপু এদিক থেকে ভাল। রতনলাল মাঝে মাঝে জুলুম করে বটে তাই বলে রোজ অত ঝঞ্ঝাট করে না। রামলগন তো আর মানুষ মনে করে না মালতীকে, যন্ত্র মনে করে।

রেখা মনযোগ দিয়েই সব শুনছিল কিন্তু এসব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছিল তার কাছে। এমন কোন দুর্বোধ্য শব্দ পছন্দ মাসী ব্যবহার ক'রছে না অথচ কিছুই বুঝছে না সে, এইজন্যেই যেন রহস্য অধিকতর ঘণীভূত হয়ে চলল তার মনে। পছন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে কথাগুলো গিলতে লাগল। হঠাৎ পছন্দ তার দিকে তাকিয়ে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলল—দেখছ কেমন ক'রে শুনছে কথাগুলো ? আ লো তোরও এমনি হবে। কার হাতে গিয়ে পড়বি কে জানে, নিংড়ে নেবে একবারে। —কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখের ইশারায় এমন ভঙ্গী পছন্দ ক'রল যে রেখা পরিষ্কার ভাবে বক্তব্য না বুঝলেও দেহের স্থান বিশেষের নির্দেশে লজ্জা পেল।

রেখার মা পছন্দর কথায় সায় দিয়ে বলল—কথাডা ঠিকই কইছেন দিদি, মাইয়ালোকের ভাইগ্য এইয়ার কথা কি আর কইতে পারে কেও ?

তা মালতী মাগীটাও বোকা আছে বাপু—পছন্দ মুখ নাড়া দিয়ে বলল।

এইমাত্র এক রকম কথা হচ্ছিল হঠাৎ বক্তব্য পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে রেখার মা পছন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ মালতীর বোকামীর কারণটা জানতে চাইল নীরব প্রশ্নে। পছন্দ নিজের পূর্বকথার ধারা অনুসরণ ক'রেই বলে চলল—রামলগনের এক বন্ধু আগে এ বাড়ীতে প্রায়ই আসত। সে

এসে মালতীকে ফুসলাবার ধান্দা ক'রেছিল। বাবা আমার চোখে কি সব ফাঁকি দেওয়া যায়? আমি সব দেখেছি—তা ওই মাগীটা একদিন তাকে স্পষ্ট অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে! সেদিন ওই বাড়ীউলী, রামলগন কেউ বাড়ী ছিল না, সেই লোকটা বুঝে বুঝেই এসে হাজির হয়েছিল। কি না জানি বলেছে মালতীকে আর সে কি অপমান তোমায় কি বলব। বোকা সতীত্ব দেখাতে গেল, আরে বাপু সতীত্বই যদি দেখাবি তো বিধবা মাগী আবার জাত নয় জাত নয় আর একজনের কাছে থাকছিস কেন? বলি তখন তোর সতীত্ব কোথায় থাকছে? বছর বছর যে বিয়াচ্ছিস তখন সতীত্ব থাকছে কোথায়? সকলের কি আর ওসব দেখলে চলে? দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্যে তুই এসেছিস, যেখানে ভাল থাকতে পারবি সেখানেই তোর যাওয়া উচিৎ'

রেখার মা এখানের কাণ্ড শুনে অবাক হয়ে গেল। একি দেখছে সে এখানে! কি শুনে সে এসেছে আর কি দেখছে। যার সঙ্গে কথা বলছে তাকেও তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, দেখেও ভাল মনে হয় নি তাকে। কাজেই কোন মন্তব্য ক'রল না। ভাগ্যে আরও কত দেখবার আছে কে জানে। সবই দেখবার জন্যে মনে মনে তৈরী হ'ল।

একদিন আলাপ হ'ল মালতীর সঙ্গেও। মোটামুটি দেখতে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, ফর্সাও বলা চলে, তবে দেহটি কৃশ। শরীরে যৌবনের জৌলুস নিঃশেষিত প্রায়। বয়স তাই ঠিকমত অনুমান করা একটু দুঃসাধ্য। অনেক হাতড়ে রেখার মা স্থির ক'রল ত্রিশ, পছন্দর চেয়ে দুতিন বছরের বড়ই হবে। মালতীর সম্বন্ধে অনেক কথা পছন্দর কাছে আগেই শুনে রাখার ফলে রেখার মা কেমন না ছুঁই না ছুঁই ভাবে কথা বলতে লাগল মালতীর সঙ্গে। রেখার মা তার চল্লিশ বছরের জীবনে এমন একটি মেয়েছেলের সাক্ষাৎ এই প্রথম পেল। কথা বলবার ইচ্ছা না থাকলেও বলতে হ'ল এবং আরও যা জানল স্তম্ভিত হয়ে গেল তাতে। ওই যে পছন্দ একমুখ পান খেয়ে তাকে রতনলালের বউ বলে আত্মপরিচয় দিয়ে রেখেছে তার সবই নাকি মিথ্যে আসলে সে ওদের দোকানে এক ছোকরা কাজ ক'রত তারই খরিদ করা বউ। বছর তিনেক আগে পছন্দর বাবা-ই এসে নিজে পছন্দকে বিক্রি করে দিয়ে যায় সেই ছোকরার কাছে। তার-পর সেই ছোকরার অসুখ হওয়ায় বিহার প্রদেশে তার দেশে চলে যায় এবং এখন রতনলালের সঙ্গে আছে পছন্দ। কোলের ছেলেটি রতনলালেরই ফসল। মুখে কোন কথা না বললেও মানুষ কেনাবেচার কথাশুনে মনে মনে শিউরে উঠল রেখার মা—বাপরে এ কোথায় এসে পড়েছে তারা! এমন জায়গা তো

জীবনে দেখেনি! তবে আধ-বিশ্বাসের মধ্যে থাকতে থাকতে একদিন সত্যিই দেখল একটি মেয়ে কোত্থেকে এল এবং একদল লোক এসে তাকে নিয়ে চলে গেল রাত্রে। শুনল মেয়েটার নাকি বিয়ে হয়ে গেল। মনে পড়ল যে লোকটা তাদের এখানে এনেছিল সে-ও আশ্বাস দিয়েছিল রেখারও বিয়ে দিয়ে দিতে পারে এরা। তবে কি এমনি বিয়ে? আতংকে শীর্ণ হয়ে গেল রেখার মায়ের মন।

মালতী আর পছন্দকে দেখে মার মনে হ'ল এরা এমন ভাবে এই অদ্ভুত ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিল কেন? এ যুগেও মানুষ কেনা-বেচা চলে আর মানুষে সেই অবস্থাকে মেনেই বা নেয় কেন? বিশেষ ক'রে মালতীর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে রেখার মা বারংবার এই কথাটাই বুঝতে চেষ্টা ক'রল। মালতীকে দেখে সে বুঝেছে, সুখী নয় মালতী। শান্তিতে তো কোনমতেই নেই। তবু কেন এ অবস্থা মেনে নিয়েছে? রয়েছে কেন? ওই তো পছন্দ বলেছিল চলে গেলেই পারে। কিন্তু যাবে কোথায়? সত্যিই তো কোথায় যাবে এরা? এই তো এতদিন রেখাকে নিয়ে তার মা এসে পড়েছে এদেশে, কোথায় যেতে পেরেছে? ধর্ম আর ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে কি বাঁচাতে পেরেছে? নিজেদের দেশে দেহের বিনিময়ে ধর্মান্তরিত হয়ে নিশ্চয়ই প্রাণে বাঁচতে পারত। তা চায় নি বলেই না চলে এসেছে প্রাণ নিয়ে কিন্তু এখানে সেই প্রাণটুকুই যে বাঁচে না। কলকাতায় প্রাণ কি অফুরন্ত, জীবন যেন বনের ঘোড়া, মুক্তির আনন্দে উদ্দাম অথচ এই কলকাতায় তারা সব খসে যাওয়া শুকনো পাতার আবর্জনা। অথচ মানুষের বেঁচে থাকবার জন্যেই সব, তাই মালতী-পছন্দরা শুধু বেঁচে থাকবার বিনিময়ে জীবনের অন্যসব সর্তগুলোয় নিজের হাতেই চ্যারা দিয়েছে। প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখতে চায় বলেই মান দিতে কোন অসুবিধে বোধ করে নি। এমনি যে কত মেয়ে আছে কে জানে, তাহ'লে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে ওই যে সোনা মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল সেও বোধহয় এমনি. কোথাও আছে। অথবা ওই যে মেয়েটা কাল বিক্রী হয়ে অনেকদূরে অজানা কোন দেশে চলে গেল এমনিভাবেই বুঝি হারিয়ে গেছে কোথাও। এক বিরাট চক্র ঘুরেই চলেছে। এই চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে কত মেয়ের জীবন, কেউ কেউ হয়ত প্রাণ বাঁচাবার সুযোগটুকু পেয়েই স্বস্তি পেয়েছে। তাহ'লে তার রেখাকে নিয়েও হয়ত এমনি ফন্দি ক'রেছে এরা। রেখার মায়ের বুকের মধ্যে একটা মরুভূমির শুষ্কতা অনুভূত হতে লাগল। সেই শুষ্কতা ওপর দিকে উঠতে লাগল কণ্ঠনালী বেয়ে।

মরিয়া হয়ে সে পরদিন মালতীকে বলল—তোমার পায়ে পড়ি দিদি আমাকে এউগ্যা কথা কও।

পায়ে পড়ার কথায় সংকুচিত হ'ল মালতী, বলল—ছি ছি ওসব ব'লো না। কি বলতে হবে বল ?

আমি শুনছি এইখানে মাইয়া মানুষ ধইর‍্যা আইন্যা বিক্রী করণ হয়। এইটা কি সত্য ?

মালতী চুপ ক'রে রইল। চারপাশে তাকিয়ে বলল, পরে সময়মত বলব।—বলে আর এক মুহূর্ত দেরী না বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মালতীর এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ায় রেখার মা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কে জানে হঠাৎ কেন উঠে চলে গেল এইভাবে। শেষকালে আবার বাড়ীউলী বুড়ীকে বলে দূর ক'রে দেবে না কি ? গলার স্বর হঠাৎ যেমন গম্ভীর হয়ে গেল তাতে এইরকম অনুমান করা বিচিত্র নয়। এতক্ষণ বেশ কথা বলছিল হঠাৎ এমনই বা ক'রবে কেন ? রেখার মার ভয় হ'ল সত্যিই যদি এরা তাড়িয়ে দেয় কি হবে তা'হলে ? কোথায় যাবে তারা ? কি কুক্ষণেই না প্রশ্নটা ছুটে গিয়েছিল মুখ থেকে। মালতীর কাছে জিজ্ঞেস করাই অন্যায় হয়েছিল তার। অবশ্য মালতীকে তো কত ভালই না মনে হয়েছিল ! পছন্দর চেয়ে কত ভাল মেয়ে মালতী···সেই মালতী কি এরকম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে পারে ? তবু যদি করে ? করে করুক গে রেখার মা দৃঢ় হ'ল—এখানে থেকে নিজেদের বিক্রী যখন সে কিছুতেই ক'রবে না তখন তার চলে যাওয়াই ভাল। বাড়ীউলী তাড়িয়ে দিলে বরং ভালই হবে তাড়াতাড়িই নিজেদের রাস্তা দেখে নিতে পারবে ওরা ! যা হয় হবে মোটেই গ্রাহ্য ক'রবে না সে। একটা ছোট্ট মেয়ে নিয়ে অতবড় রাষ্ট্রের বাধা অতিক্রম ক'রে যদি সে চলে আসতে পেরে থাকে তাহ'লে এই সামান্য বাধাগুলোও দূর হয়ে যাবে—অতিক্রম ক'রতে পারবে তারা। মালতী যদি বলেই দেয় তো দিক। প্রতি মুহূর্তেই রেখার মা বাড়ীওয়ালী অথবা মালতীর পুনরাগমণের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগল।

মালতী এল দুপুর বেলা। বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রতনলাল দোকানে গেছে বলে পছন্দও গেছে সেখানে। বুড়ো মালিক কৃপারাম নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ঘরের দরজার সামনে দিয়ে গেলে বাড়ীওয়ালীর নাক ডাকার বীভৎস শব্দ পাওয়া যাবে। মালতীর ছেলেগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে বলে নিশ্চিন্ত মালতী এসে বসল, সারাদিন প্রতিকূলতার চিন্তায় রেখার মা বিভোর ছিল বলেই মালতীর সুপ্রসন্ন মুখচ্ছবি দেখে তার হর্ষ দ্বিগুণ হ'ল। সপ্রীতি সম্ভাষণ জানাল—আসো দিদি আসো।

মালতী রেখার দিকে চেয়ে তার মাকেই বলল—বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু। শুধু তোমায় কথা দিয়েছিলাম বলে এলাম।

রেখার মা মালতী সম্পর্কে সারাদিন যেসব চিন্তা ক'রেছিল তার জন্যে মনে

মনে লজ্জিত হয়ে বলল—আমরা দিদি মানুষ চিন্তাও চিনতে পারি না। এই তো আমাগো দুষ।

মালতী প্রতিবাদ ক'রে বলল—কি করবে বাপু, মানুষ কি আর একরকম, কতরকম মানুষই যে আছে কিং ক'রে আর চিনবে? এক একজন এক এক মতলবে আছে।

মন্দেরে চিনন সহজ নয় জানি। ভালরেও যে চিনতে পারি না সময় সময়।

তা তো হবেই। কে ভাল আর কে মন্দ খুঁজে পাবে কি ক'রে? এই যে যেখানে এসেছ কেউ এদের ভাল বলে কেউ মন্দ। কাজেই ভাল মন্দের বিচারই বা ক'রবে কি ক'রে?

ভাল রে আর মন্দ কইব ক্যান?

আমার কাছে যে ভাল তোমার কাছে সে তো ভাল না-ও হতে পারে?

তা ক্যামনে হইব? যে ভাল হইব সে হগলডির কাছেই ভাল হইবো। তারে ভাল কইবো সক্কলেই।

তা হয় না। এই যে আমার কথাই ধর না, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলাম শশুর বাড়ী থেকে অত্যাচার করায় চলে আসতে হ'ল। তারা খুব গরীব। যা রোজগার তাদেরই চলে না আমায় খেতে দিতে হ'লে রাগ তো হবেই তাদের। এদিকে বাপের বাড়ি কেউ নেই। একটা মাত্র বোন আছে সে বিয়ে হবার পর থেকে কোথায় থাকে জানি না। বল কোথায় দাঁড়াব? দিনকতক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ঘুরলাম কিন্তু কে আমায় আশ্রয় দেবে বল? কোথাও আশ্রয় পেলাম না সুবিধে মত কাজ পর্যন্ত পেলাম না। শেষে একজন কাজ দেবার নাম ক'রে এখানে আনল আমায়। তারপর কি কাজ করছি তো দেখছই। তবে বেঁচে আছি কোনমতে। আমাকে আত্মীয়স্বজন খারাপ বলে আমি জানি, যে দেখবে সেই খারাপ বলবে কিন্তু এই সমাজে বাঁচি কি ক'রে বল? মালতী থামল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—এদের কাছ আমি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আমিও তাই যন্ত্র হয়ে গেছি, যেমন চালায় তেমনি চলি, সবই সহ্য করি।

মালতীর কথাগুলো মনে বড় দাগ কাটল রেখার মায়ের। সহানুভূতি প্রদর্শন ক'রে বলল—মানুষে মানুষের দুঃখ বোঝে না দেইখ্যাই শেন এত অসুবিধা। কেউ কষ্টে পড়লে যেন অন্য সকলে তারে কামড়াইবার আসে।

অল্প কিছুদিন অনাথা হয়ে ঘুরেছিলাম, তারই যা অভিজ্ঞতা সে আর তোমায় বলব কি দিদি। মানুষ তো নয় যেন সব উপোসী বাঘ। শুধু কি তাই? কারও কাছে যদি একটু সহানুভূতি পাওয়া যায়। তাছাড়া করবেই বা কি ভেবে দেখলাম সকলেরই তো রোজগার বলতে ওই সামান্য চাকরী। কতই বা মাইনে তার—আয় যা তাতে নিজেদেরই কুলোয় না আর একজনকে

রাখবে কি ক'রে? আমাদের পুরুষ মানুষরা টাকা রোজগার ক'রতে জানে? টাকা আনে ছাখ এরা। কতভাবেই না টাকা আয় করে।

রেখার মার সঙ্গে রেখাও মালতীর কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল। মালতী অবিচ্ছিন্ন ভাবে বলে চলেছে—দোষ নেই। কারও দোষ নেই। এই যে তোমার মেয়ে, বয়স যখন হবে তখন যদি ও বোঝে যে বিয়ে দেবার সামর্থ নেই তোমার তখন ও সামনে যাকে পাবে তার সঙ্গেই মিশবে। ভাল কাউকে পেলে বিয়ে ক'রে সংসারী হতে পারবে কোন বদমায়েসের পাল্লায় পড়লে এক হাত থেকে আর এক হাতে ঘুরতে হবে যৌবন যতদিন থাকবে।

কথাটা শুনে শিউরে উঠল রেখার মা। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যেই বলল—অর বিয়া যেমনে পারি না ক্যান দিমু আমি। সক্কাল সক্কালই দিমু।

আহা আমি কথার কথা বলছি আর কি—মালতী রেখার মার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল। রেখার মা তাতে লজ্জিত হয়ে বলল—হ হ কন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মালতী বলল—নাঃ আজ চলি। অনেকক্ষণ গল্প ক'রলাম। তুমি ওবেলা আমায় কি জিজ্ঞেস করছিলে যেন?

থাক হেই কথায় আর কাম নাই। বলে সেই প্রশ্নটি নিজের বোকামী মনে করেই চাপবার চেষ্টা ক'রল রেখার মা। মালতীও চুপ ক'রে রইল। অতীত দিনের কথা অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল তার। এমন তো কখনও হয় না! কখনই তো অতীতকে মনে পড়ে না, তবে এখনই বা পড়ল কেন? যে কথা ভুলেই গেছে তাকে হঠাৎ মনে পড়বার দরকারই বা কি ছিল? ভালভাবে মনে পড়ে না মালতীর তবু মনে যে কখনও পড়ে অসুবিধে সেইখানেই। অতীতকে না ভুললে বর্তমানের স্বাদটুকু ভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে সময় সময়। তাই মালতীর পক্ষে অতীত অকল্যাণকর। রেখার মার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অতীত এল বলেই মালতী আর কিছু না বলে উঠে গেল। ছেলেগুলো উঠেছে কিনা দেখবার মনস্থ ক'রে স্মৃতিকে মন থেকে সরিয়ে দিল।

সমাজ তাকে বাঁচবার অধিকারটুকু দেয় নি, তার চারপাশের কেউ তাকে বাঁচাতে পারে নি তার মৃত্যুর মুহূর্তে, কাজেই এখানের নতুন পরিবেশ নতুন পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকাকে মালতী নবজন্মই মনে ক'রবে। এই নবলব্ধ জীবনে সে জাতিস্মর হতে চায় না। এ জীবনে যা-ই সে পেয়ে থাক তা নিয়েই সুখী। যা হারিয়ে গেছে তার কথা ভেবে শোকানল জ্বালিয়ে সে উষ্ণতা অনুভব ক'রতে চাইবে না। রেখার মা মালতীর মনের অবস্থাটা বুঝল এবং বলল—আপনে কিছু মনে কইরেন না কিন্তু। শুনছি কি ইনিরা নিকি মাইয়া মানুষ ধইর‍্যা আইন্যা বিক্রী করেন?

প্রশ্ন শুনে মালতী একমুহূর্তও দ্বিধা না করে জবাব দিল—তোমাকে কে যে বলেছে জানি না। তবে ধরে এনে কাউকে বিক্রী করা হয় না। দালালী করে এরা, অনেক মেয়ে আসে যারা শুধু বেঁচে থাকবার জন্তেই যে কোন জাতের বা দেশের লোকের ঘর ক'রতে চায়। এরা সেইসব মেয়েদের নানাদেশে চালান দেয় বা এখানে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দেয়। হ্যাঁ যারা এইসব মেয়ে নেয় টাকা তারা এদেরকে দেয় বটে তাকে বিক্রী বলে কিনা জানি না। তবে এটা দেখেছি যে অনেক বাবা তাদের মেয়েকে এখানে এনে এদের হাতে বিক্রী ক'রে দিয়ে গেছে। মালতী চুপ ক'রল। এমন স্পষ্ট জবাব শুনে রেখার মা অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। মালতীই সেই অবসরে বলল—তবে কখনও কখনও বাজে লোকে অনেক গরীব গৃহস্থঘরের ভাল মেয়েকে ফুসলিয়ে ফাঁকি দিয়ে এখানে নিয়ে এসে বিক্রী ক'রে দিয়েও যায়। এরা আজকাল অনেক মেয়ে এমনিতেই পায় বলে ওসব ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না। এই কলকাতায় এমন কত লোক আছে এরকম—।

মালতীর কথাগুলো শুনে রেখার মা যেন ভয়ে গুটিয়ে গেল। পাকিস্থানে সে দেখে এসেছে মূঢ় ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে একদল পশু অবাধে নারী হরণ ও ধর্ষণের অত্যাচার করে। খুন করে। কিন্তু এখানের এরা? এদের সম্বন্ধে কি বলা যায়? নারীহরণ সে ক'রতে দেখেছে তখনই যখন মানুষ মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা থেকে অপসৃত। আর এরা সুস্থ দেহে ধীর মস্তিষ্কে পরিকল্পিত উপায়ে দিনের পর দিন হৃত নারীকে পণ্য ক'রে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, অর্থ উপার্জন ক'রছে। রেখার মা নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে ক'রত এইজন্তে যে তার কোনদিন সেইসব লুঠেরাকে দেখবার দুর্ভাগ্য হয়নি। আজ তার মনে হচ্ছে সেই পুন্নাম তার পেছন পেছন ধাওয়া ক'রে এসে ধরেছে তাকে। তাদেরকে। যে নরককুণ্ড থেকে সে মেয়ের হাত ধরে পালিয়েছে সেই নরক, উঠে এসেছে এতদূর এসেছে তার কচি মেয়েটিকে গ্রাস ক'রতে। না। তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। এতদিন যখন জলের কুমীরকে এড়াতে পেরেছে এখন তাহ'লে ডাঙ্গার বাঘের গ্রাসেও প্রাণ দেবে না। ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ হু হু ক'রে কেঁদে উঠল রেখার মা। অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে মালতীর হাত দুটো ধরে বলল—তোমার দয়া আমি জীবনে ভুলুম না দিদি। তোমার এই উপকারের ঋণ আমি—

মালতী আর বলতে দিল না, বলল—কথাটা বেশী না বললেই ভাল হয় দিদি। বুঝতেই তো পারছ আমি এসব বলেছি জানতে পারলে আমার কি অবস্থা হবে? কাজেই সাবধান হ'য়ো একটু।

একটু সামলে নিয়ে রেখার মা বলল—তোমার উপকার তো করতে পারুম না দিদি কাজেই অপকার হয় এমুন কিছু করুম না। তবে ভগবানেরে কই দিদি

তোমার জ্যান ভাল হয়, তুমি জ্যান সুখী হও।

ভগবান !—মালতী দৃঢ় স্বরে বলল তোমাদের ভগবান তাদেরই ভাল করে যারা নিজেদের ভাল করার যথেষ্ট বেশী ক্ষমতা রাখে।

রেখার মা প্রশ্ন ক'রল—হেই কথা কও ক্যান দিদি ? এমুন কথা কও ক্যান ?—কিন্তু দেখল জবাব দেবার জন্য কেউ বসে নেই, মালতী ততক্ষণে বেরিয়ে চলে গেছে। রেখার মা ভাবল, বাস্তবিকই সে বুঝতে পারল না মালতীকে, যেমন এই পৃথিবীর কাউকেই বুঝতে পারে নি।

আর বুঝতে না পারা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষের অংশীদার হয়ে অনন্ত চলমান জনতার সঙ্গে চলে বেড়াচ্ছে সে ছোট্ট মেয়েটির হাত ধরে—এই বিশ্বাসে যে মেয়েটির জন্যেই সে বেঁচে আছে। আর যে কটি মানুষকে বুঝেছে সে কটির সঙ্গ ছেড়েছে প্রথমবার পাকিস্থানে স্বগ্রামে, দ্বিতীয়বার মালতীদের বাড়ীতে। মালতীর কাছে সব কিছু শোনবার পর দুটো দিন শুধু পালিয়ে আসবার সুযোগ সন্ধান ক'রেছিল রেখার মা, তৃতীয় দিন দুপুরবেলা সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে চলে এসেছিল। যেদিকে চোখ যায় ভেবে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে এই কালীঘাটের জঙ্গলে এসে পড়েছে—জনজঙ্গলে। প্রথম কিছুদিন এখানে সেখানে ঘুরেছে মন্দিরের চারপাশে, এক এক দিন এক এক জায়গায় রাত কাটিয়ে অবশেষে কতগুলো কমবয়সী ভিখারীর সাহায্যে এই ঘর গড়ে তুলেছে। রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় আর ভাঙ্গা টিনের অংশ জুটিয়ে তার ওপর ইঁট চাপা দিয়ে গড়ে উঠেছে এই দুর্গ। একদিকে পার্কের রেলিং থেকে অপর দিকটি ক্রমাগত ঢালু হয়ে গেছে মাটি পর্যন্ত। দিনের বেলা ঘরের ভেতরে থাকবার প্রশ্নই ওঠে না, রাত্রেও মেয়েকে ভেতরে শুইয়ে নিজে সামনেটায় শুয়ে থাকে রেখার মা। কেবল রাত্রে বৃষ্টি এলে মেয়েকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে দুজনেই বসে বসে রাত কাটায়। রেখা আজকাল বড় হয়ে ওঠায় অতি সন্তর্পণে থাকতে হয় রেখার মাকে। বদমায়েস লোকের উৎপাত এত বেশী যে মেয়ে নিয়ে থাকতে তার বিশেষ ভয় করে। আগে ভাবত বিয়ে দিয়ে দেবে মেয়েটার, সে অনেক আগে, তারপর দিনে দিনে সেই চিন্তা দূর হয়ে গেছে। মাঝে ইচ্ছে ক'রেই ভাবত না সে কথা, আজকাল ভুলেই গেছে তবু চিল শকুনের হাত থেকে আড়াল ক'রে মেয়েকে নিরাপদে রেখে যেন নিজের দায়িত্ব পালনই ক'রছে মনে করে রেখার মা আজকাল, শুধু সেইটুকুই ক'রে চলে।

কিন্তু বিকাল হলেই ও রাস্তার ওই বদমাস মিঠাইওয়ালাটা আসে, দূর থেকে মেয়ের দিকে ইশারা ছুঁড়ে দিতেও এক-আধবার দেখেছে সে। মাঝে দু-একবার গায়ে পড়ে ভাব ক'রতেও এসেছিল, রেখার মা-ই কাছে বেশী

ভিড়তে দেয় নি। শিয়ালদহ স্টেশনের অভিজ্ঞতা থেকে আজকাল আর কাউকে ভরসা ক'রতে পারে না সে। যে মানুষ একটু সহানুভূতি দেখায় তার ওপরেই সন্দেহ করে। বেশী মাখামাখি ক'রতে গেলেই তার কাছ থেকে মেয়েকে সরিয়ে আনে ভয়ে ভয়ে। এমন তো কত ছোকরাই আসে তাদের ভাগিয়েও দিয়েছে রেখার মা কেবল পারেনি এই ছ্যাচড়া মিঠাইওয়ালাটাকে। এই লোকটা হাঁড়ি থেকো কুকুরের মত রোজই এসে দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। সেখান থেকে ইশারা ছোঁড়ে হাসি ছোঁড়ে আর গালাগালি খায়। তবু লজ্জা নেই লোকটার। এছাড়াও লোকটির ওপর রাগের প্রধান কারণ—ওর কৃপণতা। এখানে এমন ঘুর ঘুর ক'রে ঘোরে কিন্তু ওর দোকানে গেলে কর্মচারীরা একটা পয়সাও দেয় না। উপরন্তু গালাগালি দেয়। ভেতরে একজায়গায় পয়সার বাক্স নিয়ে বসে থাকে, ও নিজে যদি একবার বলে দেয় তাহ'লে কি আর পয়সা দেয় না কর্মচারীরা? তাই রেখার মার তীব্র বিরূপতা ওর প্রতি।

ইদানীং কালক্ষয়ে বিরূপতা স্বাভাবিক ভাবেই একটু কমে এসেছে। এখন তাই একটু আধটু এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে রেখার মা। তাছাড়া ওপাশে সীতা বলে যে কালো কুচকুচে সুন্দর বউটা এসেছে সেও ভারী শক্ত মেয়েমানুষ। সহজে কাউকে আশেপাশে আসতে দেয় না। ওর ভরসাতেই আরও রেখে যাওয়া মেয়েটাকে। প্রথম প্রথম রেখার মা-র অবশ্য ওদের এই আসাটাকে খারাপই লেগেছিল। ঝগড়া করবার চেষ্টা দু-একবার করে নি এমন নয়, তবে সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি। সমস্ত কটূক্তি বউটি নীরবেই হজম ক'রেছে। ফলে কলহ সৃষ্টি ক'রতে না পেরে ভাব করার ইচ্ছাটাও হয় নি। যেমন ওরা এসেছিল তেমনি অপরিচিতই আছে।

ভোরবেলা উঠে সীতা হিসেব ক'রল এখানে আসা আজ তাদের আটদিন হ'ল। গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাল নিরঞ্জনকে ভিক্ষায় বেরোতে হবে। ভোর ভোর না বেরোলে কিছু পাওয়া যায় না ঘুরে ঘুরে মরতে হয়। বিশেষ দু-চারজন স্নানার্থী খুব ভোরে এসে দান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে থাকে. তাদের জন্যেও ভোরে ওঠা প্রয়োজন। নিরঞ্জন সাড়া দিল কিন্তু ওঠবার লক্ষণ দেখাল না। ঘুমের ঘোরেই সীতা ডাকছিল দু-চারবার ডাকতে নিরঞ্জন উঠল আর তার নিজেরও জড়তাটা কেটে যেতে শুনতে পেল ব্যস্ত মানুষের চলাফেরার শব্দ। আজ কি তবে অন্য দিনের চেয়ে দেরী হয়ে গেল উঠতে! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল অনেকগুলো তারা তখনও এদিকে ওদিকে উজ্জ্বল। তবে? কাদের পায়ের শব্দ সীতা বুঝতে চাইল! কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে শুনতে পেল পাশের বুড়ীটা চেঁচিয়ে কাকে গালাগালি দিয়ে বলছে—জায়গা রাখছি আমি, ওই কাপর যদি উঠাইবা তো গুষ্টির নাম ভুলাইয়া দিমু কইয়া দিলাম।

যে-ই উঠাইবো তারেই দেইখ্যা লমু—কইলাম।

ওদিক থেকে কে যেন তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরে মুখর হ'ল—কেত্‌ন জায়গা রাখেগা? ক'ঠো জায়গা রাখে গা?

সীতা এত প্রত্যুষে কলহের কারণ খুঁজে পেতে চাইল। কোন জায়গা এবং কিসের জায়গা নিয়ে যে ঝগড়া জানতে চেয়ে সীতা শব্দ লক্ষ্য ক'রে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল রাস্তায় সারি সারি লোক বসে আছে এবং সেইসব লোক অস্পষ্ট হ'লেও সীতা বুঝল, তাদেরই মত পরান্নজীবী সম্প্রদায়। ব্যাপারটা কি? সীতা জানতে চাইল। এবং জানতে পারার অন্য কোন উপায় না পেয়ে নিরঞ্জনকে বলল—সিদিক পানে পথের 'পরে সকলে বসছে ক্যান গো?

কোথাকে—নিরঞ্জন আড়মোড়া ভেঙ্গে জানতে চাইল।

হেই দিগে—সীতা গঙ্গার ঘাটের দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রল সেই আবছা অন্ধকারে।

কথাটা শুনেই নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠল—ও হো আজ যে নীল ষষ্ঠী গো। মেয়েরা সব ঘাটকে যাবেক। দান পুণ্য ক'রবেক সকলে। এ হে হ, এক্কেবারে ভুইলে গেলাম গো—।

নিরঞ্জন এবার ধড়মড়িয়ে উঠল, ছেলেকে টেনে তোলবার চেষ্টা ক'রল। সীতা সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্যেই তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল মদনকে। নিরঞ্জন বলল—আরও আগে উঠতে পারলে কাজ হ'ত।

আরও আগে?

হাঁ। জায়গা নে বসতে হ'ত। জায়গা এখানে মিলবেক কিনা কে জানে?—

সত্যিই জায়গা মিলল না। রাস্তার ধারে ধারে কাপড় পেতে শুয়ে আছে সব সন্ধ্যে থেকেই। রাস্তার বিজলী আলোয় নিরঞ্জন তাদের প্রত্যেক সহবাসীকেই চিনতে পারল। আরও অনেককে দেখল যাদের সে গত সাত দিনের মধ্যে কখনও দেখে নি, বুঝল বাইরে থেকেও অনেক ভিখিরী তাহলে এই স্নানের যোগ উপলক্ষ্যে মানুষের পুণ্য সঞ্চয়ে সাহায্য ক'রতে এসেছে। তারা সবাই মিলে দখল ক'রে রেখেছে বলে জায়গা পেল না নিরঞ্জনরা। তাছাড়া এক একজন লোক যেন মাইল জুড়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পেতে রেখেছে এর মধ্যে অন্য লোক কি ক'রে জায়গা পাবে? তবু জায়গার আশায় এগিয়ে চলতে লাগল নিরঞ্জন সীতাকে নিয়ে। কিছুটা দূর গিয়ে ঘাটের প্রায় কাছে একটু স্থান কোনরকমে পেল ওরা। ততক্ষণে সকলের কাপড়ের ওপর চালডাল কিছু কিছু পড়েছে। সীতা নিজের আঁচল পেতে বসল ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে ক'রে।

স্নানার্থী যাত্রীরা কেউ কেউ পয়সা, কেউ মুঠো চাল ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে আবার কেউ বা স্নান ক'রে ফেরবার পথে দান ক'রছে পুণ্য সঞ্চয় ক'রছে।

মেয়েদের ঘাট বলে স্নানার্থী সকলেই মহিলা আর পুণ্যের প্রয়োজনটা ওদেরই বেশী বলে ক্রমাগত ভীড় বেড়েই চলেছে। সূর্য উঠতে না উঠতে ভীড় বেড়ে গেল অনেকটা সোরগোলও সেই পরিমাণ। চারিদিক থেকে অনবরত চীৎকারে ভিক্ষার্থীরা ভিক্ষা চাইছে, পথের দুধারে ভিখারীদের ফাঁকে ফাঁকে নানা দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে যারা বসে আছে সেই উঁচু পর্যায়ের ভিখারীরা পরের কল্যাণে ব্রতী হয়ে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে—আসুন মালক্ষ্মীরা। এই যে মা জননী আসুন সাবিত্রী সিঁদুর নিয়ে যান মা, সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক। জন্ম জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা। এই যে মা শনির পুজো দিন মা। এই যে মা মাদক্ষিণা কালীর নামে কিছু দিয়ে যান মা। মা এদিকে আসুন নবদুর্গার মন্দির দর্শন ক'রে যান। আয়োজনের ঘাটতি নেই। হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতার স্বীকৃতি দিয়েছে বলে অগুণতি দেবদেবীরা থাল-গঙ্গার ঘাটে ভিড় ক'রে সমবেত পুণ্যার্থীণীদের অক্ষয় স্বর্গলাভের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে দিতে ব্যস্ত। তবে মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সাবিত্রী সত্যবানের ভিড় বেশী। অনেক সাবিত্রী সত্যবানেদের মৃতদেহ সামনে করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। পুরোহিতের কাছেই সিন্দুর এবং স্ত্রী হাতের লোহা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তাই কিনে কিনে সেই সাবিত্রীর পায়ে ছুঁইয়েই একটু সিন্দুর ঘরে নিয়ে যাচ্ছে আজীবন এয়োস্ত্রী থাকবার কামনায় আর বাকী সিন্দুর ফিরে যাচ্ছে বিক্রেতার কাছেই। নিরঞ্জন তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যবসায়ী বুদ্ধির প্রাখর্যটা দেখতে লাগল। উপরন্তু সাবিত্রীর পায়ের কাছে পয়সাও কম পড়ছে না।

কাপড় পেতে বসে থাকা ভিখারীরা সকলেই চিৎকার ক'রে প্রার্থনা জানাচ্ছে সীতা তাই দেখছিল, কি অসম্ভব চিৎকার ক'রছে সব, যেন পারলে কেড়ে নিয়ে আসে। হঠাৎ সে শুনতে পেল তার পাশের বুড়িটি বলছে আগেকার দিনে মা এমন দিনেতে এতক্ষণ কত চালই পাওয়া যেত। এই এতো, বলে হাত দিয়ে পরিমাণ দেখাল 'তারপর বলল, কি ক'রবে লোক। এখন সব নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না দেবে কোত্থেকে ? নইলে গেরস্থ বাড়ীর বউরা কি না দিতে চায় ?

অপরিচিতা বৃদ্ধার কথার জবাব দিল না সীতা। তবে বৃদ্ধার দিকে তার কথা শোনবার জন্যে তাকিয়ে রইল। বক্তা বলে চলল—দেশের যা হালচাল হয়েছে এতে মানুষের বেঁচে থাকা কষ্ট। বলে একটু থামল তারপর যেন নিজেকেই নিজে বলতে লাগল—একে কি আর বেঁচে থাকা বলে ? আমরা তো সব মরেই আছি। বড়লোকেরাই শুধু বেঁচে আছে গেরস্থরাও বেঁচে নেই।

সীতা আর বৃদ্ধার কথায় মন রাখতে পারল না। কারণ মনের আক্ষেপে বৃদ্ধা তখন বকেই চলেছে। আর সীতার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপিঠে ওই কি সব ঠাকুরের মন্দিরে। বারান্দায় একটা কাঠের সাবিত্রী সত্যবান বসিয়ে

জীর্ণ দেহ এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েছেলেরা স্নান সেরে উঠলেই করকরে গলায় ডাকছে। মেয়েরা এসে যখন পয়সা দিচ্ছে বুড়ো মুখে কি সব বলছে জোরে জোরে কিন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছে সত্যবানের পায়ের ওপর রাখা পয়সাটার দিকে। সেই যাত্রী চলে যাচ্ছে অমনি যেন ছোঁ মেরে বুড়ো তুলে নিচ্ছে পয়সাটা। এমনভাবে নিচ্ছে যেন সে সেই নিমেষে তুলে না নিলে অন্য একজন দাঁড়িয়ে আছে নিয়ে নেবে। সীতা চেয়ে চেয়ে দেখল শুধু, কিছু ভাবল না, এমনকি তাদের সঙ্গে ওই বুড়ো পুরোহিতের সামঞ্জস্যের কথাও মনে হ'ল না ওর। কেবল একসময় ওর মনে হ'ল কলকাতায় যে এত ভিখারী থাকতে পারে এ যেন এক পরম আশ্চর্যের বিষয়। আর তারও চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু এই যে এখানে যেন সবাই ভিখারী। তাদের গ্রামে পুরোহিত ছিল গোবিন্দ চক্রবর্তী! সব লোকের বাড়ীতে আর বারোয়ারী তলায় পুজো ক'রে বেড়াত, তাকে তো কই ভিখারী বলে মনে হ'ত না? যদিও লোকের কাছ থেকে কম বেশি পেয়েই দিন চলত তার কিন্তু কখনও তাকে এমনভাবে চাইতে দেখে নি কারও কাছে। এখানে পুরোহিতও ভিখারী! হঠাৎ তার মনে হ'ল এ কি ভাবছে সে? কি সর্বনাশ! মনে মনে সম্ভাব্য পাপের আশংকায় আঁতকে উঠল সীতা। ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এসব চিন্তাও তো পাপ, হায় ভগবান, ভুল ক'রে দোষ ক'রে ফেলেছে সে এবারকার মতো যেন মাপ করা হয় তাকে। এমনি কত জন্মের পাপে এই শাস্তি আবার পাপের পরিমাণ বাড়লে সাতজন্মেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। এ কি ক'রল সে? অনুতাপে দগ্ধ হ'তে লাগল।

পাশের বুড়িটি বলে উঠল কি ভাবছ গো মেয়ে? অত আনমনা থাকলে কি ভিক্ষা মেলে? সবাই মাঙছে আর তুমি মুখ বুঁজে থেকে পাবে?

সত্যিই তো, সম্বিৎ পেল সীতা, তাকিয়ে দেখল তার বাঁ পাশের পশ্চিমা ছুঁড়িটার পাতা কাপড়ে কত চাল আর তারটায় সিকি ভাগও নয়। ছুঁড়িটা তখনও তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে—এ মাই, এ দানী মাই, এক মুঠা চাওল দে মাঈ। দান করকে পুন করো মাঈ।

আর ছুঁড়ির সেই সগর্জন উপদেশ শুনে সকলে দানের পুণ্য সঞ্চয় ক'রতে আগ্রহীও হচ্ছে। ফলে উপদেশদাত্রীর ফল প্রাপ্তিটা নেহাৎ মন্দ ঘটছে না। স্নানার্থিনীদের পরোক্ষপুণ্য সেই দানের ফলে কতটা হচ্ছে বোঝবার কোন উপায় নেই তবে উপদেশ দানের পুণ্যফল প্রত্যক্ষ, এবং এই প্রত্যক্ষ ফললাভের উৎসাহ সংক্রামিত হ'ল বুড়ির মধ্যেও। বুড়ি আর্তনাদের স্বরে আবেদন জানাতে লাগল ভিক্ষার জন্যে। সীতা একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে যে একটু আগে ওর সঙ্গে কথা বলছিল এ কথা মনেই হচ্ছে না, গভীর মনো-যোগের সঙ্গে ভিক্ষার আবেদন জানাচ্ছে।

সীতা দু-একবার অমনি আবেদন উচ্চারণ করবার চেষ্টা ক'রল, মনে মনে মহড়া দিল দু একবার তবু মুখ দিয়ে বেরোল না। অমনিভাবে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাতে পারল না সে। স্বরটা তার জিবের কাছে এসে আটকে গেল। এতদিনেও কি তবে লজ্জা দূর হ'ল না? এত ভাবে অনাহারের আগুনে পুড়েও চক্ষুলজ্জার মূর্খামীটা দূর হ'ল না তার? যে আত্মসম্ভ্রম বোধ ভূতের ভয়ের মত আজও লেগে আছে তার সঙ্গে তার উৎস আত্মসম্মান তো অনেক আগেই বিসর্জন দিয়ে পথে নেমেছে আজ তবে অশরীরীর পেছনে লেগে থাকা কেন? মনকে শক্ত ক'রতে চাইল সীতা। এক বৃদ্ধা স্নান ক'রে উঠে আসছেন আর পয়সা দিচ্ছেন, চাল দিচ্ছেন, অনেক দান ক'রছেন। সবাই চেঁচাচ্ছে। বৃদ্ধার সঙ্গে হয়ত ওঁর পরিচারিকাই হবে বড় থলেতে চাল নিয়ে পেছন পেছন আসছে। তিনি কাছাকাছি আসবার আগেই সীতা সোচ্চার হ'ল —মা এদিকে দয়া কর মা।

দয়া এমনিভাবে মন্দ জুটছিল না। সকালে একজন ধনী মাড়োয়ারীর চিড়ে আর গুড়ের দয়া প্রতিদিন বরাদ্দ. দুপুরে নির্ধারিত মা কালীর খিঁচুড়ি ভোগ আর আজ এটা কাল সেটা মিলিয়ে বেশ ভালই কাটছে দিন। রাত্রে ফুটপাথের ওপর এমন শত শত লোক শুয়ে থাকে তাদের সঙ্গে শুয়ে থাকতে অসুবিধা হবারও কারণ নেই কোন। নিরঞ্জনরা স্থান করে নিয়েছে উন্মুক্ত আকাশের তলাতেই তবে রেখাদের খুপরির পাশে। রেখাকে দরজার মুখটাতে শুইয়ে তার এপাশে তার মা বুড়ি শুয়ে থাকে, তার খানিকটা এপাশে শোয় সীতা, মধ্যে ছেলেটাকে রেখে নিরঞ্জন এপাশটায় শুয়ে থাকে। তার এদিকে সারি সারি লোক শুয়ে থাকে—কে কোথায় তার কোন হদিশ থাকে না।

এখানে আসার পর দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। শরীরটাও মোটামুটি ভালই যাচ্ছে নিরঞ্জনের, এত যে অত্যাচার হচ্ছে তবু যন্ত্রণা নেই বলেই সীতা খানিকটা নিশ্চিন্ত। ভেবেছিল এখানে এসে সকালে কোন হাসপাতালে দেখাবে—এখানে কত ভাল ভাল হাসপাতাল আছে তাদের দেশের হাস-পাতালের চেয়ে কত ভাল। কিন্তু এখানে এসে সকালে খাবার তাড়ায় ভিক্ষেয় এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে হাসপাতালে যাওয়াই হয় না। এখানে জেনে নিয়েছে হাসপাতালে যেতে হ'লে নাকি সকাল বেলাতেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অথচ যা কিছু সারাদিনের আয় সে ওই সকাল বেলাতেই, কাজেই যাওয়াও আর হয়ে ওঠে নি। মনেও হয়নি হাসপাতালে যাবার কথা। অকস্মাৎ সেদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল সীতার, দেখল নিরঞ্জন ছটফট ক'রছে, কি হ'ল আবার! সীতা মাথাটা তুলে শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন ক'রল—অমন ক'রতেছ ক্যানে?

শুধু যন্ত্রণার শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না নিরঞ্জন। পেটের মধ্যে সেই পুরোনো যন্ত্রণাটা আজ অকস্মাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শুধু যে মাথা চাড়া দিয়েছে তাই নয় আজ যেন তার বেগ আগের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এই অসহ্য যন্ত্রণায় নিরঞ্জন অস্থির। অথচ তার ওপাশে যে ঘুমন্ত লোকটি শুয়ে আছে তার থেকে ব্যবধান বেশী নয় বলে বেচারী স্বল্প স্থানে গড়াগড়ি না দিতে পেরে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণাতে। ঘুমের ঘোর কাটতে দেরী লাগল না সীতার; ছেলেকে একটু ওদিকে টেনে দিয়ে নিরঞ্জনের কাছে সরে এল। কিন্তু কি ক'রবে ভেবে না পেয়ে তার গায়ে হাত রাখল, জিজ্ঞেস ক'রল—পেটে আবার বেদনা ক'রতেছে ?

নিরঞ্জনের তখন বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত, কে জবাব দেবে সীতার কথার ? সীতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একবার মাথায় একবার গায়ে হাত দিয়ে কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ ক'রতে লাগল। এই ক'দিনে খাওয়া বাদে বোধহয় একটা টাকা সঞ্চয় ক'রতে পেরেছে, কি হবে তা দিয়ে ? এক টাকাতে ডাক্তার দেখানো কি হবে ? তাছাড়া এত রাত্রে ডাক্তার সে পাবেই বা কোথায় ? হাসপাতাল যে আসেপাশে কোথায় আছে সে জানে না। কাজেই কি ক'রবে এত রাত্রে ? দুটো ভাতের জন্যে সারাদিন হা পিত্যেশ ক'রে রাস্তায় বসে থাকতে হ'লে হাসপাতালই বা চিনবে কখন ? অথচ বেচারী যেভাবে কাতরাচ্ছে আর ছটফট ক'রছে তা সহ্য করাও সীতার পক্ষে কষ্টকর। তার মনের মধ্যে মোচড়াচ্ছে—এমন কোন ক্ষমতা যদি থাকত যাতে ওর যন্ত্রণা লাঘব ক'রতে পারত তাহ'লে তার জন্যে প্রাণ দিতে হ'লেও তা ক'রত সীতা। কোন উপায়ের সন্ধান না পেয়ে সীতা মা কালীকে আহ্বান জানাতে লাগল নিরঞ্জনের যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে। মা কালীর স্থানে এসে পড়েছে তারা মা কি তাকে দেখবেন না ? মা কি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন না তার স্বামীকে ? আকুল হয়ে সীতা প্রার্থনা ক'রতে লাগল—হে মা কালী দয়া কর। কি পাপ কোন'দন হ'য়েছে জানি না মা, দয়া কর এই যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর মা। জ্ঞানে তো কোনদিন আমরা কোন পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না মা, অজ্ঞানে যদি ও ক'রে থাকে তবে ক্ষমা কর মা। অনন্যমনে প্রার্থনা ক'রতে লাগল সীতা। আর মনে হ'ল এই যন্ত্রণার কিছুটা সে নিজে নিতে পারলে যদি তার স্বামীর আরাম হয় তবে তাও নিতে পারে সে। তাই হোক, সে যন্ত্রণা সহ্য ক'রবে কিন্তু চোখের সামনে এমন কষ্ট আর দেখতে পারছে না। হে মা কালী তুমি বাঁচাও মা।

বিশ্বাসের জাগ্রত দেবী কালীঘাটের কালীর কাছে প্রার্থনায় বোধকরি সে আদিকালের কল্পনার সাবিত্রীকেও ছাড়িয়ে গেল কিন্তু নিরঞ্জনের যন্ত্রণা কমল

না। ক্রমাগত ছটফট ক'রতে ক'রতে একবার সে ধাক্কা দিয়ে ফেলল পাশের লোকটিকে। এবং যথেষ্ট সন্তর্পণে থাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বারকয়েক ধাক্কা লাগাতে ঘুমন্ত লোকটি যেন ঘুমের ঘোরেই বলে উঠল—একটু আস্তে বাবা।

সীতা লোকটির বক্তব্য বুঝল না মনে ক'রল ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই লজ্জিত হয়ে নিরঞ্জনের দেহটাকে হাত দিয়ে সযত্নে একবার টেনে আনবার চেষ্টা ক'রল তার দিকে। পারল না। পাছে লোকটি অসন্তুষ্ট হয় তাই ভয়ে সিঁটকে গেল। সে চাইল নিরঞ্জন একটু আস্তে শব্দ করুক নইলে যদি আশে পাশের লোকগুলো সব জেগে উঠে বিরক্ত হয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয় তো এই নিশুতি রাত্রে এমন একজন রোগীকে নিয়ে কোথায় যাবে?

যন্ত্রণাটা যেন অসংখ্য মোটা মোটা সূঁচের খোঁচায় বিদ্ধ ক'রছে নিরঞ্জনের দেহের অভ্যন্তর প্রদেশ, সেই সঙ্গে ক্রমাগত বেদনা তার পেটের ভেতরের সব কিছুকে ধরে গামছার জল নিংড়ানো ক'রে যেন নিংড়াচ্ছে। স্থির হওয়া তো দূরের কথা কোন অবস্থাই তাকে একতিল আরাম দিতে পারছে না। কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে চলেছে সে আর এপাশ ওপাশ ক'রছে সেই সঙ্গে। মাঝে মাঝে আবার শুয়ে থাকতে থাকতে উঠে পড়ছে, আছড়ে পড়ছে পরের মুহূর্তে। যখনই আছড়ে পড়ছে সীতা ধরে আটকাবার চেষ্টা ক'রছে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেবার জন্যে।

নিরঞ্জনের দেহের সঙ্গে যন্ত্রণা করছে সীতার মনে। নিরঞ্জনের এই নিদারুণ কষ্টে কিছু না ক'রতে পারার যন্ত্রণা তার মনে প্রতিযন্ত্রণার সঞ্চার ক'রছে। অনন্যোপায় হয়ে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে কাতরে উঠল নিরঞ্জন। অবশেষে কোন কিছু না ক'রেই সে মা কালীকে ডাকতে লাগল যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ঐকান্তিকতা জানিয়ে। নিরঞ্জন সেরে গেলে সে ভিক্ষে ক'রেই মায়ের কাছে পাঁঠা বলি দেবার মানসিক পর্যন্ত ক'রল মন্দিরের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু রাত্রে মা কালীর নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল না বলেই নিরঞ্জনের যন্ত্রণা বিন্দুমাত্র লাঘব হ'ল না, সারা রাতে কিংবা সারাদিন ভক্তদের অপর্যাপ্ত ভোগে তৃপ্তোদরা মা কালীর আর খাদ্যে আসক্তি ছিল না বলেই সীতার আবেদনে কর্ণপাতে প্রবৃত্তি হ'ল না তাঁর। ভোরের দিকে যন্ত্রণাটা কিছু কমতে ক্লান্তিতে নিদ্রিত হয়ে পড়ল নিরঞ্জন। সকালে রেখার ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গতে সীতা দেখল নিরঞ্জন আর মদন তখনও ঘুমোচ্ছে। রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ, রেখা তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হাসছে, হাসছে চোখে মুখে। অকারণেই তার কেমন অস্বস্তি হল। অল্পক্ষণেই সে বুঝল তাকে লজ্জা দেবার জন্যেই যেন হাসছে রেখা। আশ্চর্য হ'ল এই দেখে যে রেখা কোনদিন তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

আজ সে কিনা ঘুম ভাঙ্গাল তার ! শুধু কি তাই ? তাকে বিস্ময়ের আর এক ধাপ উঁচুতে তুলে দিয়ে রেখা বলল—অনেক বেলা হইয়া গেছে দেইখ্যা ডাইক্যা দিলাম।

ভালই কইরেছ ভাই। রেতে তার বেদনাটা অনেক হয়েলো কিনা তাই ভোরকে ঘুইমে পড়েচি—সীতা জানাল।

ব্যাদনা—রেখা অবাক হ'ল, জানতে চাইল—কিসের বেদনা।

পেটে—হাত দিয়ে নিজের পেট দেখিয়ে দিল সীতা বলল—অনেক দিনের পুরানো বেদনা। কত চিকিচ্ছে কইরে হয়রান হয়ে কলকাতায় চিকিচ্ছের জন্তেই তো এয়েচি। তা আমরা তো হলাম গিয়ে গরীব মানুষ তাই এইভাবেই করাতে হবে বলে পড়ে আছি।

রেখার একটু সহানুভূতি হ'ল। সেই সুযোগে এবং সেই সহানুভূতিটুকুর বিনিময়েই সীতা সবিস্তারে যন্ত্রণাটা বর্ণনা ক'রতে চেষ্টা ক'রল। তারপর হঠাৎ তার মনে হ'ল এত বেলা হয়ে গেছে যে সে হয়ত আর জায়গা পাবে না ভিক্ষের বসবার তাই কাউকে না জাগিয়ে টিনের কৌটোটা হাতে নিয়ে উঠে গেল। যা পায় তাই সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে।

একটানা রোগ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তৃতীয়দিন একটু উপশম হতে বিকালে নিরঞ্জনরা ধীরে ধীরে গিয়ে মন্দিরের সামনের বটগাছটার তলায় বসল, হঠাৎ দেখল এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঘষা কাঁচের সরল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল—তোমাকে দেশের মানুষ বলে লাগতেছে যেন ?

তোমার বাড়ী কোথায় ছিল—প্রতিপ্রশ্ন ক'রল নিরঞ্জন।

দীঘির ধার—জবাব দিল বৃদ্ধ।

কোন দীঘির ধার ?

রায়দীঘি গো, জয়নগর চব্বিশ পরগণা। তোমার ?

শিবচন্দ্রপুর।

আমার নাম ভরত থামারু, পরিবার আজ চার বছর হ'ল গত হয়েছেন। ছেলে আর ছেলের বউ নে আছি—নিজের মনেই বৃদ্ধ বলে গেল সোচ্চার স্বগত ভাষণের মত।

নিরঞ্জন ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রল না, তবু বলে চলল—আমি হনু গিয়ে খগেন থামারুর ব্যাটা, বাপের তো হাল বলদ সবই ছেল আমার ভাগ্যে কিছু রইল না তো কি হবে ?

নিরঞ্জন বুঝল এও তার মতো একজন জমচাষী।

ভরত বলে চলল—ক্ষেত করে পেট চলতেছে নাবলেই তো ছেলেটা বউ নে আর বাচ্চাটা নে কলকাতায় চলে এলো। আমি তবু দিন কতক রইলাম তবে মন রইল না দেখে চলে এলাম আমিও।

তোমার ছেলেও কি ভিক্ষে করে—নিরঞ্জন নিস্পৃহ ভাবেই জানতে চাইল যেন কথার পিঠে কথা বলার জন্যেই।

না গো, ভরত বলল, আমার খোকা রাজমিস্তিরির সঙ্গে কাজ করে। যা পায় তাতে ওদের চলে না আমিও যা পাই নে গে দিই। তা বাপু আমি ওই মাগীগুলোর সঙ্গে পারি না। ওরা সব পশচে · গায়ে জোর কত ধাক্কা দে ফেইলে দ্যায় নইলে কোন বাবু দিতে এলে কেড়ে নেয়। আমি বাপু বুড়ো মানুষ এই বসে বসে যা পাই নে যাই।

থাক কোথায় ?—এবার নিরঞ্জন কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হ'ল।

ওই টালিগঞ্জ রেলপোলের ওপারের বস্তিতে ওখানেই ঘর ভাড়া নেছে আমার খোকা। সাতটাকা ভাড়া।

নিরঞ্জন আর কথা বলল না। কথা শুনতেও অনিচ্ছার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। বৃদ্ধ তবু স্বগতোক্তির মত বলে যেতে লাগল—ছেলেই বা কি ক'রবে অজন্মা হ'লে সে বছর কাজ পাবে না তো খাবে কি ? ফসলের বছরে যা রোজগার ক'রবে কোন ভাবে খেয়ে দেয়ে বাঁচবে। কাজ না থাকলে হাল বলদ বিক্রী না ক'রে কি খাবে ? হাল বলদ না থাকলে কার জমিতে চাষ ক'রবে, কেমন ক'রে ক'রবে ?

মন ছিল না নিরঞ্জনের তবু শুনল। কথাগুলো তার কানে গেল বলেই ভাবল, সেই একই ইতিহাস। এমনি ক'রে কত লোকই আসছে। কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে। তাদের গ্রামেরই ষষ্ঠী কোটালকে মনে আছে। হঠাৎ একদিন বউ ছেলেমেয়ে রেখে লোকটা উধাও হয়ে গেল আর ফিরল না। একটা মেয়ে না খেতে পেয়ে মরার পর ষষ্ঠীর বউও সেই যে দুটো ছেলেমেয়ের হাত ধরে গ্রাম ছাড়ল তারপর কোথায় গেল কেউ জানে না। ষষ্ঠী কোটাল দিনের পর দিন যখন উপোষ করেছে কেউ একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে নি, সে যখন অক্ষমতার জ্বালা সইতে না পেরে পালিয়ে গেল তখনও কেউ তার অনাথা বউটির দিকে একটুকরো সাহায্য এগিয়ে দিল না কেবল মুখে ষষ্ঠীর নিন্দা ক'রে আত্মতুষ্টি ঘটাল। আর সেই কটূক্তিগুলো ষষ্ঠীর বউ-এর মনে আদৌ কোন সান্ত্বনা সিঞ্চিত ক'রল না।

এমনিভাবে কত লোকই না ঘর ছাড়ছে, নিরঞ্জন ভাবল। ভরত থামাক অনর্গল কথা বলে চলেছে, নানা কথা। দেশে নতুন আইন পাশ হ'ল জমিদারী উচ্ছেদ হ'ল সকলে বলল এইবার তারা সব জমি পাবে যাদের জমি নেই।

বাবুদের জমি নিয়ে নিয়ে তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। সবাই আশা ক'রল জমি পাব, এবার আর প্রাণ দিয়ে খেটে ফসল ফলিয়ে তুলে দিয়ে আসতে হবে না অন্যের খোলায়। যা হবে নিজেরই হবে। গ্রামে গ্রামে খবর হ'ল নতুন সব সরকারী অফিস বসছে টাকা ধার দেবার, বীজ দেবার জন্যে। জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে আরও কত···। যত ভাগ চাষী আর ক্ষেতমজুর সেই নতুন দিনের প্রতীক্ষায় রইল কিন্তু সেই প্রতীক্ষার কালের আর শেষ হ'ল না। নতুন দিনের সূর্যোদয় ঘটল না আর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও, বাবুদের যে সব জমি তারা ভাগে ক'রত সে সব জমি বাবুদেরই আছে বরং লাভের মধ্যে হ'ল এই যে আগে বাবুরা যত জমি ভাগে দিত এখন তা না দিয়ে লাঙ্গল কিনে চাষ করতে লাগল। অনেক গ্রামে নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে নতুন নতুন লোক এসে সরকারের অনেক দপ্তরই গড়ে তুলল বটে শোনা গেল সরকার টাকা ধারও দিতে লেগেছে তবে যার জমি আছে তাকেই দিচ্ছে। সর্বহারা মানুষ ধীরে ধীরে শেষ বিশ্বাস খুইয়ে এমনি ভাবেই পথে এসে নামল যেমন পুরুষানুক্রমিক চাষী ভরত থামারু আর তার ছেলে এসে নেমেছে।

আরও কত যাবে, নিরঞ্জন ভাবল, জমি যাদের নেই তাদের সকলকেই একে একে এসে দাঁড়াতে হবে এই রাস্তায়। ধীরে ধীরে সব নেমে যাবে পথে। কেউ আজ নামছে, কেউ নামবে কাল। ভাঙছে এবং সবাই ভাঙবে। কোন কিছুই এই ভাঙ্গনকে আটকাকে পারবে না। যার লাঙ্গল, বলদ, জমি তিনটেই আছে সেই কেবল মাত্র টিকবে, ক্ষেতমজুর টিকবে না। এক বছর অজন্মা হলে ক্ষেতমজুর খেতে পায় না তাহ'লে সে কেমন করে টিকবে? একদিন এই ভরত থামারু আর নিরঞ্জনেই পথ ভরে যাবে।

সম্মুখে একখানা কাপড় বিছিয়ে বসেছিল নিরঞ্জন, চেয়ে দেখল সামান্য কয়েকটা পয়সা পড়েছে তাতে। সূর্যের আলোটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে, আকাশে মন্দিরের ওপিঠে সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে বাড়ীঘরগুলোর আড়ালে, ক্লান্ত বোধ ক'রল ভাবল উঠে যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে আবার ভাবল এসময় তো অনেক পুণ্যার্থী মন্দিরে আসতে শুরু করে দুচারটে পয়সা পাওয়া যায় কাজেই এই সময়টা থাকাই দরকার। দো টানায় পড়ল সে। অকস্মাৎ শুনল পাশেরবৃদ্ধটি বলছে—রাতে চোখে দেখি না বাবা। দিনে দিনে না গেলে আর ঘর ফিরতে পারি নে। যেদিন ফিরতি না পারি এইখানেই শুয়ে থাকি এক ঠাঁই।

এখনই কি ঘরকে ফিরে যাবে?—নিরঞ্জন অকারণেই জানতে চাইল।

আজই এয়েচি। আজ যাব না আর।

কিন্তু নিরঞ্জন উঠে পড়ল। বৃদ্ধ বসে বসে দেখল নিরঞ্জন চলে যাচ্ছে। অন্য সময় পাশের লোক উঠে গেলে খুশীই হয় সে এবার হ'ল না। তার ইচ্ছা

বস নিরঞ্জন উঠে যাক তবু বাধা দেবার বদলে চুপচাপ দেখতে হ'ল তাকে ; মনের মধ্যে বেশ একটু শূন্যতা ঘূর্ণিবাতাসের মত ঘুরে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখল এতক্ষণ একজন মানুষ বসে তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল সে স্থান শূন্য।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিরঞ্জনের। গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সে শুয়ে শুয়েই অজানার দিকে চেয়ে বৃষ্টির ভবিষ্যৎ বোঝবার চেষ্টা ক'রল। প্রবল মেঘভারে রাতের আকাশ ভয়ংকরবর্ণ। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সীতা তখন উঠছে। ওদিকে রেখা আর তার মা উঠে পড়ে কি সব জিনিষপত্র তাদের চালার মধ্যে গুছোচ্ছে। আশেপাশের সব লোকই উঠে দৌড়োচ্ছে মেয়েদের ঘাটের দিকে। সেখানে মাথার ওপর আচ্ছাদন আছে। লক্ষ্যস্থল ধর্মশালা। নিরঞ্জন উঠে পড়ল, সীতাও ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে তুলে নিয়ে আশ্রয়স্থল খুঁজতে তৎপর হ'ল। নিজেদের জিনিষপত্তরগুলো গুছিয়ে নিতে গিয়ে নিরঞ্জন লক্ষ ক'রল তার পাশে প্রায় দেহসংলগ্ন হয়ে কে এক জন একটি বস্তা পেতে শুয়ে আছে ওঠে নি। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, আপনি উঠবে ভেবে তাকে না ডেকেই সীতার সঙ্গে স্নান ঘাটের দিকে রওনা হ'ল।

স্নান ঘাটে জায়গা নেই। অনেক কালো কালো প্রেত সদৃশ দেহ সেখানে সারি সারি নিদ্রিত। আরও দু-একজন আশ্রয়প্রার্থী ফিরে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই তবে অন্য আশ্রয় আছে—সীতা আর নিরঞ্জনও তাদের পিছু নিল।

এই বাড়ীটার দরজা অন্যদিন বন্ধ থাকতে দেখেছে সীতা। আজ এই রাতে কেমন করে খুলল কে জানে। আর দু-একজনের পেছন পেছন নিরঞ্জন সীতাও ঢুকে পড়ল একটা অন্ধকার আচ্ছাদনের তলায়। বেশ বড় সড় বাড়ীর লম্বা চওড়া বারান্দা, অনেকেই বসে আছে সেখানে, বৃষ্টির তীব্র ধারা থেকে আত্মরক্ষা ক'রছে। অনেক লোককে ডিঙিয়ে টপকিয়ে এক কোণে স্থান করে নিল নিরঞ্জনরা। সীতা ছেলেকে কোনক্রমে আধোশোয়া করে শুইয়ে দিল। তারপর নিরঞ্জনকে জিজ্ঞেস ক'রল, ইটা কি বটে ?

বাড়ীটা তো নিরঞ্জন অনেকবার দেখেছে কিন্তু এটা যে কি তা সে নিজেও জানে না। প্রয়োজন হয়নি বলেই জানতে চায়নি, এছাড়া কলকাতা শহরে এসে বুঝেছে এখানে যতকিছু আছে সব জানা যায় না। কাজেই সে জবাব দিল, সিটা ত জানি না।

. পাশের লোকটি বসে বসে ঢুলছিল, হঠাৎ সীতার দেহের ওপর পড়েও সামলে নিল। কাপড় দিয়ে লোকটার মাথা মুখ এমনভাবে ঢাকা যে পুরুষ কি না নারী তা বোঝা যায় না। দূরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না আসে পাশে দেখতে চেষ্টা ক'রল সীতা, যারা দেয়ালের কাছে বসতে পেয়েছে কোনক্রমে দেয়ালে-

ঠেসান দিয়ে ঘুমোচ্ছে বসে, বাদবাকি প্রায় সকলেই হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ সীতার কানে এল দূরের অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দে কাকে মৃদু ভৎর্সনা ক'রল। সীতা চোখ মেলল অন্ধকারে। চোখ বন্ধ ক'রল।

ভোরের দিকে সীতার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার এখনও কাটেনি। একজন লোক বেশ জোরে জোরে রামনাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে তেল মাখছে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে। সীতা উঠে পড়ল। পথের ধারের পথিক-জনের প্রস্রাবাগারে প্রাতঃকৃত্য করার এই হ'ল চূড়ান্ত সময়। এরপর মদ্দগুলো উঠতে শুরু করলে যাওয়া মুস্কিল হবে। যে লোকটা তেল মাখছিল তার কাছ দিয়ে যেতে যেতে সন্তর্পণে দেখল অতি হৃষ্টপুষ্ট চেহারা লোকটির। দুর্গাপুজোয় মাটির তৈরী অসুরের মত দেহ। তেল না মাখলেও বোধহয় এমনই চকচক করে, পাতলা অন্ধকারেও সেটা বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল।

সকাল বেলায় ভিক্ষেয় বেরোনোতে আর নিজেদের ডেরায় আসে নি সীতা। দুপুরে আসতে রেখা জিজ্ঞেস ক'রল, কাল রাইতে বৃষ্টির সময় কই ছিলা?

হোথা—আঙুল দিয়ে অদূরের বাড়ীটা দেখিয়ে দিল সীতা।

ওইটাতো যাত্রী নিবাস। বাঘের বাসা—রেখা বলল।

সীতা বাঘের বাসার অর্থ বুঝল না। প্রশ্ন ক'রল, বাঘেরবাসা আবার কি?

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল রেখা। নব যৌবনের চটুলতা প্রকাশ ক'রে বলল, ট্যার পাও নাই? রাইতে বাঘ আসে নাই বুঝি? আইবো এই বাঘ চিবাইয়া খাইবো না, চটকাইয়া খাইবো, বলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন গড়িয়ে পড়ল। সীতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার চাউনি দেখে হাসি থামার পরও এক দমক হেসে নিল মেয়েটা, বলল, অমন কইয়া চাইয়া আছ ক্যান? অখন আর বুইঝ্যা কাম নাই, ত্থাখলেই বুঝবা। এইখানে এমুন বাঘ অনেক আছে। তবে কি জান—থাইক কি হইব জাইন্তা।

কি বলতেছ সব—সীতা এতক্ষণে কথা বলল।

অনেকদিন একসঙ্গে থাকার ফলে কিছুটা সখীত্ব এসে গেছে সীতার সঙ্গে, তাই মাঝে মাঝে রঙ তামাসা করে রেখা, বলল, শুনবা? ওই যে দারোয়ানটা আছে না? করবো কি মাঝ রাইতে উইঠ্যা যারে পছন্দ হইব তাইকা লইয়া যাইব নিজের ঘরে। কেও না গ্যালে হুগলটিরে তারাইয়া দিবো। লক্ষী তো প্রায়ই যায়, আজকাল ইচ্ছা কইরাই যায়। মাইয়াটা বোকা। নইলে যাইবো ক্যান? ওই পানওয়ালা বা ওই হোটেলওয়ালাও তাইকা লয়, তবে তারা খাইতে দেয় আর ওই দ্বারোয়ান ব্যাটা এমন বদমাস শুধাগুধুই বদমাসী করে। কিছু দেয় না। রেখা

থামল, অল্পক্ষণ বিরতির পর আবার বলতে লাগল—ওই পানওয়ালাই লক্ষ্মীরে পরথম ডাইক্যা লয়। সক্কলেই জানে, কত পয়সা দিত, কিন্তু আর লইলো না।

সীতা এই রহস্যপুরীর রোমাঞ্চকর সংবাদে হতবাক হয়ে গেল, সে এত বিস্মিত হ'য়ে পড়ল যে তার চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছিল না।

রেখা তাকে প্রশ্ন ক'রল, কাইল সেই ব্যাটাটা বিচরায় নাই ?

কি করে নি ?—রেখার ভাষা বুঝতে না পেরে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল সীতা।

খোঁজে নাই ? কমলার কাছে শুনছি বৃষ্টির রাইতে ভিখারীরা শুইতে গেলে ব্যাটা আইয়া হগ্‌গলটির মুখে বাত্তি ফালাইয়া বিচরায় কারে ডাইক্যা নিবো।

কই কাল তো দেখিনি সেরকম।

কাইল আইলে তোমার—বুকের দিকে হাতের পাঞ্জায় আর চোখের ইসারায় অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে দেখিয়ে দিয়ে রেখা বলল, শ্যাষ কইরা ফালাইতো।

রেখার কথা সীতার অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাল। সে একটু অসন্তুষ্টি প্রকাশ ক'রে বলল,এ তুমি কি বলতেছ ?

রেখা ভাবল সীতা বুঝি তার কথা বিশ্বাস ক'রছে না তাই সে বলল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজেই একদিন যাইয়া দেখতে পার। অর কথাই বা খালি কই ক্যান ওই যে বাদামবেচোইগ্গা ছ্যামড়া, হেও কি কম যায় ?

কালকের সেই কাগজ কুড়ানো ছোকরা পিঠে তার বস্তাটা নিয়ে এসে দাঁড়াল। অনেকদিন আগে নেড়া হবার পর সমানভাবে বর্ধিত অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলগুলো মাথার চারদিকে ঝালরের মত নেমে পড়েছে, মুখমণ্ডলে ময়লায় কালো কালো ছাপ জমে গেছে, দাঁতে ছাতা হলুদ এবং গায়ে একটা ছেঁড়া কালো রঙের গেঞ্জী। এই বিচিত্র রূপে এসেই সে দাঁড়াল রেখার দিকে মুখ ক'রে। একটা চোখ বন্ধ ক'রে নিমেষের মধ্যে একটা সংকেত ক'রে সকলকে জিজ্ঞেস ক'রল, মচ্ছবের নেমতন্ন লেবে ? তবে ওইখানে যাও টিকিস দিচ্ছে।—পেছন দিকে ভিড়ের মধ্যে আঙুল দেখাল।

কাল বিলম্ব না ক'রে রেখা দৌড়াল সেই দিকে। তার যুবতী শরীরে তরঙ্গরাশি উদ্বেল হয়ে উঠল। সেইদিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল কাগজ কুড়ানো ছেলেটি। তার দুই চোখের দৃষ্টিতে কোন বিদ্যুতের ছায়া যেন প্রতিবিম্বিত হ'ল সেই মুহূর্তে। তার চোখের মণিবলয়ের অকস্মাৎ ঔজ্জ্বল্যের দিকে দৃষ্টি গেল না কারও, নিঃশব্দে সে হাসতে লাগল একা। নিঃশব্দ পুলকে যেন সমুদ্রের ঢেউ গুণতে লাগল সে অবগাহন প্রয়াসে।

রবার স্ট্যাম্প মারা একটা কাগজ হাতে ফিরে এসে কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে প্রথমেই সেটাকে ঝুপড়ির মধ্যে রেখে দিল রেখা তারপর বাইরে এসে সীতাকে প্রশ্ন ক'রল, তুমি আনলা না ক্যান্ ?

কি আনতে ছুটলে—জানতে চাইল সীতা।

একজন লুক ভিখারী খাওয়াইবো হেইয়ার টিকিট দিয়া গেল।

কোথাকে খাওয়া হবে ?

তা শুনি নাই। টিকিট নিয়া আইলাম অখন মায় বুঝবো।

সীতা সকলের দৌড়াদৌড়ির কারণটা বোঝেনি। এতক্ষণে বুঝতে তার মনে হ'ল একটা টিকিট জোগাড় ক'রে নিয়ে এলে ভালোই হ'ত। তার রাগ হ'ল নিরঞ্জনের ওপরে শুধু ঘুমোবে লোকটা, ঘুম পেলে আর কিছু চাইবে না। এতক্ষণ জেগে থাকলে তো এমন মচ্ছবের টিকিট নিয়ে আসতে পারত। সবাই জোগাড় ক'রল আর তারাই কিনা পেল না একটাও—। এক কড়ার মুরোদ নেই খালি চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে থাকা আর ঘুম—সীতা মনে মনে গর্জে উঠল।

হঠাৎ রেখা খিল খিল ক'রে হেসে উঠতেই সীতা তার দিকে চাইল। রেখা বলল, ছ্যামড়া কেমুন চাইয়া রইছে ছাখ। কাগজ কুড়ানো ছোকরার দিকে ইঙ্গিত ক'রল রেখা। অসাবধানতার জন্যে সীতার ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে একটি স্তন দৃশ্যমান হয়ে পড়েছিল ছোকরাটির স্থিরদৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ। সীতার নজরে আসতেই সে একটি কটু মন্তব্য ক'রে কাপড়টাকে ভাল ক'রে টেনে দিল গায়ে। তাতে ছোকরার দৃষ্টির ভাব বদলালো না, একই ভাবে সে এবার সীতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাতে রেখা যেন আরও মজা পেয়ে গেল। তার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না। আর ওই হাসির শব্দেই ছেলেটির দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রেখার মুখে। সে-ও অদ্ভুৎ নিঃশব্দে তার দাঁতের সারিবের ক'রে হাসতে লাগল। সীতা আগেকার দিন হ'লে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ত কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তার সেই গ্রামীণ মনোভাব নেই বলেই তেমন লজ্জা হ'ল না। তবু তার বেশ অস্বস্তি লাগল ছোকরাটির নির্বোধ দৃষ্টির মধ্যে থাকতে। অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ ক'রল, মরগে ড্যাকরা মড়া।

তার কটুভাষণ রেখার কান পর্যন্তই পৌঁছাল না। রেখা যেন নিজের মনেই বলল, পোলার হাউস ছাখ।

রেখা কি দেখতে বলল সীতা তা বুঝল না। রেখার দিকে তাকিয়ে সে বলল, মিনষেটা অমন তাইক্যে মরতেছে ক্যান ?

তোমারে ভাল লাগছে। চোখে লাগছে তোমারে।

মুয়ে আগুন অমন চোখে লাগার। মুখ পোড়া !

তুমি ভয় পাইও না। বতুটায় খালি চাইয়া চাইয়া দেখবো। তোমার উপরে চইড়া বইবো না।

ওর কথায় আশ্বস্ত হ'তে পারল না সীতা। ছোঁড়াটা যেভাবে দেখছে তাতে

মনে মনে যে কিছু একটা প্যাচ কষছে না তা কে বলতে পারে? এদের বিশ্বাস কি? কখন সুযোগ বুঝে যে কি ক'রে বসবে কে জানে?

রেখা একে বেশ ভাল ক'রেই জানে। সে জোর দিয়েই বলল—অ'র কিছু করণের ক্ষমতা নাই দেইখ্যা চাইয়া চাইয়া ছ্যাখে। ক্ষমতা থাকলে কবে আইয়া কাম সাইরা লইতো না—?

তবু সীতা অকারণেই কাপড়টা টেনে গা ঢাকবার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু শাড়ীটার এমনই অবস্থা যে একদিকে টানলে শরীরের অন্য দিকগুলো খুলে পড়ছে, ফলে শরীরের বেশী অংশই অনাবৃত থেকে যাচ্ছে ব'লে সামনের দিকটাকে কোন রকমে ঢেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে লজ্জা থেকে বাঁচতে চাইল।

হঠাৎ রেখার নজর পড়ল ছোকরাটি কি যেন দেখে বস্তুটা তুলে নিয়েই দৌড়ল পুবে বড় রাস্তার দিকে। আর শুনল অন্যদিক থেকে সমানে খিস্তি ভেসে আসছে—আবাগীর ব্যাটা, বেজন্মার বাচ্চা—! দেখল শত্রুশূন্য অঙ্গনে রণংদেহী মূর্তিতে বিশুর মা-র আকস্মিক আবির্ভাব। চিমড়ে শরীরে বিশুর মার যত শক্তি আছে সবটুকু দিয়ে সে চ্যাচাচ্ছে। আর তার ডান হাতের ভাঁড়টা থেকে রসের মত কি যেন টপ টপ ক'রে ঝরছে। গিঁট দিয়ে দিয়ে জুড়ে রাখা একটা ধুতির ওপরের অংশ দড়ির মত পাকিয়ে বুকের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে ফলে প্রায় শুকনো দুটো স্তন ঝুলছে, দুলছে। মুখের ওপর শতেক রেখার সৃষ্টি ক'রেছে কুঞ্চিৎ চামড়ার সমাবেশ। মাথার চুল জট পাকিয়ে ওঠবার উপক্রম। কোমরের নিচের অংশে বোঝা যাচ্ছে শতচ্ছিন্ন ধুতির নিচে আরও একটা গামছার মত কিছু জড়ানো আছে। রেখাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশুর মা। রেখার দিকে তাকিয়েই উঁচু গলায় বলল, কাল ওই বেজন্মার বাচ্চা আমার একটা টাকা নিয়ে পালিয়েছে। খানকীর বাচ্চাকে আর ধরতেই পাচ্ছি না। একবার পেলে ওর—যা ক'রবে বলে সে ঘোষণা ক'রল তা যেমন অশ্রাব্য তেমনি অসম্ভব।

রেখা জানতে চাইল, তোমার টাকা লইয়া কেমনে পালাইলো?

রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম আমার আঁচলে টাকাটা বাঁধা ছিল। ও-ই শুয়েছিল আমার ওদিকটায়। সকালে উঠে দেখি আমার আঁচলে টাকাটা নেই আর ওই মুখ পোড়াও নেই। দাঁড়াও না ধরি ওকে একবার, তারপর ওর মুখ যদি না কাঁচা গুয়ে ঘসটে দিয়েছি তো আমার নাম শান্তিই নয়।

বড় বদমাস তো! সীতা মন্তব্য ক'রল। বিশুর মা তাতে উৎসাহিত হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—বদমাইস! বদমাইসের বাচ্চা। ওই মা খেকোর বাপ চোদ্দ পুরুষ যে যেখানে আছে বদমাইস।

এইখানে আইস্যা আবার আড্ডা গড়তেছিল, রেখা উস্কে দিল বিশুর মাকে।

খবরদার আসতে দিয়ো না, ও চোর। আমার টাকা নেবার আগে একবার এক অন্ধ ভিক্ষে ক'রছিল তার পয়সা চুরি ক'রেছিল।

অন্ধ মানুষটার পয়সা নিয়ে নিলে! ধর্মে সইলো?—সীতা এ অন্যায় যেন কল্পনাই ক'রতে পারে না।

চোর যে হয় তার আবার ধম্মোবুদ্ধি থাকে? তবে একথাও ফেলবার নয় যে ওপরে ভগমান আচে। বিচার একদিন হবেই, বলে রাগ সামলাতে না পেরে বুড়ি মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে বলল, মুখে খ্যাংড়া দিয়ে পালিশ করে দেবে না!

সীতার জানা ছিল না যে ভগবান ঝাঁটা মেরে কোন দুষ্কৃতকারীর মুখ পালিশ ক'রে থাকেন। ছোটবেলায় ভগবানের যে সব গল্প সে শুনেছিল তাতে দেবতাদের বহুবিধ বীরত্ব ও পাপী দমনের উল্লেখ আছে কিন্তু ঝাঁটা মেরে পালিশ করার সংবাদ সে কোথাও শোনে নি। গঙ্গাধারের মন্দিরে শীতলা ঠাকুরের হাতে ঝাঁটার মত একটা কিছু আন্দাজে দেখেছে বটে, তবে শীতলার কথা'র কোথাও সে ঝাঁটা মেরে পাপের প্রতিবিধানের কাহিনী শোনে নি। তাই সে চিন্তিত হ'ল। রেখাকে হাসতে দেখে বিশুর-মা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে জানতে চাইল—হাসছিস কেন লা?

রেখা দুর্যোগের ভয়ে বলল, না, কইতাছি কি ভগবান যখন আছেনই বিচার তখন হইবোই। তুমি অরে না পাইলে খামোখা রাইগা কি করবা কও?

না পেলে মানে? যেখানে থাক ওকে খুঁজে বের করব তবে আমার নাম শান্তি। ও যদি মায়ের পেটে গিয়েও সেঁদোয় পেট খসিয়ে ওকে টেনে আনব।

তা তুমি পার। রেখা বলল, প্রশ্ন ক'রল, কয়বার তুমি নিজের করছ?

আ মলো যা। মুখপুড়ির কথা শোন না—ঠিক রাগ নয় রাগ রাগ ভঙ্গীতে শান্তি বলল। রেখা শান্তির মনোভাব বুঝতে পেরে আবদারের স্বরে বলল, কও না ক্যান। আমারে কইলে কি হইব? কও না ক্যান মাসী কয়বার?

তা আমি কি বাপু নিকে পড়ে রেখেচি! মুখপোড়া মদ্দগুলোর জ্বালায় আর করি কি বল? সব লক্ষীছাড়া হয়েছে গা—একটু রুচি ঘেন্না পর্যন্ত নেই! ওই ট্যাপা চাওয়ালা কাল রাতভোর ওই নতুন পাগলিটাকে নিয়ে পড়েছিল। ভোরে পাগলীটার অবস্থা দেখে গা রি রি ক'রে উঠল। কেমন হতচ্ছাড়া মিনসে বল, লক্ষী কি সবির সঙ্গে করিস কর, তা বলে পাগলী ধরে!

রেখা খুব উৎসুকভাবে শুনতে লাগল। তার দুই চোখে কৌতূহল হাজার পাওয়ারের বাতির মত জ্বলছে। সেদিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন শান্তির ছিল না, এমনিতেই সে বলে চলল, পাগলীটাকে দু এক কাপ চা দিয়েই চলবে কিনা, তাই। এদের আর কতই দিতিস বাবা? কোনদিন একবেলার খাবার নয়ত একটা আধুলি। পয়সাটাই এত বড় হ'ল?—আপন মনেই বকে চলল শান্তি।

রেখার সঙ্গে থেকে এই কিছুদিনে সীতা অনেক কিছুই জেনে গিয়েছিল নইলে বিশুর মার কথা হয়ত সে বুঝতেই পারত না। বিশুর মার কথাগুলো সে রেখার কথার সঙ্গে মিলিয়ে রেখার কথার সত্য যাচাই ক'রে নিতে পারছিল।

গভীর রাত্রে গুমোট গরমে ঘুম ভেঙ্গে গেল সীতার। শরীর ভিজে সপ সপ ক'রছে. গলার ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে যাবার অনুভূতি জাগিয়ে ঘাম পড়ছে গড়িয়ে। উঠে বসল সীতা, একটুও বাতাস নেই। রাতের অন্ধকারে পৃথিবীটাকে দম বন্ধ হয়ে মরা কোন প্রাণীর মড়ার মত মনে হচ্ছে। ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখল তার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকা মদন অনেকটা সরে গেছে তার বাবার দিকে আর নিরঞ্জনও বুঝি প্যাচপেচে গরমে ছেলের দেহের ছোঁওয়া বাঁচানোর জন্যেই ছেলের থেকে দূরত্ব রাখতে নিজেও গেছে সরে। হাই তুলল সীতা। ইস্ এইরকম গরমে কি ক'রে ঘুমানো যায়। রাতের নির্জনতার জন্যে গায়ের কাপড় খুলে তাই দিয়েই ঘাম মুছল। মনে হ'ল জল তেষ্টায় বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু জল তো নেই। পাত্র নেই বলে জল রাখতে পারে নি। অথচ অত্যধিক গরমে বুকের মধ্যেকার শুকনো ভাবটা গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। সীতা দাঁড়াল। একটু হাঁটলে ওই উত্তরমুখো রাস্তার মোড়ে একটা জল ট্যাংক আছে। তাতে দিনরাত জল থাকে। সে পা বাড়াল।

জল ট্যাংকের কলটা টিপে ধরল সীতা, জল পড়ল না। নাঃ জল নেই। ঘুমের ঘোরে মনে পড়েনি এখন মনে এল এটা তো কিছুদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে, জল পড়ছে না। শুকনো কল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হঠাৎ শুনল—এই! চমকে উঠল। গভীর রাতে কে ডাকছে তাকে? তাকেই নাকি? ভয় পেয়ে গেল সীতা, গা ছম ছম ক'রতে লাগল। বুকের মধ্যে ধুক ধুক শব্দ খুব জোর হ'তে লাগল। হয়ত রাতের অন্ধকারে গ্রামের অতিলৌকিক অশরীরী প্রাণগুলোর অস্তিত্বেরা এতদূর পর্যন্ত এসেছে তার সঙ্গে! দুরু দুরু বুকে চারদিকে তাকাল সে। ফুটপাথে শুয়ে ঘুমোচ্ছে সব শবের মত। মত কেন শবই তো। কলকাতার গাড়ীতে চলা মানুষগুলোর কাছে এগুলো শবছাড়া আর কি। সে তো নিজেও একটি শবমাত্র। কিন্তু শবগুলো নড়ে—সে লক্ষ করল সারি সারি নিদ্রিতের মধ্যে একটি নড়া চড়া করছে। তাকাল। ছি ছি। আর দেখল না। 'এই'—আবার শব্দ। শবগুলো শব্দও করে! শব্দের উৎস দেখল সীতা—যে দেহটি নড়ছে তারই কিছুটা দূরে, শুয়ে কে একটা ইশারা ক'রে তাকেই ডাকছে। সীতা তাকাতেই আঙুলের সংকেতে দেখিয়ে দিল সেই বিশেষভাবে নড়তে থাকা দেহটিকে। দেখিয়েই ফের নিজের কাছে ডাকতে লাগল হাতের ইশারায়। তার মুখের হাসিটা দেখতে পেয়ে সীতা সেই অন্ধকারেও চিনল সেই কাগজ কুড়ানো ছোকরা, চোরটা। কি বোকার মত অদ্ভুতভাবে হাসছে। সীতা

বুঝল অশ্লীল ইঙ্গিতে ছোকরাটি বাঘয়। ইতিমধ্যেই তার জল তেষ্টা উবে গিয়েছিল। আতঙ্ক কিছু কমল। তবু সে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে, দ্রুতপায়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। নিরঞ্জন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকার শব্দে রাগ হ'ল সীতার। কেন এমন নিশ্চিন্ত অঘোরে ঘুমোচ্ছে লোকটা! সীতা যেন সহ্য করতে পারছিল না। নিজের শোবার জায়গাটায় বসল সীতা, তাকিয়ে দেখতে লাগল নিরঞ্জনকে। তার যে ভীষণ রাগ হচ্ছে সে নিজেও তা উপলব্ধি ক'রতে পারছিল বলেই চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল। তবে শুয়ে কিছুতেই ঘুম এল না তার। একবার এপাশ ওপাশ করবার চেষ্টা ক'রে দেখল কোমরের হাড়ে বড় লাগছে। চুপচাপ পড়ে রইল। তার ইচ্ছে হ'ল শরীরের ভেতর থেকে খামচে হৃৎপিণ্ডটাকে বের ক'রে এনে রাস্তার আলোয় মেলে দেখে তার উত্তেজনার রূপ, অথবা বুকের মধ্যেকার একটি পাগলা ঘোড়ার উদ্দামতাকে সে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে শান্তি পায়।

আগেকার দিনে লোকের কত ভক্তি যে ছ্যালো তা তোমায় কি বলব—শনের মত চুল হলুদ দাঁত হাড়ের বুড়িটা বিকাল বেলার নিভন্ত আলোয় বসে অতীতের কথা শোনাচ্ছিল। চার-পাঁচটা শাড়ী আর ধুতির অংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জোড়া দিয়ে তৈরী করা কাপড় পরণে, মাথার চুলগুলো সবই সাদা কিন্তু ছোট ক'রে ছাঁটা, দুই গালের গর্তে চামড়া ঢুকে গেছে, ময়লার আস্তরণে আর রোদে গায়ের রঙ পোড়া কালো। তার চেয়ে বিবর্ণ দুই চোখ ঘুরিয়ে বুড়ি বলল, সে কালে যত লোক গঙ্গায় চ্যান ক'রতে আসত কেউ শুধু হাতে আসত না। পেত্যেকেই কিছু না কিছু দিত। অমন কত ভিখিরী থাকত কাউকে না দিয়ে যেত না তারা। ধম্মো ভয় ছ্যালো কিনা—।

তন্ময় হ'য়ে অতীতের কথা শুনছিল সীতা। শুনছিল আগেকার দিনের মানুষগুলোর মনের ঔদার্যের কথা, তাদের দানের কথা। সকলে পুঁটলি বেঁধে চাল নিয়ে আসত স্নানে আসবার সময়, তখন তামার পয়সার চল ছিল, পিতলের ডবল পয়সা নিয়ে আসত দেবার জন্যে। ভাল মন্দ বিচার করত না, কে অন্ধ কে চক্ষুষ্মান কিছুই বিবেচনা কেউ ক'রত না। দান করাটা স্নান করার একটা অঙ্গ মনে করত তারা। স্নান ক'রতে এসে কিছু না দিয়ে যেত এমন লোক বড়ই কম ছিল সংখ্যায়। ছিল না বললেই চলে। আর এখন অবস্থা হয়েছে বিপরীত। এখন চাল তো কোন লোক দেয়ই না; পয়সা একটা ছুঁড়ে দেয় তাও বোধহয় দশজনে একজন। কোন স্নানযোগ বা পুজো-পার্বনের দিন থাকলে তবেই দু-একটা পয়সার মুখ দেখা যায়। তাও তো আজকাল কড়ে আঙুলের আগার মত ছোট্ট পয়সা বেরিয়েছে যার একটা দুটোর দাম সেকালের তুলনায় একটা কানাকড়িও নয়।

বুড়ির কথা শুনে সীতার মনে হ'ল সে বুঝি জন্ম অবধিই ভিক্ষে ক'রছে। কৌতূহল হ'য়ে জানতে চাইল, হ্যাঁ গো মা, তুমি কতদিন এইখানে এসেচো ?

তা বাছা অনেক বছর হবে—বুড়ি জানাল, আরও বলল—সেই যেবার কলকাতা শহরে খুব ওলাউটো হয়ে ছ্যালো—সেইবার আমাকে বাড়ীউলী মাগী বার ক'রে ছায়। সে এক কালের কত মা, সে কি আজ! এই এখন আমার তিন কুড়ি বয়েস হ'তে চলল তখন ছ্যালো সবে এক কুড়ির কিছু বেশী। সোয়ামীর সাথে ঘর করতুম, আর একটা মাগীর খপ্পরে পড়ে আমার বে'র ছ বছর পর সোয়ামী আমাকে একটা বাচ্চা শুদ্ধ, ফেলে রেখে সেই যে কোতায় পালালে আজ অব্দি তার আর কোন হদিশ ক'রতে পারলুম না। কোতাইবা খোঁজ ক'রব আমি মেয়ে মানুষ! একা একা সেই ঘরে পড়ে রইলুম মেয়েটাকে বুকে ক'রে। দশজনার বাড়ীতে ঝি গিরি ক'রে দিন কাটতে লাগল। এমন সময় আমাদের বস্তিতে একদিন ওলাউটোর ব্যামো এসে পড়ল। ক'জন মরতে না মরতে আমার বাচ্চা মেয়েটাকে ধরে নিলে। চিকিচ্ছের কোন ব্যবস্থা হবার আগেই সাবাড় হয়ে গেল মেয়েটা। বলেই এই দীর্ঘদিন বাদেও বুড়ি সন্তান শোকে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, মেয়েকে ওরা নিয়ে যাবার পরেই আমার ভেদবমি সুরু হয়ে গেল। তখন দেখলাম বস্তিতে অনেক লোকের আনাগোনা চলছে, একদল মড়া ফেলছে আর একদল নতুন রোগীদের চিকিচ্ছে করাচ্ছে, হাসপাতালের গাড়ীতে তুলে দিচ্ছে। ওরাই আমাকে ধরে হাসপাতালের গাড়ীতে তুলে দিল। দিন কতক বাদে বস্তিতে ফিরে যেতেই বাড়ীওয়ালী বলল আমার জিনিষপত্তর সব তার ঘরেই রাখা আছে, ঘরটা সে অন্য লোককে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে আমি মরে গেছি মনে ক'রে। জিনিষপত্তরও দেখলাম ভাল যা কিছু ছিল আর নেই। অদরকারী আজে-বাজে জিনিষ কিছু কিছু পড়ে আছে। জিনিষের কথা জিজ্ঞেস করতে বলল, সেসব কে কি ক'রেছে সে কি আর নিকে রেকিচি বাপু? এই যে রেকিচি এতেই তোমার ভাগ্যি। তা ছাড়' আগে একটা ঠাঁই দেকে নাও নইলে এই জিনিষই রাকবে কোতায়? বুঝলাম মাগী আমায় থাকতে দেবেনে। কি আর ক'রব রাস্তায় নেমে এলাম। শরীর এতই দুব্বল হয়ে গিয়েছিল যে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। তারপর থেকে এই মায়ের দুরজাতেই পড়ে আছি—বলে বুড়ি মা কালীর মন্দিরের দিকে চেয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে জানাল—আর ক'টাই বা দিন, কেটে যাবে। তবে যেদিন দেকেচি তা আর নেই। কত কি বদলে গ্যালো—বলে একটু থেমে বলল, সবই বদলে গ্যালো। সেই চোখে দেখে আর চেনাই যায় না এসব জায়গাকে। আ গো মানুষগুলোও সব বদলে গ্যাচে। আগেকার দিনে

এখেনে যা পেইচি সবই থেকে গ্যাচে। গেরস্ত বাড়ীর দেওয়া ভাতেই দু-বেলা পেট ভরে যেতে।

বুড়িটার কথা শুনতে শুনতে তার মনে হ'ল, আচ্ছা, এমন হয় না যে গৃহস্থ বাড়ীর লোকগুলো আবার সেই আগের মত হয়ে যায়! সকাল বেলা উঠে দুটো ভাতের দুশ্চিন্তা আর থাকে না? সত্যিই আজকাল কেউ দেয় না। চিৎকার ক'রে ক'রে গলায় ব্যথা হয়ে যায় তবু দুবেলাকার খাবার জোগাড় করা যায় না। 'এ মাসী' সীতা শুনল একটা ছোকরা এসে বুড়িকে ডাকছে। তেল চকচকে চুল কিন্তু রং তার লালচে। পেছন দিকে টেনে আঁচড়ানো। মুখে কাঠিন্য, চোখের দৃষ্টি ধারালো। গায়ে একটি হাতে বোনা গেঞ্জি। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েস হবে ছোকরাটির, এসে দাঁড়িয়েই বুড়িকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল—এ মাসী, একটা টাকা ছোড় না।

আ ম'লো যা—বুড়ি অস্পষ্টভাবে বকে উঠল, টাকা কোতায় পাব?

ছোকরাটির কানে যেতে বলল, বেশ, আট আনা দাও, পঞ্চাশ পইসা।

যা যা। বিরক্ত করিস নে—বুড়ি ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলল।

পয়সাটা পেলেই কেটে যাব মাসী—একমিনিট দাঁড়াব না, ছোকরা জানাল।

পয়সা কোথায় পাব র‍্যা ছোঁড়া? পয়সা থাকলে আর ভিক্কে করতে আসি?

তুমি তো মরেই যাবে মাসী, কোদিন আর! একটা দুটো টাকা আমাদের ছাড় না—নাছোড়বান্দা ছেলেটি কণ্ঠের রুক্ষতা কমাবার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটল বুড়ির। হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুনের মত সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নিমেষে, জবাব দিল, আ ম'লো আবাগীর ব্যাটারা আমি মরব কেন রে, তুই মরগে যা তোর বাপ মরুক গে যাক; গুষ্টি মরুক তোর। বংশে বাত্তি দিতে কেউ যেন না থাকে।

নিমেষের মধ্যে বুড়িকে এমনি আগুন হতে দেখে সীতা অবাক হয়ে গেল। ভাবল বুড়ির যা বয়েস হয়েছে তাতে তার মরতে আর ক'দিনই বা বাকী তবে মরণের কথাতে এত রাগ হচ্ছে কেন তার? ওর নিজের তো মনে হয় মরণ হলে এই যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেত। জীবনটাকে এইভাবে টেনে চলা আর চলে না। কি সুখে বেঁচে থেকে যে বুড়ি মরার কথায় রেগে যায় তা সে-ই জানে।

ছোকরাটি চলে যেতে সীতা জানতে চাইল—সে-টা কে গো আপনার?

আ ম'লো যা, ওই পশ্চে ছোঁড়া আমার আবার কে হতে যাবে! আমি যেখানটায় থাকি সেখানেই থাকে ওরা; তাও কোনদিন কোতায় থাকে কোতায় শোয় তা বাপু জানি না।

কেউ নয় শুনে সীতা আর উৎসাহ বোধ ক'রল না। কিন্তু বুড়ি বলেই চলল, পেথম পেথম তো ওদের চোটে টিকতেই পারতাম না। গাঁজা খেয়ে

ধোঁয়ায় ধোঁয়া ক'রে রাখতো জায়গাটাকে। এখনও রাখে তবে এখন সয়ে গিয়েচে। কত রকম উৎপাতই যে করে সে আর তোমাকে কি বলব বাছা, কি ক'রব বল সহ্য ক'রে থাকি—। এক একদিন অনেক রাত্তিরে উঠে কোতায় যায় আবার কোন কোন রাতে ওদেরই সাকরেদ অন্য ছোঁড়ারা ছুটতে ছুটতে এসে শুয়ে পড়ে ঝুপ ঝাপ ক'রে। সকালে উঠে চোরাই মাল ভাগ করে বসে বসে। একদিন একটা ছোঁড়া তো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে গিয়ে আমার ওপরেই আছড়ে পড়ল। আমি ঘুম ভেঙে যেই না চমকে উঠে কে কে করেছি ছোঁড়াটা আমার পাশের থেকে ধমকে উঠল, চুপ যা। ওদের তো আমি চিনি তাই গলার ওই শব্দ শুনে আর রা-টি করিনি।—বুড়ি থামল। তারপর গলার স্বর নিচু ক'রে বলতে লাগল—তোমার কাছে আর কি লুকোব মা ওইখানে একটা ছুঁড়ি আছে দেখেছ? সব সময় বিবিটি সেজে বেড়াচ্ছে, সেই মাগীই হচ্ছে যত বজ্জাতির গোঁসাই। যত গুলো মন্দ ওদের দলে আছে সকলের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি। রাত ভোর একটু ঘুমোবে না আর সারাদিন গতর সোহাগী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ওই ছুঁড়িকে নিয়ে কি নড়াই এক একদিন তোমায় কি বলব গা। একদিন ওদের দলেরই একটা ছোঁড়াকে আর একটা মুখো ছোকরা কি মারটাই না মারলে—নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তবু কি ওগুলোর লজ্জা আছে! দুদিন বাদে দেকি আবার দুজনে একসঙ্গে বসে গ্যাঁজা খাচ্ছে আর ওই ছুঁড়ির সঙ্গে খিস্তি দিয়ে রসিকতা ক'রচে।—বুড়ি একটানা অনর্গল বকে যেতে লাগল। সীতা-ও তন্ময় হয়ে শুনছে যা এতদিন এদের সঙ্গে থেকেও জানতে পারে নি। দেখতে পায়নি এত। বুড়িই বলল, তোমরা সামনের দিকটায় থাক তো তাই ওদের এসব কীর্তি দেখতে পাও না। দিন রাত চুরি-চামারি করে বলে একবারে সামনের রাস্তায় থাকতে ওদের একটু অসুবিধে হয়। তাই বা বলি কি ক'রে, ওই যে চাওয়ালাটা ওই লোকটাও ওদের দলে আছে।

সে কি গো মা!—হঠাৎ যেন আঁতকে উঠল সীতা। প্রশ্ন ক'রল, ওই চোরেদের দলে?

হ্যাঁ বাছা, তবে আর বলচি কি!

তবে আমার কি হবে গো বলে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল সীতা। বুড়ি তাতে আশ্চর্য হয়ে গেল। পাল্টা প্রশ্ন ক'রল, ও কি লা? অমন ক'রছিস কেন?

সীতা কোন জবাব না দিয়ে চায়ের দোকানের দিকে চলল। বুড়ি সেদিকে তাকিয়ে রহস্য কিছু বুঝতে না পেরে আপন মনেই উচ্চারণ ক'রল, আ ম'লো যা রগোড় ছাকো না মাগীর—তারপর সে-ও আর সীতার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজের আস্তানার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

সীতা সোজা চায়ের দোকানে গিয়ে দোকানীকে বলল, তোমার কাছে যে টাকা দুটো রেখেছিলাম দাও তো এখন— ।

এখনই রুপেয়া দিয়ে কি হোবে ?

যাই হোক না কেন তোমার তাতে কি দরকার ? টাকা তোমায় রাখতে দিয়েছি তুমি দিয়ে দাও।

চা-ওয়ালার ততক্ষণে চোখ পড়েছে ছেঁড়া কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে থাকা সীতার একটি স্তনাংশে এবং সেই দিকে চোখ রেখেই নিজের ভাষায় বলল—ঠিক আছে তোর টাকা লিয়ে যা। টাকা দুটো টিনের একটা দোকানদারী কৌটোর মধ্যে থেকে বের ক'রে দিয়ে দিল সীতাকে। সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা ক'রে আপন গ্রামীণ ভাষায় দুচারটে অতি অশ্লীল গালিও দিল হাসতে হাসতে এবং খুব তৃপ্তি লাভ ক'রল যেন। সীতা টাকা দুটো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে কি দেখল তারপর বলল, এটাকা তোমার কাছেই রেখে দাও।

ফের একটা অশ্লীল শব্দের রসিকতা ক'রে জানতে চাইল, বাপস লিবো না ?

না না, লিয়ে কি হবে ? মরদটার চিকিচ্ছের জন্যে অ্যানেক পয়সা লাগবে গো তাই তোমার কাছে জমা রাখতেছি। পয়সা তো মিলতেছেই না জমবে কি। তা যা-ই পাই তোমার কাছে রেখে দে যাই। তা ওই বুড়ি মাগী বলে কি সব চোর। তা তুমি যদি চোরই হবে বাবা তবে আমার টাকা ফেরৎ দিবে কেন, য়্যাঁ ?

চাওয়ালার দোকানে দুজন খদ্দের আসায় সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, বিকাল মে আসিস, আভি যা।

টাকা দুটো রেখে সীতা নিশ্চিন্ত ভাবেই চলে গেল। ভাবল বুড়িটা নিন্দুক সকলের নামেই নিন্দে ক'রে বেড়ায়। তবে বুড়ির কথাটা দোকানদারকে খুলে বলতে না পারায় বেশ অস্বস্তি ভোগ ক'রতে লাগল।

সবাই বলে বুড়ির নাকি অনেক টাকা। অনেক দিন ধরে ভিক্ষে ক'রে ক'রে অনেক টাকা জমিয়েছে বুড়ি। তিনকুলে এমন একজনও নেই যাকে সে দিতে পারে। তাই টাকা জমেই গিয়েছে আর সেই গচ্ছিত অর্থের মায়ায় বুড়ি নাকি যক্ষ হয়ে গিয়েছে। যেদিন কিছু না পায় সেদিন পর্যন্ত জমানো টাকা থেকে পয়সা খরচ ক'রে খায় না। নিরঞ্জনের চিকিৎসার জন্যে কতদিন ধরে টাকা জমানোর চেষ্টা করছে অথচ তা আর হয়েই উঠছে না, এতদিনে মাত্র দুটো টাকা জমাতে পেরেছে। বুড়ি তো দুদিন বাদেই চোখ ওলটাবে অথচ কি হবে তার টাকা দিয়ে! সীতা বেশ একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল।

ভাবনা যখন আসে তখন একের পর এক এসে জড় হতে থাকে। দুপুরটায় কোন কাজ থাকে না বলে যত রাজ্যের ভাবনা এসে জোটে। নিরঞ্জনের

কথাই মনে পড়ল সীতার, লোকটার রোগ একটু কমলে সীতা বাঁচত। বাঁচতই বা কি, জমিজমা তো একটা সরষে রাখবার মতও নেই, ভাল হয়েই বা কোন কর্মটা ক'রে খাওয়াত? তবে লোকের মোটঘাটগুলো তো অন্তত বইতে পারত তাতেই বা কম রোজগার কি, ওই মুটেগুলো সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে আর রাত হলে এসে ফুটপাথ জুড়ে শোয়, ওরা কি কম রোজগার করে! দেশে বউ ছেলে আছে তাদেরও তো এই ক'রেই খাওয়াচ্ছে—। তাছাড়া এই রোগের যন্ত্রণাও তো আর চোখে দেখা যায় না।

হঠাৎ সীতার চোখ পড়ল মোটঘাট মাথায় নিয়ে একটি লোক এদিকেই আসছে, তার পেছন পেছন অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আর সব শেষে একটি মহিলা যার কোলে আর একটা শিশু ঝুলতে ঝুলতে মায়ের বুকে দুধ খেতে খেতে আসছে। নিজের ছেলের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখল বড় ছেলেটা মদনের চেয়ে একটু বড়ই হবে। তারপর বোধহয় বছর বছর এগুলো এসেছে। ইতিমধ্যে দলটা কাছে এসে পড়ায় বউটার পেটের স্ফীতি আর শরীরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাঁজ দেখে বুঝল এখনও পোয়াতি, খুব বেশী দেরী নেই নামতে। নিজেকে কেমন রিক্ত মনে হ'ল সীতার। বউটার কেমন কোল জোড়া বাচ্চা আর তার তা হবারই উপায় নেই। মদনের বাপ দুটো ভাত খেয়েই হজম ক'রতে পারে না—। খেতে দিতে না পারে না পারুক, না হয় ভিক্ষে ক'রেই খাবে যেমন খাচ্ছে, যদি অমন কোল ভরেও দিতে পারত—।

অতি সাময়িক উদাসীনতার অন্যমনস্কতায় সীতা চমকে উঠল পেছন দিকে পাগলীটা চেঁচিয়ে উঠেছে—আঁহা হা। এখানে থাকবে না। এখুনি তাইলে বিন্দেশ্বরকে ডেকে নিয়ে আসব।

সীতা তাকিয়ে দেখল ওই দলটা পাগলীর জিনিষপত্রের পাশে নিজেদের মোটঘাট নামানোতেই পাগলীর চিৎকার, সে ওদের থাকতে দেবে না। পুরুষ মানুষটা অমনি বলে উঠল—অমন ক্যানে কর রে বাবা! কাল সকালেই চলে যাব। রাতটুকুন থাকব খালি।

পাগলী প্রবল বেগে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে চলল। ভাবখানা এই যে সে কিছুতেই এখানে ওদের থাকতে দেবে না। দলের মহিলাটি এবার অতি কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল—ও রে আমার কে রে! ওনার কেনা জায়গা যেন। থাকতে দেবে না—! এখেনে থাকব তা তোর কি লা?—বলতে বলতে কোলের ছেলেটিকে সেইখানেই নামিয়ে দিল দুম ক'রে। মুখের থেকে মায়ের স্তনটি এভাবে হঠাৎ সরে যাওয়ায় প্রচণ্ড বিক্রমে ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠতে বাপটা বলল, চুপ যা।

ওদিকে পাগলী ততক্ষণে অশ্লীল ভাষায় অফুরন্ত গালাগালি দিতে সুরু

ক'রেছে উচ্চৈস্বরে। তার অদ্ভুৎ অঙ্গভঙ্গী সজোরে উচ্চারিত খিস্তির তোড়ে খড়ের মত ভেসে গেল ওখানের শান্তিটুকু। পথচলতি লোকগুলো তাকাতে বাধ্য হ'ল, আর সকলেরই চোখে পড়ল পাগলী অধোবাস সম্পূর্ণ উন্মোচিত ক'রে বিশেষ ভঙ্গী সহকারে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে নিজের শরীরের গোপন ইন্দ্রি প্রদর্শন ক'রে ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অশ্রাব্য গালাগালি বর্ষণ ক'রতেই ওপাশ থেকে কয়েকটি ছোকরা অতি শব্দে হেসে উঠল আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলে সেই দৃশ্য অবাক হ'য়ে দেখতে লাগল। সীতা দেখল আগন্তুক মহিলাটিও কিছু কম যায় না, সে দেহের নামমাত্র আবরণটুকু উন্মোচন না ক'রেই যা বাণ বর্ষণ ক'রতে লাগল তাতে মৃতদেহেও চঞ্চলতা আসা সম্ভব। দুই পক্ষের বাক্যবাণ বর্ষণে যখন সেস্থান যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক সেই মুহূর্তে একটি রসিক ছোকরা অতি আনন্দের উচ্ছৃংখলতায় মুখের মধ্যে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটি অতি তীব্র শিস্ দিয়ে উঠল। ওদেরই একজন চিৎকার ক'রে উঠল—লে লে। লে পাগলী—। চারিদিকের অবস্থা দেখে সীতা বুঝল পাগলীটা দীর্ঘদিন ওখানের বাসিন্দা হওয়ায় ছোকরাগুলোর সমর্থন যেন তারই প্রতি। এমন কি সে নিজেও চাইছিল ছেলেপিলেগুলো নিয়ে ওরা এখানে না থাক। যন্ত্রণায় রাতে ঘুম না হবার জন্যে এখন ঘুমোচ্ছিল নিরঞ্জন, হৈ হট্টগোলে সে-ও জেগে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে আপনি অবস্থা শান্ত হ'ল। মদন পাগলীর কাছে দাঁড়িয়ে মগ্ন দেখছিল এতক্ষণে সে ফিরে এসে পাগলীর অঙ্গভঙ্গীগুলো অনুকরণ ক'রে খেলতে লাগল আপন মনে। সীতা দেখল মদন এসেছে, এখনই হয়ত খাবার জন্যে বায়না ধরবে। ইদানীং যতক্ষণ দূরে দূরে একা একা খেলা ক'রে বেড়ায় ততক্ষণই ভাল। চোখের আড়ালে থাকলে তো আর বায়না ক'রতে পারবে না বিরক্তও ক'রতে পারবে না। কাজেই আজকাল সারাদিন ঘুরে বেড়ালেও কিছু বলে না সীতা কারণ জানে বেশী দূরে কোথাও যাবে না, আর এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে আজকাল এটা সেটা খেয়ে পেট ভরিয়ে রাখতে শিখেছে মদন, তাছাড়া কখন কখন দু'চারটে পয়সা ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে না নিয়ে আসে এমনও নয়। সীতা ছেলের খেলা দেখছিল এমন সময় শুনল নিরঞ্জন বলছে—আজ বিকালে হাসপাতালের কমপোরে আট আনা পয়সা দে ওষুধটা নে আসিস বউ!

সীতার মনে পড়ল হাসপাতালে যে লোকটা ওষুধ দেয় সে পঞ্চাশটা পয়সা না দিলে একশিশি ওষুধ দিচ্ছে না। অথচ এই পয়সার জন্যে তিনদিন ধরে ওষুধটা আনাই হচ্ছে না। চুরি ক'রে দিলে একটাকা দিতে হয় আর ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে পঞ্চাশ পয়সা। এই ওষুধে যে খুব কাজ হয় এমন নয় তবু একবারে না খাওয়ার চেয়ে তো ভাল। তবে ডাক্তার যে সব ওষুধ খেতে বলে

পয়সা না থাকলে কি সে সব দামী দামী ওষুধ পাওয়া যায়! সীতা উত্তর দিল—ওষুধ নে আসতে বলতেছে তো বটে, পয়সাটা কই?

আট আনার পয়সা তোর কাছে নেই! অবিশ্বাসের সুর নিরঞ্জনের কথায় পরিস্ফুট।

কোথা পাব? পেটে খেতেই চলে না—।

নিরঞ্জন চায়ের দোকানে পয়সা রাখার কথা জানে না বলেই একবার যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে পাশ ফিরে শুল। সীতা বলল দেখি আজ সেবলা পয়সা জোটাতে পারলে ওষুধ নে আসব। সত্যিই সে তার মনের কথাটাই বলল। জমানো পয়সা খরচ ক'রে ফেলতে ইচ্ছে নেই তার। আর এমন তো নয় যে এক্ষুণি ওষুধ নইলে চলছে না। কত ওষুধই তো খেল কি লাভ হচ্ছে? দু'একদিন না খেলেই বা কি ক্ষতি হচ্ছে এমন? কাজেই আজ বিকালের মধ্যে জোগাড় ক'রে কাল সকালে ওষুধ নিয়ে আসবে।

নিরঞ্জন ওপাশ ফিরে শুয়ে সমানে কাতরাচ্ছে দেখে সীতা বেশ একটু বিরক্তই হ'ল। এত কেন রে বাপু? এতই কি যন্ত্রণা হচ্ছে? একটু বেশী বেশীও করে। সত্যিই বিরক্ত হয়ে গেছে সীতা, এত অসহ্য কি বাপু সওয়া যায়! দিনরাত যদি কাজের ভয়ে লোকটা পড়ে পড়ে কাতরায় তো কার তা দেখতে ভাল লাগে? বসে বসে খেতে পেয়ে কুড়ে হয়ে গেছে নইলে এত ওষুধেও একটু কমছে না, এ কি একটা কথা! এই হাসপাতালেই তো রোজ শয়ে শয়ে লোক ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। রোগ না সারলে অমনি কি আসছে তারা? আর নিরঞ্জনের বেলাতেই সারছে না!

সীতার লক্ষ্য পড়ল নতুন আসা বউটা পুঁটলি খুলে কি সব জিনিষপত্র বের ক'রতে ব্যস্ত। বসে বসে বসে দেখল একটা মুখকাটা টিনের বড় কৌটো, একটা তোবড়ানো বিবর্ণ এল্যুমিনিয়ামের থালা, একটা ছোট টিনের কৌটো, একটা কাঁচের শিশি এই সব বের ক'রে বউটি ধীরে ধীরে একপাশে রাখতে লাগল। লক্ষণ দেখে মনে হ'ল এখানেই পাকাপাকি উপনিবেশ গড়বে। অথচ সীতা নিজেও তা চাইছিল না, তাই সে উঠে আগন্তুক মহিলাটির কাছে গিয়ে জানতে চাইল—কোত্থেকে এসছ গো তোমরা?

হাতের কাজ ক'রতে ক'রতে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বউটি বলল, ড্যাকরারা কাল রেতে সেই দিকের এক মাঠের মধ্যেখানে ফেইলে দে এসেছিল। হাত দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দেখিয়ে দিল।

ফেলে দিইছিল কি গো! কে?—সীতা নতুন বিস্ময়ের সম্মুখীন হ'ল।

আগো হ্যাঁ। ত্যাখন মাঝ রাত। আমরা সব ঘুমুচ্ছি কে যেন লাথি মেরে মেরে তুলল আমাদের। চোখ মেলি দেখি যণ্ডা যণ্ডা পুলিশ সব। ইয়া

বড় গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সব বড় বড় নাটি। আমাদের পাশের বউটার একটা ডাগর মেয়ে ছিল তার বুকের ওপর ডাণ্ডা দিয়ে খোঁচা দিল। আমাদের মানুষটারেও এক ঘা লাগায়ে দে বলল, চল সব। গাড়ীতে ওঠ। কচি কাচ্চা বাচ্চা নে সব সব গাড়ীতে তো ওঠলাম শোনলাম আমরা সব কলকেতার রাস্তা নোংরা করতিছি দেখে আমাদের চালান দেওয়া হচ্চে।

তারপর? আতংকিত ঔৎসুক্যে সীতা জানতে চাইল। অনেক দূরে নে একটা মাঠের মধ্যে ফেইলে দেল। আমরা রাতের বাকীটুকু কোন রকমে পড়ে থেকে পেত্যুষে উঠে রওনা হয়ে এই আসতিছি।

ঘটনা শুনে অতংকিত সহানুভূতি সীতার কণ্ঠস্বরকে করুণ ক'রে তুলল, সে জিজ্ঞেস ক'ল, এখানকেয় সেপাই আবার অমন ঝামেলি করে না কি?

শুধু এই কথা শুনেই তুমি এমন আশ্চর্য হচ্চো আর কতো অত্যেচার যে করতিছে তার কি আর শেষ আছে—?

সীতার চোখে মুখে ঔৎসুক্য প্রবল ভাবে ফুটে উঠল। সে আন্দাজ ক'রতে পারল না কোথাকার কথা বউটা বলছে। কারণ এখানেও যে দুএকজন পুলিশ দেখা যায় না এমন নয় তবে তারা তো কখনও ওরকম করে না। সে জানতে চাইল—কুন গেরামের কথা তুমি বলতেছ বুন?

গেরাম কি গো! আ মলো যা এই কলকেতার কথাই তো কচ্ছি তুমি কি শুনতিছ এত সময় ধরে?

তবে যে তুমি এসে বললে সি দিকে কুন গেরামে না জায়গায় ছিলে তুমরা!

তুমি বুঝি নোতুন এসেচ? আরে বাবা এই যে কলকেতা সহর ছ্যাখতেছ এ শহর সিদিক পানে অনেক দূর লম্বা চলে গেলছে।—উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে দেখাল নতুন আসা বউটি। তারপর বলল—কেরমাগত বড়েতেছে, আরও বড় হচ্চে। ইদিকে সিদিকে বাইড়ে বাইড়ে সব খায়ে ফালাচ্চে।

সীতার সামনে আজ যেন আর এক নতুন বিস্ময়ের যবনিকা উত্তোলন হচ্ছে, উন্মোচিত হচ্ছে নতুন জগতের অজানা সংবাদ। সে মগ্ন বিস্ময়ের নীরব জিজ্ঞাসায় শুনছে এই ইমারতমালার অশ্বমেধের কাহিনী। এই চোখে দেখা অট্টালিকাগুলো একসঙ্গে মিলে এক স্বপ্নের মত মনে হয় তার কাছে আরও আশ্চর্য এই অট্টালিকার এগিয়ে চলা। বউটার কথা তাই সে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। এই যে এত বড় বড় অগুণতি বাড়ী এত লোক এর মধ্যে আসে কোথেকে! কোনদিন সাগর দেখে নি সে অথচ তাদের গাঁয়ের রতন মাঝিরা মাছ ধরতে সাগর যেত বলে রতনের বউ এসে স্বামীর কাছে শোনা গল্প বলত যে সাগরের না কি কূল নেই শেষ নেই এই কলকাতা এসে সে দেখছে কূল কিনারা তো এই সহরেরও নেই। বউটার কাছে যা শুনত তাতে ওদিকে

কতদূর গেলে যে শেষ কে জানে। তন্ময়তা কাটলে সীতা জানতে চাইল, বোধহয় অনেকদিন তোমরা কলকেতা এয়েছ ?

তা অনেক দিন মানে আমার এই ছেলেটারে কোলে নে এয়েচি। তারপর এদের তিনটের এই কলকেতায়ই জন্ম হল।

তোমাদের গেরাম কোথায় ছিল ?

সেই কিষ্টোপুর।

গেরাম ছাড়লে কেন ?

খাব কি বুন ? সীতার সহানুভূতিতে বউটা ঘনিষ্ঠ হ'ল, জানাল, জমি জিরেত তো নিজেদের কিছু ছেল না, ভাগ চাষের কাজ ছেল মানুষটার। পর পর দু' বছর চাষ হল না, খরায় সব শুকোয়ে গেল। হাল বলদ বেচে দ্যানা শোধ করে তো বাঁচলাম কিন্তু খাতি পাবার আর উপায় নাই। তাছাড়া দিনে দিনে কলকেতার বাবুরা আমাদের চারপাশের জমিনগুলা বেশী বেশী দাম দে কিনি নিতি লাগল। বাড়ী বানায়ে সে গেরামের চেহারা বদলে দেল, বাধ্য হয়ে মানুষটা ভিটে বিক্কিরি ক'রে দেলো। করলি হবে কি অভাবের টানে ওই টাকা আর কদ্দিন, সব টাকা ফুরোয়ে গেল। গেরামের ভেতর দিকে উঠে গেলাম কিন্তুন কাজ না থাকলি কি খাব ? তাই দুটো খায়ে বাঁচবার জন্যি চইলে আলাম এই কলকেতা।

মদন কোথায় গিয়েছিল এখন সে সীতার হাতে সাতটা পয়সা দিতে সীতা নিয়ে আঁচলে বাঁধল। একটু দূরে গিয়ে মদন মুখের মধ্যে থেকে আরও কয়েকটা পয়সা বের ক'রে দেখিয়ে নাচতে লাগল। সীতার নজর পড়তেই সে ডাকল—ইদিক আয় পয়সা দে যা।

না দেবার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে একইভাবে নাচতে লাগল মদন। সীতা এবার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বলল, শিগগির দে যা বলতিছি।

তার রোষকে গ্রাহ্য না ক'রেই মদন নাচতে নাচতে চলে গেল ফুলুরি কিনতে। এ পয়সা ক'টা সে কিছুতেই দেবে না, একটা বাবুর কাছে ফুলুরি খাবার জন্যেই চেয়ে নিয়েছে সে।

সীতা ছেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে অকারণেই বলল, আজকাল ছেল্যাটা ভ্যাতড়া হয়ে গেলছে। যা পয়সা মেগে পায় সব দেয় না।

সব না দিলিও তো কিছু দেয়। আমার এই শকুনেরা তো একটা পয়সা কোনদিন নে আসে দেয় না।

সীতা এ কথার কোন জবাব দিল না। বরং সে পুরানো প্রসঙ্গেই ফিরে গেল, তোমাদের গেরামে কি বললে কলকাতার বাবুরা বাড়ী বানাচ্ছে ?

হ্যাঁ গো। সে গেরাম কি আর আছে ? না আছে সেই সব লোকজন ?

যারা পেরেচে উঠে ভেতর পানে চলে গেলছে আর আমাদের মতন হাভাতেরা তো দেখছই বুন। আর সে গেরাম এখন তো কলকেতার সঙ্গে লেগে গিয়েচে গো। কলকেতার বাবুরা এখন হাতিয়াড়া পর্যন্ত বাড়ী করতেছে কিষ্টোপুর বাগুইটি ছেড়ে। এখন তো সব টাউন হয়ে গেলছে গো।

এও এক নতুন কাহিনী সীতা শুনছে। নিজেদের গ্রাম ছেড়ে আসতে আসতে সে দেখেছে পীচ রাস্তার ধারে ধারে উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কলকারখানা গড়ে উঠছে সারি সারি। সে দেখে অবশ্য তার তখন মনে হয়নি যে কোন নতুনত্ব হচ্ছে, সব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে তার। মনে হচ্ছে এমনি ক'রেই একদিন হয়ত দেখা যাবে ওদের গ্রামেও সবুজ ক্ষেতের ওপর বাড়ী হয়েছে, কারও ভাঙা টালির চালা সরিয়ে দিয়ে উঠেছে ইঁটের অট্টালিকা।

সীতার ভাবনাকে থামিয়ে দিয়ে কেষ্টপুরের বউটা বলে উঠল, আমাদের গেরামের শীতল সানাও তো কলে কাজ করবে বলে কলকেতা এয়েছিল কিন্তুন তারে এক দিনও দ্যাখলাম না। পায়ে হাঁটে হাঁটে আদ্দি কলকেতা ঘুরিও তারে দেখতি পেলাম না। মানুষটে বড় ভাল ছেল গো। বউটেও ভাল ছেল। মাত্তর চোদ্দ বছর বয়েসে সেই বনগাঁর থে শ্বশুরবাড়ী এসেছি শীতল সানার বউটেও ছিল আমার বাপের বাড়ীর গেরামের মেয়ে। তাই ওরই কাছে গিয়ে একটুক বাঁচতুম। —বউটা কথা বলতে বলতে এমন এক অতীতের মধ্যে প্রবেশ করল যেখানে এই দীর্ঘ কয়বছরে সে যায়নি, মনেই পড়েনি সেসব দিনের কথা। এখানে দিন যাপনের আয়োজনেই কেটে যায় দিনের আলোকিত সময়টুকু, তাতে শুধু প্রাণধারণ। রাত বাড়লে ফুটপাথে সারি সারি মানুষগুলোর মধ্যে একটু অন্ধকার দেখে পথের বাতির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অতি সন্তর্পণে শোয়া মানেই একটা দিন কাটাতে পারা, আর সব সে ভুলে গেছে এমনকি গ্রামের কথাও আর মনে পড়ে না।

আজ সীতাকে দেখে যেন নিজের অতীতকে মনে পড়ে গেল তাই সে সেই পুরানো দিনের কথায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল এই দীর্ঘ কয়েক বছর বাদেও। ইতিমধ্যে একটি ছোকরা এসে হাজির হ'ল, তার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা একটা চারকোণ তাবিজ তাতে গন্ধমাদনবাহী হনুমানের মূর্তি। ছোকরাটি এসেই কৃষ্ণপুরের বউটিকে উদ্দেশ্য ক'রে আধা হিন্দী মেশানো বাংলায় ধমকে উঠল, আরে রেণ্ডী, ভাগ ভাগ।

বউটি ওইটুকু ছোকরার অত গরম দেখে বেশ বিস্মিত হ'ল যেন। ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি বদলে গেল তার। সীতার লক্ষ্য পড়ল একটু আগেই তার যে চোখে কেষ্টপুরের সবুজ ছায়া ফুটে উঠেছিল অকস্মাৎ তা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে এই শহরের রুক্ষতা উঠল জ্বলে। সমস্ত মুখমণ্ডলেই সেই

পরিবর্তন সূচিত হ'ল এবং সেও মুহূর্তে পাল্টা চিৎকারে মুখরিত হ'ল, কি বলত্তিছিস! মুখ পোড়া! আমারে বলিস রাণ্ডী? তোর মা রাণ্ডী, তোর মা সাতভাতারে—এরপর যতরকম অশ্লীল কর্মের বর্ণনা অনর্গল দিতে লাগল বউটা। এবং ওই ছোকরার মায়ের দেহের বিভিন্ন যৌনাঙ্গের নানা বিকৃত অবস্থার কল্পিত বর্ণনার তুবড়ী ছোটাতে লাগল এমনভাবে যে তার একক চিৎকারে আগন্তুক ছোকরাটির কথা আর কারও কানেই গেল না। আর কয়েক মুহূর্তে আসে পাশে সীতা ছাড়া মদন, কেষ্টপুরের বউটার স্বামী, ছেলেরা আরও তাদের কজন সহবাসী এসে ছুটে গেল। ঘিরে দাঁড়াল তাদের, শুনতে লাগল সেই গোপনাঙ্গ সমূহের অশ্রাব্য বর্ণনা। তার সঙ্গে অতি নোংরা ভাষায় মানুষের যৌন ক্রিয়ার বিভিন্ন রকম বর্ণনাও চলতে লাগল রসাল অত্যুক্তিতে। চলতি পথিকেরা শব্দের গতিবেগে আকৃষ্ট হয়ে বাধ্য হয়েই দৃশ্যাবলী দেখে যেতে লাগল, দুটো অল্পবয়সী স্কুলের ছেলে তো ঔৎসুক্য দমনের প্রয়াস না পেয়ে দাঁড়িয়েই গেল দর্শকদের মধ্যে।

সমস্ত ব্যাপার দেখে এবং ঘটনার আকস্মিকতায় সীতা কেমন ঘাবড়ে গেল। এই দুর্দান্ত ছোকরাটিকে ভয় করে না এমন ফুটপাথের বাসিন্দা এ রাস্তায় নেই। এই রাস্তাটা ওরই এলাকা। এখানে ভিক্ষে করলে ও ইচ্ছেমত খাজনা আদায় করতে পারে, কাউকে ইচ্ছে হলে মারতেও পারে। শাসন করতে পারে, আরও কি কি যে পারে তা আর জানা নেই সীতার। তবে অনেককিছু যে আরও ভয়াবহ পারে তা সে ইতিমধ্যেই শুনেছে। আর সেই প্রতাপান্বিত বিন্দেশ্বর নামক ছোকরাটিকে নাকি এমনি গালাগালি! আজ না জানি কি হবে, সীতা তো মনে মনে ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

পরের দিন রোদ একটু উঠেছে কি না উঠেছে এমনি সময় রেখা কোত্থেকে দৌড়ে এসে খবর দিল, কি হইছে শুনছ নি?

রেখার মুখ চোখের ভয়ানক আতংকের ছাপ সীতার মনেও সংক্রামিত হল, জিজ্ঞাসার রূপে তা ফুটে উঠল তার চোখে; সে জানতে চাইল, কি হয়েছে?

কাইল সকালে যে বুড়ি তোমার লগে কথা কইতে আছিল কারা য্যান তারে মাইরা ফালাইয়া গেছে—।

য়্যাঁ! যুগপৎ আতংক ও বিস্ময় সীতার কণ্ঠস্বরে একটি শব্দে পরিণত মাত্র। আর তার সমস্ত শরীরের অভ্যন্তরে যেন কোন অজানা শংকা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার মনে হ'ল সে দাঁড়াতে পারছে না, পড়ে যাবে। অনেক কষ্টে নিজেকে খাড়া রেখে শুনল রেখা বলছে, বুড়িরে মাইরা তার গাট্টি বোচকা খুইল্যা সব টাকা পয়সা নিয়া অরা ভাগছে। বুড়ির কাছেই একজন মাইয়া মানুষ শুইত.হেয় কইতাছে বুড়ির সাতশ টাকা আছিল।

সীতার কানে এর পরের কথাগুলো আর প্রবেশ ক'রল না। আতংক গভীরতর হ'ল এইজন্তেই যে বুড়ি গতকাল সকালেই তার সঙ্গে চোরেদের গল্প ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। কালই কত কথা হয়েছে বুড়িটার সঙ্গে জীবনের কত অভিজ্ঞতার কথাই সে শুনিয়েছে, শুনিয়েছে অনেকদিন আগের কথা সেদিনের জন ও জনপদের কথা। আর তার পরের অন্ধকার রাত্রিটুকুর মধ্যেই তার কথা শেষ হয়ে গেল এমনই লোকেদের হাতে যারা হয়ত তার কাছে দীর্ঘদিন ছিল! হঠাৎ সে বোকার মত প্রশ্ন ক'রে বসল, কে মারল?

শুন দেখি কথা—রেখা বলল, আমি ক্যামনে কমু? তবে শুনছি ওইখানে যে চোরগুলি থাকত তারা বেবাক গেছে গা। পালাইছে।

শুনে সীতার মনে পড়ে গেল গতকালকের সেই যুবকটির কথা যে এসে পয়সা চাইছিল যাকে দেখিয়ে চোর বলে চিনিয়ে দিয়েছিল বুড়িটা এ তবে তারই কাজ! তা ছাড়া ওরা যখন পালিয়েছে তখন ওদেরই যে কাজ এতে আর সন্দেহ কি?

রেখা সীতাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বলল, ভাবতাছ কি? চল যাই দেইখ্যা আসি গিয়া।

না বাবা আমি যাব না—সীতা যেন ভয়ে ভয়ে বলল।

রেখা নাছোড়বান্দা, সে জোর ক'রল, চল যাই অখনই চইলা আসুম। খালি যামু আসুম।

সীতা দোটানায় পড়ল। মৃত বুড়ির দেহের অবস্থাটা দেখবার আকর্ষণ রেখার আহবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তার ভীতি পরাস্ত হ'ল বলেই সীতা বুড়ির মড়ার সামনে গিয়ে সমবেত জনতার পেছনে সভয়ে দাঁড়াতে পারল। সে দেখল বুড়ির দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে তার মুখের দুই ধার বেয়ে কিছু রক্তের রেখা। তা ছাড়া আর কিছুতেই মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার উপায় নেই। শুনল সকলে বলাবলি ক'রছে কোন লাঠি দিয়ে গলা চেপে ধরা হয়েছিল ইত্যাদি। ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই কোথা থেকে খবর পেয়ে একজন অফিসার সহ চারজন পুলিশ এসে মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়াল। সকলকে সরিয়ে কি সমস্ত লিখতে লেগে গেল তারাই জানে। পুলিশ আসায় সীতা চলে যাচ্ছিল কিন্তু তার কাপড়ে টান লাগায় থেমে রইল, তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করছিল রেখা। তার অসামান্য টানেই কাপড়টা একটু ছিঁড়ে গেল। সীতা একবার দেখে দুঃখ ক'রল, ইস ছিঁড়ে গেল কাপড়টা।

রেখা সেদিকে একবার তাকিয়ে সীতার পৃথুল স্তনের দিকে ইঙ্গিত করে চটুল ভঙ্গীতে বলল, ভালই হইছে লুকে তবু অমন ম্যাহটা একটু দেখতে পাইব।

সীতা সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন বুড়ির মৃতদেহটিকে ভুলে গেল, রেখার কথার জবাবে বলল, অতই যদি লোক দেখানোর শখ তো নিজেরটাই লোককে

দেখিয়ে বেড়াও কেনে—।

আমার কি আর তোমার মত আছে গো মাসী যে দেখামু, চট ক'রে জবাব দিল রেখা, আরও যোগ ক'রল, অমন থাকলে কি খালি ছ্যাখাইতাম ? ব্যাবাক মরদগুলার মুখে ঘইষ্যা দিতাম—বলেই অতি আনন্দে হেসে ফেলল রেখা। ফলে আসেপাশের সকলেই একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য হ'ল।

সীতা আর দাঁড়ানো বুদ্ধির কাজ মনে ক'রল না। রেখাকে বাধা দেবার সুযোগ না দিয়েই সে হন হন ক'রে পা চালিয়ে দিল।

রেখা একবার কেবল চেয়ে দেখল সীতা যাচ্ছে। তারপর সে আবার ভিতরে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিল। পুলিশ অফিসারটি নিচু স্বরে পুলিশ কজনকে কি নির্দেশ দিতে দুজন পুলিশ ভিড় সরাতে হাতের লাঠির বেশ সুষ্ঠু ব্যবহার ক'রতেই বাকী দুজন পুলিশকে নিয়ে অফিসারটি চলে গেল। রেখা দূর থেকে দেখল পুলিশ দুজন মৃতদেহটার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল পাহারায়। রেখা হঠাৎ তার পাশের দর্শকটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, কি করস্ রে বদমাসটা জানি কনকার !

পাশের যুবকটি একটি চানাচুরওয়ালা। বিকালে ট্রামরাস্তার ধারে সিনেমা হলের সামনে বসে চানাচুর বিক্রী করে আর সারাদিন এখানে ওখানে ঘোরে, কখন কখন সকালবেলা বিন্দেশ্বরদের আড্ডায় বসে জুয়াও খেলে, রেখারা দেখেছে। চানাচুরওয়ালা যুবকটি কোন কথা বলল না কিন্তু সরেও গেল না। একবার রেখার দিকে তাকিয়ে যেন কিছু হয়নি এমনি ভাব করে বুড়ির বহুদেখা মৃতদেহটার মুখের ওপরটায় ভন ভন করা মাছিগুলোকে দেখতে লাগল। যেন এমনি ভাবে মানুষের দেহে মাছি বসা আর কখনও সে দেখে নি।

রেখা কিন্তু তাকে ছাড়ল না। শাসাতে লাগল, আবার যদি আমার গায়ে হাত দ্যাস তো তরে যদি না মারছি তো আমার নাম র‍্যাখাই না।

রেখার অতি উচ্চ কণ্ঠস্বর আশে পাশের কয়েকজনকে আকৃষ্ট ক'রল। আর ওই ভিড়ের মধ্যেই ছিল ফুলমনি, এককালে নগররঞ্জিনী ছিল সে। আজ অপগত যৌবনের নিঃস্বতায় শীর্ণ দেহে বিকৃতপ্রায় মস্তিষ্কে সে রেখাদের সহ-বাসিনী, পালঙ্ক শয্যা থেকে পথ শয্যায় সে অবতীর্ণ। রেখার কথাটা কানে যেতেই সে বলে উঠল, এখন কচি মাল আছ তাই হাত কেন মুখ দিয়ে সব চেটে দেবে। চেটে চেটেই ঘা ক'রে দেবে তখন বুঝবে—দিয়ে রক্ত করবে—বলতে বলতে অকারণ ক্রোধে পরনের কাপড় দুই হাত দিয়ে হাঁটু অবধি তুলে ধরে কোমর ঝাঁকিয়ে নাচের ধাঁচে হেঁটে চলে গেল, যেন বেশ দ্রুত পায়েই গেল। কিছুটা দূর থেকে তার গজরানোর শব্দ শোনা গেল কথা না বোঝা গেলেও।

রেখা একবার ফুলমনির দিকে তাকিয়ে বেশ একটু এগিয়ে দাঁড়াল ভিড়

ঠেলে যাতে তার দেহ সংলগ্ন চানাচুরওয়ালা ছোকরাটির গায়ে একটু চাপ লাগল। আর তা লাগতেই বকুনি খাওয়া যুবকটি একটু যেন সরে গেল। অমনি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রেখা একটি চটুল দৃষ্টি মেলে বলল, ক্ষ্যামতা ফুরাইয়া গেল মরদের! হায়রে আমার মাইয়া মানুষরে।

কথা ক'টি বলে আর মুহূর্তমাত্র না থেকে রেখা জোর পায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল এবং এমন ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল যে তার অনুন্নত নিতম্ব যাতে দোলায়িত দেখায় হংসগামিনীর মত। তার প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রল চানাচুর বিক্রেতা ছোকরাটির দৃষ্টি বৃদ্ধার মৃতদেহ থেকে তার দিকে এসে।

সাবাস দোস্ত—পিঠের ওপর একটি চাপড় পড়ল চানাচুরওয়ালার। সে চমকে উঠল, দেখল লগন এসেছে। গালের পানটাকে দুবার চিবিয়ে লগন বলল, মালটা খাসা মাইরী। এখনও হাত পড়েনি মনে হচ্ছে।

ছোড় বে হাত পোড়েনি।—প্রতিবাদ ক'রল চানাচুর বিক্রেতা।

কাহে বে—এবার লগনের ভাষা বদল হ'ল, তার বন্ধুকে বোঝাবার জন্যে হিন্দিতে সে বলল, চিনিস না ওকে? পার্কের পাশে থাকে বুড়ির মেয়েরে—। বুড়ি শালা, কুকুরের মত আগলায়।—গালাগালিটা সে কাউকেই দিল না, কেবল একটা অস্তর্ষতি হিসেবে ব্যবহার ক'রল মাত্র।

আ বে কমবখত্ আমার নাম লালতাপ্রসাদ। আমি শালা অমন বহুত দেখেছি—এবার চানাচুরওয়ালা পুরোপুরি নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার ক'রল।

ছোড় বে, রাণ্ডীখানা যানেওয়ালা ক্যা ঝাঁট জানে গা—তুরন্ত প্রতিবাদ ক'রল লগন, তারপর নিজের কথার প্রমাণ দিতে বলল, আমাদের মালখানার কাছেই ওরা থাকে, কাল্লুরাম অনেক চেষ্টা ক'রেও হাত লাগাতে পারে নি। তবে তখন অমন জোয়ানী ছিল না। এবার জেল থেকে এলে কাল্লুরাম মাগীকে ছাড়বে না। বুড়ীকে খুন ক'রে নিতে হলেও নেবে।

লালতা একটু ভাবিত হয়ে বলল, তোদের কাল্লু সর্দারের আসতে তো এখনও দেরী আছে—।

আর তিন মাস—।

কি ভেবে বলল—আসতে দে।—তারপর প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বলল, তুই আজ কাজে যাস নি?

মাসের শেষ তো বাজার খুব খারাপ। সন্ধ্যের দিকে বেরোব যদি কিছু হয়। কাল এক শালার পকেট থেকে বেশ মোটা দেখে একটা ব্যাগ তুললাম শালা নিয়ে গিয়ে দেখি শুধু খুচরো পয়সা আর কাগজ।

তবে তো মেহনৎই বেকার হ'ল।

আর বলিস কেন। এই জন্যেই আজকাল আর ইচ্ছা করে না এলাইনে কাজ

করতে। রামনাগিনা শালা ছিনতাই পার্টিতে চলে গিয়ে অনেক ভাল ক'রেছে।

রামনাগিনাকে অনেকদিন দেখি না।

দেখবি কি এখন আর সে এখানে থাকে? একটা ভদ্দরলোকের মেয়েকে ফুসলিয়ে ইলোপ ক'রেছে তাকে একটা ঘর ভাড়া ক'রে রেখেছে বউবাজারে।

কি বলিস বে!

হাঁ দোস্ত।

ভদ্দরলোকের মেয়ে!

হাঁ বে। ইস্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে। তবে আসলি মজা শোন। মেয়েটাকে ইলোপ করার আগে আমাদের সঙ্গে থাকার সময় নাগিনা একবার হঠাৎ ধরা পড়ে ক'দিনের জেল হয়ে গেল। তখন লালাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে সে গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে দেখা ক'রে বলল, অফিসের কাজে নাগিনা বোম্বাই গেছে এই চিঠি দিয়ে গেছে তার হাতে। ব্যস্ মেয়েটাতো শুধু বাঙলা ইংরাজী জানে হিন্দী জানে না, লালাই পড়ে দিল চিঠিটা। আসলে লালারই লেখা। যতদিন নাগিনা জেলে ছিল লালাই তুতিনখানা চিঠি লিখে লিখে দিয়ে আসত নাগিনার নামে।

শালা বড় চালাক তো!

এই রকম ক'রে মেয়েটাকে পগালো তো।

তাই তো শুনছি।

রোজগারও নাগিনার ভালই চলছে শুনেছি আজকাল।—লগন থামল, তারপর বলল, আমিও ভাবছি ওদের লাইনে চলে যাব। শালা যার পকেটে হাত দিই ফাঁকা। মাসের প্রথম তিনচারটে দিন যা রোজগার বাকী দিনগুলোর কোন ভরসা নেই।

নাগিনাদের দলে গিয়েই বা কি সুবিধে হবে?

আগে থেকেই মালের খবর পাওয়া যাবে, সলিড খবর ব্যস্ ঝট্ ক'রে গিয়ে কাম ফতে ক'রে কাট্। দিনকতক ঘুম আর মালটানা শালা মৌজসে।

তুই তো আজকাল মালটাল খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিস—

কে তোকে বললে বে?

কই আর তো একদিনও খাওয়ালি না!

চল আজই হবে—জামার তলায় পেটের কাছে লুকিয়ে রাখা দেশী মদের একটা পাইট বোতল টেনে বের ক'রল লগন। বলল, চালাবি তো চল।

দ্বিরুক্তি না ক'রে এহেন লাভের উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে দিল লালতা। এবং দুজনে এসে রাস্তার ধারের বহু পুরানো ফুল না ধরা কাঞ্চন গাছটার সামনেকার হরিরামের পানের দোকানে দাঁড়াল। লালতা তার মাতৃভাষায় বলল, আবে

হরিরাম, সোডাবালা।

লগনের হাতের বোতলটাকে লক্ষ্য ক'রে হরিরাম একটা সোডার বোতল আর দুটো কাঁচের গ্লাস এগিয়ে দিল, মুখের পানের পিচটা গিলে ফেলে বলল—বে এ লগনুয়া, কা হুয়া রে হমারা ট্রানজিসটারুয়া ?

লগন হরিরামের দিকে নজর না দিয়েই বলল, মিলি রে বেটা ও তোকেই মিলি। আর কথা বলার সময় নেই তার তাই সে বাক্যব্যয় না ক'রে গাছটার তলায় লালতার মুখোমুখি বসল। দু চারজন লোক চলছে রাস্তায়। এ পথটায় এ সময় জনসমাগম অপেক্ষাকৃত কম। যারা চলে নিজের কাজেই চলে অন্ত দিকে নজর থাকে না থাকলেও কারও কোন অসুবিধে করে না। নির্ঝঞ্ঝাট বলে তাই লগন বেশ ভ্রূক্ষেপহীন ভাবেই দুই গ্লাসে সোডা ঢেলে দেশীয় সুরা-সংযোগে লালতার সঙ্গে পান ক'রতে মনঃসংযোগ ক'রল। অবশেষে বোতলের তলানিটুকুও শেষ হলে বলল, শালা তেমন মৌজ হ'ল না।

লালতার ইতিমধ্যেই দুই চোখ রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল সে উবু হয়ে বসে জানতে চাইল, কাহে বে ? আভি যব উস মাগীকো মিলেগা তো উসকো বুড়মে ভর দেঙ্গে—পাছাকোমর সামনে পেছনে দুলিয়ে বসে বসে রতিক্রিয়ার বিশেষ একটা ভঙ্গী প্রদর্শন ক'রল লালতা।

লগন উৎসাহিত হয়ে কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে হাত দিয়ে একটি অতি অশ্লীল ভঙ্গী ক'রে বলল সে পেলে ফাটিয়েই দেবে। এই সংকল্পটুকু প্রকাশ ক'রে আর দাঁড়াল না লগন গ্লাস দুটো এবং দুটো বোতলই হরিরামকে ফেরৎ দিয়ে কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে পূবমুখে হাঁটা ধরল। লালতার তখন নেশাটা জমে আসছে, তাই সে মৌতাতটুকু ভোগ করবার জন্তে চুপচাপ বসে রইল কারও সঙ্গে কিছু বলল না, এমন কি লগনের দিকে একবার চেয়েও দেখল না।

সেদিন বিকালে রেখার মা সবজি সংগ্রহে বাজারে যেতেই রেখাও আর একদিকে বেরিয়ে গিয়েছিল ফিরে এল বেশ কিছুক্ষণ বাদে, এল হাতে এক ঠোঙা খাবার নিয়ে। সীতার দিকে চোখ পড়তেই দুটো ভাঙা ভাঙা জিলিপি আর দুটো নিমকি সিঙাড়া তার হাতে দিয়ে বলল, মদনরে একটা দিয়ো আর তুমি খাও মাসী।

মদন তার বাপের সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছে, তাই টিনের কৌটোর মধ্যে জিলিপি দুটো আর সিঙাড়াটা চাপা দিয়ে রেখে নিমকিটা মুখে দিয়ে খেতে খেতেই পুলকিত সীতা জানতে চাইল, ইসব কোথা পেলা ?

রেখার তখন চোখে মুখে পরম তৃপ্তির আমেজ কারণ মুখের মধ্যে গোটা একটা সিঙাড়া। অর্ধনিমিলিত চোখ খুলে সে মুখের খাদ্য চর্বন শেষ ক'রে

জানাল, মেঠাইওয়ালারে মা মন্দ কইলে কি হইব লুকটা ভালই।—কোনক্রমে বাক্য শেষ ক'রে আর একটা নিমকি মুখে ঢুকিয়ে দিল। সীতার মুখে গলিত নিমকির ভগ্নাবশেষ ইতস্তত পিষ্ট এবং মনে লোভ, মুখ নড়তে লাগল তারও। তার কথার জবাবে রেখার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সে রেখার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এবং যতক্ষণ না রেখার ঠোঙ্গার ভাঙ্গা চোরা চোরা খাবার ক'টা শেষ হয়ে গেল ততক্ষণ দুজনের একজনও কোন কথা বলল না। রেখা প্রথম কথা বলল ঠোঙ্গার শালপাতার গায়ে লেগে থাকা ভাঙ্গা ভাঙ্গা নিমকি সিঙ্গাড়ার অতি সূক্ষ্ম অংশ গুলোয় আঙুল ঠেকিয়ে তুলে তুলে সেগুলো জিবে দিতে দিতে! বলল, খুব ভাল খাইলাম।

তোমার মার জন্যে রাখলে নি? সীতা জিজ্ঞেস ক'রল।

আরে বাবা। মারে খাইতে দিলে আমারে আর রাখব নি?—হাতের ঠোঙ্গাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিঃসংশয় হয়ে সেটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে বলল, একেই মায় মিঠাইওয়ালারে দেখতে পারে না। আবার যদি শুনে হ্যায় খাবার দিছে তাইলে আর বাচাইব না আমারে।

মেঠাইওয়ালা মানুষ তো ভালই লাগতেছে—?

হ ভালই তো। কিন্তু জান মাসী মায় অরে ছ্যাখতে পারে না।

কেন?

রেখার মুখে অন্য একটি ভাব ফুটে উঠল। সে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলল, আমারে লুকটা ভাল পায় কিনা।

রেখার কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে অবুঝ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সীতা। এতদিন আছে কিন্তু এখনও রেখার অনেক কথার বোঝে না। প্রথম প্রথম ওদের ভাষা একেবারেই বুঝত না এখন তো তবু অনেকই বোঝে। রেখা সীতার মনের খোঁজ পেল না সে নিজের আনন্দেই মগ্ন। মিঠাইওয়ালা তাকে দেখেই ইশারা ক'রে ডেকে এতগুলো খাবার দিয়েছে একি কম কথা! না চাইতেই এত চ'ইলে না জানি আরও কত দেবে। মার ওপর আজ একটু রাগই হচ্ছে—মা সকলকেই খারাপ বলে, কাউকেই দেখতে পারে না।

সন্ধে তখন সবে হয়েছে সীতা গঙ্গানামক খালের ধারে অকারণেই ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট চারিদিকে, বিশেষ ক'রে ঘুপচি ঘাপচিগুলো তো বেশ ভালরকমই অন্ধকার। হঠাৎ সীতার মনে হল ভাঙ্গা স্নানঘাটটায় রেখার মত কে যেন দাঁড়িয়ে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে না! ভাল ক'রে দেখে বুঝল জাম রঙ শাড়ী পরা মেয়েটি সত্যিই রেখা বটে। ঔৎসুক্য প্রবল হলেও কাছে গিয়ে পুরুষটিকে চেনবার এবং কথা

শোনবার সাহস হ'ল না তার। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মগোপন ক'রল। সেখানে তার কোন দরকার না থাকলেও কি এক আকর্ষণে তাকে আটকে থাকতে হ'ল। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে যদি কিছু শুনতে পায়।

অস্পষ্ট দু একটা শব্দ শুনতে পেলেও কথা একটিও বুঝল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখল লোকটি চলে গেল আর রেখাও চলে এল এদিকে। সে সামনে এসে পড়তেই সীতা জিজ্ঞেস ক'রল, লোকটা কে গো?

সন্ধ্যাকালের স্বাভাবিক নিয়মে পথের ধারের বাতিগুলো একসঙ্গেই জ্বলে উঠল আর নিকটস্থ আলোটির অনুগ্রহে দেখা গেল রেখার মুখের উচ্ছ্বলতা। সীতার প্রশ্ন শুনে কিছু পুলক কিছু বিস্ময় এক সঙ্গে মিশ্রিত হ'ল, তারই প্রতিচ্ছায়া পড়ল মুখমণ্ডলে। হঠাৎ একটা খুশীর ছায়া এসে মুখে ছড়িয়ে পড়তেই রেখা কলতানের মত বলে উঠল, ওই তো মিঠাইওয়ালা। মানুষটায় যে কি তোমারে কি কমু মাসী। আমাগো ঘরের সামনে গেছে আমারে ডাকতে। মায় থাকলে গালাগালি দিয়া কিছু থুইতো নি? অরে আইতে দেইখা আমি তাড়াতাড়ি এই দিকে আইয়া পড়লাম।

ওবেলাকার খাদ্যের স্মৃতি মনে পড়তে সীতা তাড়াতাড়ি বলল, মেঠাইওলার সঙ্গে কথা বললে তো খাবার চাইলে না কেন?

চামু ক্যান, নিজেই দিবো থন—সগর্বে জবাব দিল রেখা।

ও ব্বাবা, চাইলে কি মান ক্ষয়ে যাবে? সীতা একটু বিদ্রূপ ক'রল।

মান যাইব কি হইব তোমার তাতে কি?—রেখা দপ ক'রে জ্বলে উঠল, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি গিয়া চাও না।

তোমার সঙ্গে অত ভাব বলেই বলছি! আমরা চাইলে ভাঙা জিলিপির একটা টুকরোও দেয় না আর তোমাকে ঠোঙা ঠোঙা খাবার দেয়—।

বেশ করে দেয়।

রাগ ক'রছ কেন? আমি তো রাগ করার কথা বলতেছি না—।

রেখা আর কথা বলল না। সীতা রেখাকে রাগাতে চায় না বলে বলল, লোকটাকে অমন বাগ মানালে কি ক'রে বাপু?

রেখার অসন্তুষ্টি কিছুটা দূর হয়েছে মনে হ'ল। সে পরিহাস ক'রে বলল, সব কথা তোমারে কইয়া দিমু ক্যান? আমার গোপন কথা কইয়া ফালাইলে চলে?

তা তো ঠিকই।

তবে?

নিজেদের এলাকায় ফিরে এসে দেখল রেখার মা অনেক আগেই এসে পড়েছে। ফুটপাথের ওপর কতগুলো পচা কুচো মাছ রয়েছে পড়ে। রেখা বুঝল এগুলো জুটে যাওয়াতে খুশী মনে তার মা আজ আর বাজারে বেশী থাকে

নি। ভাবল আজ না জানি তার বরাতে কত দুঃখই আছে। বেশ একটু ভয় মনে নিয়েই সে তার মার সামনে গিয়ে বসে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এতটা অন্ধকার পর্যন্ত সে কোথায় ছিল তার মা তা জানতেও চাইল না। রেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল কদিন আগেও বেশ রাত্তির হয়েছিল রেখার ফিরতে কিন্তু ওর মা কিছু বলে নি। মার দিকে একবার তাকাতেই শুনল, মাছগুলি ধুইয়া রাইন্ধা ফালা র‍্যাখা। দুই পয়সার হলুদ মশল্লা কিন্যা নিয়া আয়।

রেখা চলে গেলে একটা কৌটো টেনে নিয়ে বসল রেখার মা। আজ আর রুটি ক'রবে না যেটুকু চাল আছে ওই দিয়েই ভাত রান্না হবে। কতদিন বাদে একটু মাছ জুটেছে, ভাত না হলে কি মাছটুকু খেয়ে তৃপ্তি হয়—। কৌটো খুলে ফুটপাথের ওপর চাল ঢেলে রাস্তার আলোতে বাছতে লাগল। রেখা মশলা আনতে গেছে, আগেকার দিন হলে বুড়ি মেয়েকে পাঠাতই না। তখন মেয়েকে আগলে চলার চেষ্টা করত এখন করে না। তখনও স্বপ্ন ছিল আবার ঘরে ফিরবে, মেয়ের বিয়ে দেবে—এখন আর ঘরে ফেরার অসম্ভব স্বপ্ন নেই মেয়ের ঘর বাঁধবার কল্পনাও আজ আর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মনে আসে না। তাই অনর্থক নিষেধে বন্ধনে বিব্রত হতে চায় না বুড়ি। অনেকটা নিষ্ক্রিয়তাই পেয়ে বসেছে তাকে। কিছুটা যা হয় হোক ভাব। তবে সেটা এত স্পষ্ট নয় যে রেখা বুঝবে, আর বোঝে না বলেই মাকে তার আড়াল ক'রে চলা।

সারাদিন ধরে সমানে বৃষ্টি হয়ে সন্ধের দিকে একটু কমলেও টিপ টিপ ক'রে ঝরতেই লাগল। পূব দিকের রাস্তার ওপর দিকে কিছুটা গিয়ে প্রথম যে গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ীটা আছে ওরই নিচে এসে সকাল থেকেই জমেছিল নিরঞ্জনরা, রেখারা, এবং আরও নারী পুরুষ সবই পরান্নজীবী। চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসেছিল সবাই, দু চারজন যুবক গল্পসল্প ক'রছিল বাকী প্রায় সকলেই ঝিমোচ্ছিল। সারাদিন বর্ষণে লোকগুলো যেন বসে থেকেই ক্লান্ত। নিরঞ্জন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল রাতের মধ্যে এ বৃষ্টি ছাড়বার সম্ভাবনা নেই। অসহায় অবস্থায় দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে সে কালযাপনের প্রতীক্ষায়। সারাটা দিন আজ একটা পয়সাও পাওয়া যায় নি, এই বৃষ্টির মধ্যে কে আর পথে বেরিয়েছে ভিক্ষে দেবার জন্যে? সকালবেলায় যে সময়টা রোজগার সেই সময় যেন বৃষ্টির তাণ্ডব একবারে আকাশ ভেঙ্গে নেমে এসেছিল। তবু দু চারজন নিশ্চয়ই এর মধ্যেই এসেছে মায়ের মন্দির দর্শনে, নিশ্চয়ই দু চারজন ওর মধ্যেই পয়সা চেয়ে দানগ্রহণ ক'রে দর্শনার্থীদের পুণ্যার্জনে সাহায্য ক'রেছে; এমনি সব আকাশপাতাল ভাবছিল নিরঞ্জন। তাকিয়ে দেখল পাশটিতে দেয়ালে

ঠেসান দিয়ে সীতা ঘুমিয়ে পড়েছে, মদনও তার কোলে মাথা রেখে গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে। নিরঞ্জন ভাবল অমনি একটু ঘুম এলে মন্দ হ'ত না, সারাদিন খাবার যোগাড় না ক'রতে পারায় বা রান্না ক'রতে না পারার জন্যে খাওয়া হয়নি বলে খিদেটা পেটে বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে, গলা দিয়ে কেমন জল জল উঠছে মুখে। শরীরটাও বেশ দুর্বল লাগছে এখন। নাঃ এখন কিছু না খেলেই নয়। সীতার এবং তার অবস্থানের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে ছিল ওদের গৃহস্থালীর সামগ্রী। একটা কৌটো খুলে নিরঞ্জন দেখল সামান্য কিছু ডাল মেশানো চাল তলায় পড়ে আছে। তাই এক মুঠো তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোতে আরম্ভ ক'রল। কতক্ষণে বৃষ্টি থামে কে জানে পেট আর সইতে পারছে না। কৌটোতে সামান্যই আছে, তবু আর একমুঠো তুলে নিল নিরঞ্জন, অতি সাবধানে বহুচেষ্টিত নিঃশব্দে কৌটোটা যথাস্থানে বসিয়ে রাখল, যেন সীতা শব্দ না পায়, জেগে না ওঠে। সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখল, নাঃ নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন সীতা। আর এক মুঠো খাবে না কি? না, তাহ'লেই ফুরিয়ে যাবে, আর ধরা পড়লে বরাতে অজস্র গালাগালি। ধরা না পড়লেও অবশ্য গালাগালি চলবে তবে তা গিয়ে পড়বে কল্পিত কোন চোরের ওপর, তার ঘাড়ে নয়।

বউটা যেন কেমন হয়ে গেছে। সেদিনের মত আর নেই। গ্রামের দিনগুলোর সীতা যেন শহরে এসে আস্তে আস্তে কেমন বদলে গেল। আগে নিরঞ্জন কত মুখ ক'রেছে—সীতা রাগটি করে নি আর আজ কথায় কথায় মুখ-ঝামটা দেয়, কথা শোনায়, সে কত কথা। এক এক সময় নিরঞ্জনের কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করে—তারপর শান্ত হয়ে ভাবে কোথায় যাবে? এর পরে তো আর যাওয়া নেই। বেঁচে থাকার শেষ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে মৃত্যু, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। ভাল তো কিন্তু তা হচ্ছে কই? খুব সামান্য সময়ই এইসব মৃত্যু চিন্তা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, সে ওই খোঁটা শোনার পরের কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। তারপরই খেতে চায় এবং খায় নিরঞ্জন, খায় ভবিষ্যতে আবার খোঁটা খাবার জন্যেই, আর খায় বেঁচে থাকবার জন্যে কারণ সত্যিই সে মরতে চায় না। একটু আগে চেয়েছিল, সে ভুল ক'রে চেয়েছিল।

যেদিন খাওয়া একটু ভাল হয় অর্থাৎ সাত কুড়ানো বাসি না খাইয়ে ভিক্ষের চাল রান্না ক'রে খাওয়ায় সীতা, সেদিন নিরঞ্জন নতুন ক'রে সীতার কথা ভাবতে বসে। সীতার জন্যে অনুকম্পা হয়—আহা ওই বেচারীই তো সব জোগাড় ক'রে এনে খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সকলকে। নিরঞ্জন নিজে তো আজকাল আর বিশেষ কিছুই ক'রতে পারে না, পেটের যন্ত্রণা কম থাকলে এক জায়গায় কাপড় বিছিয়ে বসে থাকে। বড়জোর লোকজন চলতে দেখলে, পুণ্যার্থীর ভিড় দেখলে একটু জোরে জোরে বলতে থাকে—দুদিন খাইনি

বাবা, মা সকল একটা পয়সা দে যাও মা—। অত চেয়ে চেঁচিয়ে একটা দিনও সীতার চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারেনি। কাজেই রোজ এইভাবে তিনজন লোকের খাবার জোটাতে যে সীতাকে কি পরিশ্রম করতে হয় ভেবে নিরঞ্জন অনুকম্পাপ্রবণ হয়। ভাবে, নেহাৎ উপায় নেই বলেই সব সইতে হচ্ছে; ভগবান এমনি করল, সীতার ভাগ্যটাকেও যদি একটু ভাল ক'রত তা'হলেও হত। তাও নয় দুজনের ভাগ্যই একবারে সমান। এসব ভাবনা সেদিনের যেদিন শরীর এবং মন ভাল থাকে; আজকের ভাবনাটা অন্য। বিশেষ ক'রে এই সারাদিন বৃষ্টির দরুণ নতুনতর অসহায়তা বড়ই ম্লান ক'রে রাখছে তাকে। বিস্বাদ ডাল মেশানো চালগুলো চিবানো প্রায় শেষ ক'রে একটু জলপানের কথা ভাবল নিরঞ্জন। চারপাশে তাকাল এদিকটায় কোন সরকারী কল আছে কিনা দেখবার জন্যে, দেখতে পেল না। কেবল নজরে এল সীতার ওপাশটায় শুয়ে রেখা ঘুমোচ্ছে আর তার মা বসে বসে ঢুলছে, ঢুলে ঢুলে পড়ছে। আরও উত্তরদিকটায় অল্পবয়সী ছোকরাগুলো গোল হয়ে বসে জুয়ো খেলায় মগ্ন। বিড়ির ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে আছে। মদনের চেয়ে একটু বড় ছেলেরাও গিয়ে ভিড় ক'রেছে, মদনও আর কিছুদিন বাদেই হয়ত জুটে যাবে ওদের দলে। ছেলেটা মোটেই যেন ডাগর হচ্ছে না। এই বয়সে অন্য ছেলেরা কত বড় হয়ে যায় আর মদন যেন বাড়ছেই না যত বড়টা ছিল তত বড়ই থেকে যাচ্ছে। তা হবেই বা না কেন? খেতে না পেলে গায়ে মাংস লাগবে কোথায় থেকে, বাড়বেই বা কি ক'রে? আসে পাশে যে সব ছোঁড়াগুলো ঘুরে বেড়ায় ওই যারা বসে বসে জুয়া খেলছে সবই তো প্রায় ওই রকম। একমাত্র রাজেশদের দলের ছোঁড়াগুলোর চেহারা যা ভাল, তার কারণ পথিকজনের অন্যমনস্কতার সুযোগে তাদের জিনিষপত্র নিয়ে চম্পট দেবার ব্যবসা ওদের, আয় ভাল, খায়ও ভাল।

সন্ধে বেলা ঘুম থেকে উঠে মদন খাবার জন্যে বায়না ধরে কান্না জুড়ে দিল। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে তার—সহ্য ক'রতে পারছে না। মদনের গতিক দেখে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। সীতা চোখ মেলে মদনকে কাঁদতে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দিল—বিষ্টি থামুক। কিন্তু মদন কোন কথা শুনবে না, এখনই তার খাবার চাই। ঘ্যানঘ্যান ক'রে সীতার কানে ব্যথা ধরিয়ে তোলার উপক্রম ক'রতে সীতা খিঁচিয়ে উঠল, তবে আমায় খা ক্যানে রাক্ষস। আমাকে খেতে এসেচ। আমাকে খাবে তবে মরবে। মর, তাই খা, খেয়ে মর।

মদন তখন ক্ষুধায় বিক্ষুব্ধ, সে প্রতিকার বোঝে মায়ের অসহায়তা বোঝে না, তাই সে খাদ্যের দাবীকে তীব্রতর করবার জন্যে তার কাঠির মত সরু

লিকলিকে হাত দুটো দিয়ে তার মাকে সমানে আঘাত ক'রতে লাগল। আঘাতে বিব্রত হয়ে সীতা সজোরে একটা কড় বসিয়ে দিল মদনের গালে। অমনি মদনের চিৎকার দ্বিগুণ পর্দায় উঠে পড়ল। নিরঞ্জন তখনও ঘুমের ভান করে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

রেখা এতক্ষণ ব্যাপারটা তেমন বোঝেনি এবার চিৎকারের প্রবলতায় অনুধাবন করার চেষ্টা ক'রল, কি হইছে লো মাসী ? অরে মারলা, ক্যান ?

কথার জবাব দিতে গিয়ে সীতা কেঁদে ফেলল। কান্নার চোটে কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। চোখের জলের চাপ একটু কমলে জানাল— সকাল থেকে ছেলেটা কিছু খায় নি, তাই খাব খাব করতেছে। এখন আমি এই বাদলার মধ্যে কি খেতে দি বল তো ? কাছে কি এট্টা পয়সা আছে যে কিনে নে এসে খাওয়াব ? বলেই আবার মনের বেদনার উচ্ছ্বসিত কান্নায় প্লাবিত হ'ল সীতা।

সীতার কথা শুনে রেখা নিমেষ মাত্র না ভেবে কোমরে গুঁজে রাখা আঁচলটি খুলে একটা দশপয়সার মুদ্রা মদনের হাতে দিয়ে বলল, যা কিছু কিন্যা খা, গিয়া।

পয়সাটার দিকে চোখ পড়তেই মদন বাঁ হাতের পেছনের পিঠ দিয়ে ঘষে চোখের জল মুছে ফেলার চেষ্টা ক'রল! তাতে তার হাতের ময়লার জমে থাকা চাপ একটু ধুয়ে গিয়ে খুব সামান্য জায়গা সাদা মত দাগ হয়ে গেল। ডান হাত-খানা বাড়িয়ে পয়সাটা নিয়েই মদন বৃষ্টি ঝরা রাস্তায় নেমে গেল। মোড়ের ও পাশের দোকানগুলায় আলো জলছে সেই আলো তার লক্ষ্য।

সারাদিন ঘুমানোর ফলে রাত্রের দিকে সীতার কিছুতেই ঘুম আসছিল না ; আর একটি কারণও অবশ্য ছিল—ক্ষিধে। প্রচণ্ড ক্ষিধে তার পেটটাকে ভেতরে ভেতরে এমন ভাবে মোচড়াচ্ছিল যে ঘুম তো দূর স্থিরভাবে শুয়ে থাকাই যেন অসুবিধের হচ্ছিল তার পক্ষে। ফলে সে কখনও চোখ বুঁজে পড়ে থাকছিল আবার কখনও বৃষ্টিধরা মেঘলা আকাশটা দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। সারাদিন ধরে এমনি অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পরও আকাশ যে কি ক'রে এমন থমথমে আছে তাই সে ভাবতে চাইছিল। হঠাৎ তার পাশে খুট ক'রে একটু শব্দ হতেই বন্ধ চোখটা খুলল সীতা দেখল, রেখা মুখ উঁচু ক'রে উত্তরদিকে কি যেন দেখে নিয়ে ফের শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সীতার কানে এল রেখার ওপাশে বুড়ির নাক ডাকার শব্দ। নাক ডাকছে এপাশে আরও ক'জনের। সীতা নাসিকা-গর্জন শুনতে লাগল একমনে। তন্দ্রা এল তার।

বেশ কিছুক্ষণ পর অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল সীতার। তার মনে হ'ল সে যুধ্যমান দুই মল্লের নিশ্বাসের শব্দ শুনছে স্বপ্নে। অনুভব ক'রছে

তাদের দেহ ঘর্ষণের অমর্ষী শ্বসন স্বর। আকস্মিক এই স্বপ্নের স্বাদে তন্দ্রা ছিন্ন হ'ল তার, এবং সে অনুভব ক'রল স্বপ্ন নয় তার পেছন দিকে রহস্যকর এমন এক শব্দ উঠছে যাকে শীৎকার হিসেবেই সে জানে। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে সে কিছু অনুভব করার চেষ্টা ক'রল তারপর প্রচণ্ড কৌতূহলে তার স্তনের ওপর থেকে মদনের ছোট হাতটা নামিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পাশ ফিরে শুতে তার বুকের রক্তে যেন টাইফুনের সঞ্চার হ'ল। দূরের বাতির অস্পষ্ট আলোয় মানুষ চেনা না গেলেও স্পষ্ট সে বুঝল একটি পুরুষ রেখার সমস্ত দেহকে জুড়ে শুয়ে সমস্ত শক্তিতে দেহ সঞ্চালন ক'রছে। আর তার সহর্ষ ক্লান্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে রেখার শীৎকার ধ্বনি মিশে অদ্ভুত এক শব্দ মণ্ডল রচনা ক'রেছে সেখানে। সীতার কানের দুপাশে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত মুখমণ্ডল গরম হয়ে উঠল। সমস্ত দেহ যেন প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে নিজের বুক দু হাতে চেপে ধরে চোখ বুঁজে রইল কিন্তু সম্ভব হ'ল না। বুক থেকে হাত সরিয়ে দুই কান বন্ধ ক'রতে চেষ্টা ক'রতেই রেখা কাঁপা কাঁপা স্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে কি যেন বলার চেষ্টা ক'রল। অল্পক্ষণ পরে লোকটি যখন উঠে চলে গেল তখন একজন তৃপ্তিতে আর একজন অস্থিরতায় ছটফট ক'রছে। কেউ কোন কথা বলল না কাউকে, সীতার মনে হ'ল এইজন্যেই তবে সন্ধ্যে বেলায় সীতাকে একটু সরে শুতে বলে দুজনের মাঝখানে জায়গা রেখেছিল রেখা! বাকী রাতটুকু ঘুম এল না তার, কতবার যে এপাশ ওপাশ ক'রল তার হিসেব নেই।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতে দেখল তখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকটায় রেখার মা তখনও শুয়ে আছে, রেখা নেই। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশ্যে গঙ্গার দিকে রওনা হ'ল সীতা, এই অন্ধকারের ভাব থাকতে থাকতে গিয়ে হাজির হতে পারলে তবেই সারাদিনের কর্মটি সমাধা করা সম্ভব। শত তালি দেওয়া কাপড়টিকে যথাসম্ভব গায়ে জড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগল সীতা। গঙ্গার ঘাটে পৌছে ওই দিকটায় নির্জনতার সন্ধানে চলতে চলতে দেখল লোকের যাতায়াতের পথেই কে যেন একটা—উবু হয়ে বসে গেছে। অস্ফুট স্বরে তার উদ্দেশ্যে কটূক্তি ক'রল সীতা। মোটেই এদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, কেন বাবা আর একটু ওপাশে গেলেই তো পারিস কিংবা জলের ধারে—। ঘাটের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে রেখার গলা শুনতে পেল, মাসী যাও না কি ?

সীতার মনে রাতের স্মৃতি ঝলক দিতেই অকারণ বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। ওইটুকু মেয়ে! ছি ছি! এখনও বিয়ে থা হয়নি—সীতা এ ঘটনা ভাবতেই পারে না। তাদের গ্রামে থাকতে গঞ্জের বাজারের মেয়েদের কথা

শুনেছিল যারা অচেনা অপর পুরুষ মানুষকে দেহ দেয়, তাদের সবাই ঘৃণা করে, কেউ না কি কথা বলে না তাদের সঙ্গে। রেখাও তাহ'লে সেইরকম বাজারের মেয়ে হয়ে গেল! ছি ছি! তার সঙ্গে সীতাও কথা বলবে না। তবু একবার শব্দ লক্ষ ক'রে তাকিয়ে দেখল রেখা জলের ধারে বসে কাপড় ধুচ্ছে মনে হ'ল; সীতা আর একটু জোরে পদচালনা ক'রল।

অদ্ভুৎ এক সুখের স্মৃতি রেখার মনের চারিদিকে এক স্বপ্নময় পরিমণ্ডল রচনা ক'রে রেখেছে যেন। অমন সুন্দর স্বপ্নের স্বাদ যে অত শীঘ্রি মিলিয়ে যাবে এ রেখা ভাবতেও পারে নি। মেঠাইওয়ালা সরজুকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে রাখতে ইচ্ছে ক'রছিল। সে উঠে যেতে যে কি বিচ্ছিরি লাগছিল কি বলবে। লোকটা ইচ্ছে ক'রলে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারত তো! তা নয় হুট ক'রে উঠে যাওয়ার কি দরকার ছিল বাপু? সবাই তো ঘুমোচ্ছিল তখন, কে আর দেখতে গেছে? ভয় ছিল মা বুড়ি টের পাবে, পেলে আর রক্ষে রাখবে না। তা যা হোক টের সে পায় নি। সরজু খুব চালাক, মনে মনে খুশীর হাসি হাসল রেখা। কেমন পা টিপে টিপে এল, কেমন ওস্তাদের মত সব কাজ ওর।

রেখার মা ঘুম থেকে উঠে দেখল রেখা কি একটা গান যেন গাইছে। এই গানটা না কি হিন্দি, কতবার পুজোর প্যাণ্ডেলে কিংবা বিয়ে বাড়ীতে চোঙ দিয়ে বাজায় লোকে। বুড়ির কানেও গেছে, সে শোনে নি এবং বোঝেও নি। রেখাকে আজ গুণ গুণ ক'রতে শুনে সুরটা পরিচিত মনে হতেই বুঝতে পারল। তবে এই সাতসকালে উঠেই যে রেখার গানের সুর উথলে উঠল কেন সেই কথাটা বোধগম্য হ'ল না বুড়ির। তবু ভাবল, 'গাইক গিয়া। অমন বয়সে হগ্ গলভিরই অমন গুণগুণানির রুগ থাকে।' রেখার বয়সে তার নিজের তো বিয়েই হয়ে গিয়েছিল। আর রেখার বাবার গান যেন ছিল অফুরন্ত। শুধু কি মানুষটা নিজে গাইত, বৌকে পর্যন্ত ভাটিয়ালী সুর দু'একটা শিখিয়ে ছেড়েছিল। রাত বিরেতে চাঁদনী আলোর মরসুম পড়লে গাইতে হ'ত তাকে, গাইতে হ'ত, বন্ধুরে, তোমার লাগি মনের মাঝে উথালি পাথালি ঝড় —সত্যি বলতে কি গাইতে খারাপও লাগত না। সুর ঠিক হোক বা না হোক সমস্ত গানটুকু মনে থাকুক আর না থাক বড় রোমাঞ্চ জাগত সেই গানে। আর এই রেখার মত যে দু এক সময় গুণগুণ না ক'রেছে এমন নয়। কিন্তু মেয়ের বিয়ের কথা তো এখনও ভাবতেই পারে নি মা হয়েও। কাজেই বেচারী রেখা 'যদি নিজের মনের হাউসেই গান একটু গায় তো গাউক না।'

শুধু কি গান? একটা ছন্দ যেন রেখাকে ঘিরে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে আজ। কিসের ছন্দ জানে না রেখা, বোঝে না। 'অকারণ নৃত্যের সুখে পুলকিত তনু

তার বসন্তের বাতাস। প্রজাপতির পাখনার শিথিলতা তার মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রচেষ্টায়। দেখা দেবে না সে, ধরা দেবে না সে, স্পর্শ রাখবে না কোথাও। নিশীথ স্মৃতির ফুলটিকে ঘিরে সে চঞ্চল পাখনায় উড়ে বেড়াবে, ঘুরে বেড়াবে, তাতেই তার সুখ, তার চ্যুত কৌমার্যের রোমাঞ্চ, প্রথম শিহরণের বিস্ময়ের সুরভি।

সীতার মনের কটুস্বাদ ইনফ্লুয়েঞ্জার পরের মুখের অবস্থার মত। শুধুমাত্র ভাল না লাগা নয় রীতিমত খারাপ লাগছে তার, খারাপ লাগছে সমস্ত পরিবেশ, সব মানুষ। রেখা একটি রাত্রের মধ্যে চরম অপ্রিয় হয়ে গেছে এবং সে-ই যেন অপ্রিয় ক'রে তুলেছে সমস্ত আকাশ বাতাস বিশ্বপ্রকৃতি এবং সমস্ত মনুষ্য-কুলকেও। কাউকে, কিছুকে এবং কোথাও ভাল লাগছে না সীতার। চলে যাবে সে এখান থেকে। এখানে থাকলে লোকে তাকে বলবে কি? লোকে ছি ছি ক'রবে না? রেখার জন্যে ওকেও ভাববে না বাজারের মেয়ে বলে? না খেয়ে থাকা সহ্য হবে কিন্তু সে গঞ্জনা সহ্য হবে না। অন্য জায়গায় চলে গিয়ে যদি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারাও যায় তবু ভাল। আজই সে মদনের বাপকে বলবে আর কোথাও যাবার জন্যে। ওই যে ভাঙ্গড়ের বউটা কোথায় যাবার জন্যে বলছিল যেখানে তারা থাকে—। চাওয়ালার কাছে গিয়ে জমানো পয়সাগুলো নিয়ে আসতে হবে আজ, তাকেও বলতে হবে 'চলে যাব'। আহা লোকটা অনেক উপকার ক'রেছে। কাল রাত্রে যে লোকটা রেখার বুকের ওপর থেকে উঠে গেল তাকে চিনেছে সীতা, সে ওই মিঠাইওয়ালা। বয়সে বোধহয় রেখার বাপের মত হবে।' কি বদমাস লোকটা—। অথচ চাওয়ালাও তো আছে ওরই দেশের লোক অথচ আদৌ ওর মত নয়। কত ভাল, কত ভদ্র, সুন্দর।

ইদানীং আর বসে ভিক্ষে হচ্ছে না। ভিক্ষে যারা দেয় তারা বড়ই বাছ-বিচার সুরু ক'রেছে আজকাল। অন্ধ, খোঁড়া, অকর্মণ্য দেখে বেছে বেছে ভিক্ষে দিচ্ছে। আর যাদের শক্ত সমর্থ মনে ক'রছে তাদের ভাগ্যে সামান্যই জুটছে যাতে পেট চলে না। অথচ দিনের শেষে অন্ধ আতুরদের বেশ মোটা রোজগার। নিরঞ্জন কত কাতর ভাবে আবেদন জানিয়ে দেখেছে পুণ্যার্থীরা কর্ণপাত করে না, দু চারজন আবেদনের উত্তরে তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ মন্তব্যও না ক'রেছে এমন নয়। 'গতর খাটিয়ে খাও গে না বাবা' শুনে যদি সে বলছে 'বাবু ব্যারামের জন্যে খাটতে পারি না' তাতে জবাব পেয়েছে 'হ্যাঁ, বসে থাকার ব্যারাম ধরলে খাটা আর যায় না তা জানি।' ফলে সারাদিনের ঠায় বসে থাকার শেষে সামান্য কয়েকটা নিম্নতম মুদ্রা আর সারা-দিন চিৎকারের ফলে দৈহিক যন্ত্রণাই প্রত্যক্ষ ভাবে ফললাভ তার। কাজেই

নিরঞ্জন অনেকবার ভেবেছে এবং সীতাকে বলেছে, ইভাবে আর লয় বউ। আর চইলছে নে।

চইলছে নে তা জানি। কিন্তুক করা যাবে কি ?

সত্যিই তো কি যে করা যাবে তা আর ভেবে পায় না নিরঞ্জন। সীতা পেয়েছে। এখান থেকে চলে যাবে। ওই যেদিকের কথা ভাঙ্গড়ের বউ বলেছিল, কলকাতার সেই অন্য একদিকে।

দুপুরবেলা সেই কথাটা চা-ওয়ালাকে জানাতে যেতেই চা-ওয়ালার চোখ দুটো ওকে দেখে জ্বলে উঠল। ইদানীং গায়ের ছেঁড়া ব্লাউজটা খসে পড়েগিয়েছিল বলে ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়ীটা দিয়েই দেহ কোথাও জড়িয়ে কোথাও না জড়িয়েই রাখে সীতা। কোথায় ঢাকা আর ঢাকেনি কোথায় তার দিকে বিশেষ খেয়ালও থাকে না তার। তাই কাপড়ের আলগা আবরণের তলা থেকে তার চলার বেগে কম্পমান স্তনদ্বয়ের দিকে প্রথমেই চোখ পড়ল চাওয়ালার। সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে স্বগত স্বরে বলল, জওয়ানী দেখাই পড়তা। তার দেশীয় দোসর সামনের ফুটপাথে জোড়া করা বেঞ্চে বসে ভাঁড়ে চা একটি খাচ্ছিল চাওয়ালার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তাকিয়ে সে প্রশ্ন ক'রল, তোহার হ রে ?

মুখে কোন জবাব না দিয়ে কেবল মাত্র একটু চোখ টিপল চাওয়ালা।

এর কোন ঘটনাই সীতা লক্ষ করল না। সে সরাসরি গিয়ে চাওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাবু আমার ক টাকা হয়েছে ?

চারটাকা—।

চারটাকা—আপন মনেই সীতা উচ্চারণ ক'রল। তার স্বরে কিছু বিস্ময় ছিল, কিছুটা যেন সন্দেহ। কারণ সে যা টাকা দিয়েছে তা যে চার টাকার বেশী হবে এমনই একটা অনুমান ছিল তার। যখন যা পারত এনে দিয়ে যেত বলে হিসেব রাখতে পারেনি। তবু এটা ঠিক যে সে যত দিন ধরে টাকা দিচ্ছে তাতে আরও অনেক জমা হওয়া উচিত ছিল। টাকার অঙ্ক শুনে আর কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল সীতা। তার শুকনো মুখের দিকে একবারও তাকাল না চাওয়ালা। একটা ছাইমাখা লোহার শিক দিয়ে উনুনের কয়লাগুলোকে খুঁচিয়ে আগুনটাকে জোর করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিমর্ষস্বরে সীতা বলল, আমার টাকাটা দে দাও তবে।

এবার চাওয়ালা তাকাল জানতে চাইল, লিয়ে যাব ?

হাঁ নিয়ে যাব।

চাওয়ালা কি ভাবল, তেবে বলল, তেরা রূপেয়া আলাদা জায়গেমে রাখছি হামি। তু রাতমে আসবি কেতনা আছে হিসাব করিয়ে দিয়ে দিবে, হাঁ ? হামি তো আন্দাজসে একঠো বলিয়ে দিল।

হঠাৎ যেন আশা পেল সীতা, বলল, আচ্ছা। তাই তো বলি, টাকা অত কম হবে নে। দু গণ্ডা তো হবেই। তা কখন আসব?

দুকান বন্ধ হোনে কা টাইম।

সে তো অনেক রাত গো।—অত রাতে কোনদিন জেগে থাকে না সীতারা। কোনদিন দোকান বন্ধ হতেও তাই দেখেনি। জানে না কখন দোকান বন্ধ হয়, শুধু জানে অনেক রাতে তারা সব ঘুমিয়ে পড়লে এই চায়ের আর বিড়ির দোকানগুলো বন্ধ হয়।

রাত না হলে ক্যায়সে হোবে? দুকান বন্ধ না হলে টাকা দিয়া যাবে না।

বেশ তাই এসবো তবে।

আর শুন্।

বল—চলে যেতে যেতে ফিরে এল সীতা। চা-ওয়ালা বলল, হমার দোস্ত কি বলতেছে।

সীতা দোকানের সামনের লোকটির দিকে তাকাল, দোকানদার লোকটিকে বলল, বোল বে ক্যা বোলতা উসকি—।

তু হি বোল—লোকটি বলল।

নেহি তু বোল না বে!

এবার লোকটি সরাসরি তাকাল সীতার দিকে। লাল লাল চোখ দুটো তার ঠিক চা তৈরীর উনোনটির জলন্ত কয়লাগুলোর মত। সেই চোখের দিকে চাইতেই সীতার মনে হ'ল সে যেন ঝলসে যাচ্ছে। গ্রামে থাকার সময় সে শুনেছিল বিষ্টু মণ্ডলের চোখদুটো নাকি গাঁজা খেয়ে খেয়ে লাল লাল হয়ে থাকে। গ্রামের গেজেট পান্তাপিসী কথাটা বলত, সে নিজে কোনদিন দেখেনি, গ্রামে কোন পুরুষের চোখ দেখা সম্ভবও ছিল না। আজ সম্ভব হলেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা একবারেই অসম্ভব। সীতা চোখ সরিয়ে নিলেও লোকটি একদৃষ্টিতে সীতার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, রাতমে আয়গী?

কি বলতেছে?

চাওয়ালা একটু হেসে তার সঙ্গীর হয়ে বলল, রাতমে তোম্‌কে আইতে বোলতেছে।

কোথায় আসব?

ওর ঘরে। ওইদিকে বাগানবালী বাড়ীর জমাদার কটকের বগলমে উসকা কামরা আছে।

ওর ঘরে আমি আসব কেনে গো?

পয়সা মিলবে।

এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সীতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, আ মর মুখ

পোড়া, মুয়ে আগুন। তোর পয়সা থাকে তো র াড় রাখগে যা না।

কৃত্রিম ক্রোধ যে এটা নয় তা লোকটুটি বুঝল কারণ দেখেছে অনেক, রাগ কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দু রকমের সঙ্গেই পরিচিত, কাজেই রাগের রূপ দেখলে প্রকৃতি বুঝতে অসুবিধে হয় না। অসংকোচে সীতা এরকম গালাগালি দেবে এতটা আশা চাওয়ালাটা করে নি। ভেবেছিল এতদিনের যাতায়াতে নিশ্চয়ই মৌখিক রসিকতা করার মত ঘনিষ্ঠতা অন্তত সে অর্জন ক'রেছে। আর তার দেশোয়ালী হিসেবে বন্ধু সেজে সেন বাড়ীর দারোয়ানও সেটা করতে পারে। কিন্তু সীতার রুক্ষ এবং রূঢ় জবাব যেন সেই ভাবনার মুখে একটা তীব্র চপেটাঘাতের মত চটাস করে এসে পড়ল। এই ভিখিরী মাগীগুলোকে তো তার জানা শোনা অনেকেই ভোগ করে থাকে। যে যেটাকে ধরে নিতে পারে আর কি। এবং এমন পথনারী তো সে এই প্রথম দেখল যে অজেয়া। তার ধারণা ছিল না যে এরকম মেয়ে বাংলা মুলুকের রাস্তায় থাকতে পারে যে পয়সার জন্যে কোন পুরুষের কাছে আত্মদান করে না। এ তল্লাটের সেরা মালটিকেই সে হাত করার চেষ্টা ক'রেছে,আর মাগীটাও যেভাবে হেসে দিল্লাগী ক'রে কথা বলেছে তাতে তো তার নিজের প্রচেষ্টাকে সফলই মনে হয়েছে। তবে বোধহয় কোন কারণে আজ মন ভাল নেই, তাই হবে যার জন্যে এসেই টাকা ফেরৎ চাইল আর কিছু না বলে। যাক রাত্রে যখন পয়সা নিতে আসবে তখনই একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

বিকাল হতেই আবার বৃষ্টি এল আকাশ জুড়ে। সবাই হুড়মুড় ক'রে ছুটল আচ্ছাদনের সন্ধানে। কাল রাত্রে যেখানে শুয়েছিল সীতা আগে ভাগে সেইখানটা দখল করার জন্যে দৌড়ে গিয়ে হাজির হতে চেষ্টা ক'রল। গিয়ে দেখল তার আগেই বহু লোক জড় হয়েছে তার মধ্যে নিরঞ্জনও শুয়ে আছে। নিরঞ্জনের পাশে পুঁটলিটা ধপ করে নামিয়ে রাখল সীতা। শব্দ পেয়েও নিরঞ্জন ফিরল না দেখে সীতা অকারণেই গজ গজ ক'রে উঠল, দিন রাত খালি ঘুম আর ঘুম। এক কড়ার কাজ নেই আমি মাগী ভিক্ষে মেগে নে আসি আর মরদ আমার গতর নড়িয়ে খাবেন। দয়া করে খেয়েছেন তবে আর কি আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে!

যাকে শোনাবার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা সেই ব্যক্তিটি যে সেগুলো শুনতে পাচ্ছে এমন ভাব বোঝা গেল না। ফলে সীতার ক্রোধ গেল বেড়ে। সে প্রচণ্ড আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, মুয়ে আগুন অমন মিনষের।—তাতেও কোন ফল হল না দেখে আরও কিছুক্ষণ আপন-মনে গজ গজ করে নিজেই একসময় চুপ ক'রল। মদনটা তো আসেনি··· আবার কোথায় যে গেল ছেলেটা—দুপাশে তাকাল সীতা মদনকে পাবার জন্যে।

দেখতে চাইল কোন দিক থেকে সে আসছে কি না। রাস্তায় দুপাশেই সমানে জল ঝরছে আকাশ থেকে, উত্তর দিক থেকে কেবল একটা গরু আসছে ভিজতে ভিজতে, মদন নেই। গরুটা মাথা নিচু ক'রে এসে গাড়ীবারান্দার তলায় এক পাশে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করাতে ও পাশের লোকগুলো তাকে তাড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে নামিয়ে দিল। ভিজতে ভিজতে সে আবার রাস্তা ধরল অন্য কোন আচ্ছাদনের সন্ধানে। আবার রাস্তা ফাঁকা। না ফাঁকা নয় মোড ঘুরে একটা মোটর আসছে। খুব জোরেই আসতে আসতে রাস্তার মধ্যে জমে থাকা জল ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওঃ খুব বেঁচে গেছে সীতা, সামনের লোকটা মুখ গা মুছছে। সীতা আবাক হয়ে দেখল একটা মেয়েছেলে খুব ধীর পায়ে পাশের গলিটা থেকে বেরিয়ে এসে এক কোণে দাঁডাল, মাগীটার পেট বেধেছে। ভারে আর চলতে পারছে না। আর দুদিন বাদে নডতেই পারবে না। কিন্তু মাগীটাকে কিছুতেই চিনতে পারা যাচ্ছে না। কোনদিনই দেখেনি এর আগে, কোত্থেকে যে এসে সব জোটে! রেখা ছুঁড়িরও এমনি অবস্থা হবে। এখন খুব সুখ হচ্ছে একদিন হবে, অন্য কোথাও চলে যেতে হবে সেদিন ওকেও। এমনি করেই পেট নতিয়ে চলতে হবে। মরুকগে যাক, যার বুঝ সে বুঝুকগে কার তাতে কি? সীতা চারপাশে চোরাচোখে খুঁজল, রেখা আজ আসে নি, আজ হয়ত নাগরের ঘরেই শোবে।

ধারাবর্ষণের দৌরাত্মে সম্মুখের পথ নির্জন, দূরের আলোগুলো ঝাপসা। গ্রামের জীবনে সীতা পুরানো শাড়ীর ঘোমটার মধ্যে থেকে যেমন দেখত বাইরের দৃশ্য তেমনই। ফলে সন্ধ্যার পরই অন্ধকার। ওপাশের পথবাতিটার কি যে হয়েছে আজ কেবল জলছে আর নিভছে। কিছুক্ষণ নিভে থাকছে আবার হঠাৎ জলে উঠছে, আবার নিভে যাচ্ছে। মদনটা যে কোথায় গিয়েছে আসছে না। ছোঁড়াটার পা বেরিয়েছে আজকাল, ইচ্ছে হ'লে কখনও আসে না হলে আসে না। সীতা প্রথম প্রথম বকত আজকাল কিছু বলে না। যেখানেই থাক পেটের সংস্থান নিজের ক'রে নেবে আর সামনে থাকলেই সীতাকে ভাবতে হবে। এই যে পুরুষ মানুষটা চুপচাপ মডার মত পডে থাকে যতই সীতা গালাগালি দিক খাবার ভাবনাও ফের ভাবতেই হয়। এর চেয়ে মদন ভাল, নিজেরটা ক'রেই নেয়। বরং চেপে ধরলে অনেক সময় দু' চারটে পয়সা তার কাছে পাওয়াও যায। যাক যেখানে থাকে থাক আরও রাত্ত ক'রে এলে ভালই হবে আর খেতে চাইবে না! কারণ চাইলে দেবে কোত্থেকে? অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে আজও দুটো চাল ফোটাতে পারবে না কোন জায়গায় কাজেই কি যে খাওয়া হবে রাত্তিরে তার কোন ঠিক নেই। নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখল সেই একই ভাবে সে পড়ে আছে, মরে-টরে যায় নি তো?

গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠ্যালা দিল সীতা, শুনতেছ ?

নিরঞ্জন জেগেই ছিল, সাড়া দিতে বোঝা গেল।

অমন ক'রে শুয়ে আছ কেন ?

পেটটা বড় মোচড় দিয়ে বেদনা ক'রতেছে—।

শুনে সীতার সহানুভূতি জাগল, বেচারা মুখ বুঁজে শুয়ে অমন যন্ত্রণা সহ্য ক'রছে ! তাছাড়া নিরঞ্জন কথাগুলো এমন আড়ষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রল যে বোঝা গেল কথা কটি বলতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। সীতার মনে পড়ল অনেক দিন হাসপাতালের দিকে যাওয়াই হয়নি ওষুধও খায় নি নিরঞ্জন। গিয়েই বা কি হবে ? ওষুধ তো কম দিন খাওয়া হ'ল না। কিন্তু ফলটা কি হ'ল ? কিছুই লাভ নেই। ইদানীং তো হাসপাতালের ছোট ডাক্তাররা না কি যে বলে ওদের কম্পোণ্টার না কি, তারা তো বলেই দিয়েছে বাইরে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। অনেক দামী দামী ওষুধ কিনে খেতে হবে। তারা আরও বলে দিয়েছে এ রোগের চিকিৎসা গরীবদের জন্যে নয়। ফলে সীতা বুঝেছে তাদের মত লোকেদের আরামের জন্যে চিকিৎসা হচ্ছে মৃত্যু। অন্য উপায় নেই। গ্রামে থাকতে ত্রিনাথের কবচ এনে পরিয়েছিল। জিতলীর মা মুকশেদ ফকিরের কাছে গিয়ে ধুনুচির ধোঁয়া দিতে বলেছিল তাও এগার দিন দিয়েছিল নিরঞ্জন, আসমান তারা বলেছিল দখনে ঠাকুরের মন্দিরের পুরোহিতের জলপড়া খেয়ে না কি সব রোগ ভাল হয়ে যায় তাও এনে এনে খাইয়েছে সীতা, হয়নি। যে যত রকম টোটকার সন্ধান দিয়েছিল সব ক'রেও কোন ফল পায় নি। তাই আজ কোথাও কোন সহায় খুঁজে পেল না সীতা, কোন নির্ভরতা নিয়ে যে নিরঞ্জনকে বাঁচাবার কথা ভাববে তা বুঝল না। বৃষ্টির জন্যে অন্ধকার। গভীর-তর অন্ধকারের দিকে তখন সীতার মন ডুবে যেতে লাগল।

অনেক দূরে একটা বাড়ীর তিনতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যেন জানালাটা খোলা। আসলে কাঁচের কপাট বন্ধ করা সেই জানালার আলোর দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। ওই ঘরটাতেও তো লোক আছে, এই বৃষ্টির ঝাপটা তাদের হাড়ে ঠাণ্ডা ধরিয়ে দিচ্ছে না, এই ঘন অন্ধকার মৃত্যুর স্তব্ধতা এনে দিচ্ছে না, নিশ্চয়ই ওদের পেটের মধ্যে এমনি যন্ত্রণা অহরহ উত্যক্ত ক'রছে না তাদের। আলোটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সীতার মনে হ'ল সকাল হলে সে হাসপাতালে যাবে, নিরঞ্জনকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে ক'রে। ওকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসবে, বরং ডাক্তারবাবুর হাতে পায়ে ধরে বলবে আরও ভাল এমন একটা ওষুধ দিতে যাতে লোকটা ভাল হয়ে যায়। ডাক্তাররা কি পারে না ? ইচ্ছে ক'রলে খুবই পারে তার স্বামীকে সারিয়ে দিতে ওই তো পাঁচু মোড়লের সেবার কি ব্যামোটাই না হয়েছিল এই ডাক্তারই তো

তা ভাল ক'রল। ডাক্তাররা না পারে কি? তবে যার পয়সা নেই তাকে আর কে দেখে? তার একমাত্র আছে ভগবান।

মন্দিরে মন্দিরে অনেক ধরনা দিয়ে অনেক মন্ত্রপড়া জলপড়া খাইয়ে অনেক তাবিজ বেঁধেও দেখেছে ভগবান সারাতে পারে নি, তবু ভগবান নামক কল্পনার প্রতি বিশ্বাসের জোরেই রাত কাটাবার চেষ্টা সীতার। এখানে আসার পরই মা কালীর মানত ক'রেছিল তাতে কাজ হবার লক্ষণ দেখা দেয় নি। একটা বুড়ি বলেছিল বাবা তারকেশ্বরের কাছে হত্যে দিতে, সীতার ইচ্ছে হয়েছিল তবে উৎসাহ পায়নি। কি এক শিথিলতা তার মনকে পেয়ে বসেছে যে নতুন কিছু করবার উৎসাহ যেন তার মনে আর আদৌ নেই।

পেট-বাধা মাগীটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। সীতা কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল তাকে, ইচ্ছে হ'ল জিজ্ঞেস করে কে এমন ক'রেছে। যে-ই করুক ওই মাগী না ক'রতে দিলে কখনও পারে? আসলে ওই মাগীগুলোই বদ-মায়েস। এদের জন্যে সকলের বদনাম, ওই চাওয়ালার সাকরেদটা ওকে ওইসব বলতে পেরেছিল শুধু এই সব মেয়েদের জন্যেই। রেখা ছুঁড়ীর মা-টা খুব শক্ত মানুষ। রেখার কথাটা বরং বুড়ীকেই বলে দেবে সীতা। নইলে ওই মেয়েরও একদিন এই রকমই অবস্থা হবে। বুড়িটারও দেখা নেই আজ। রেখা না হয় তার নাগরের বাড়ী শুতে গেছে বুড়ি কোথায় গেল? ওবেলা তো রাগে রাগে ছিল এখন যেন কথাটা না বললে আর থাকতেই পারছে না, কিন্তু বলবেই বা কাকে? যাকে বলবে বলে ভাবছে সে তো নেই। মনে মনে বুড়িকে খুঁজতে লাগল সীতা।

অনেকটা রাত থাকতে কাগজ কুড়োতে না বেরোলে অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে নয়ত ধাঙডরা বেরিয়ে পড়লে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যাবে ময়লা গাড়ীতে তুলে। ফলে বেশ অন্ধকার থাকতেই হাঁটতে হাঁটতে খালি বস্তা পিঠে ফেলে অফিস পাড়ার দিকে রওনা হতে হয়। ফিরতে প্রায়ই দুপুর গড়িয়ে যায় কালুর। ফেরা আর কোথায়! নিবাস তো গোটা কলকাতা, বদলে কালী টেমপল রোডের ফুটপাথ অথবা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের কোন অট্টালিকার গাড়ী বাড়ান্দার তলা। এর মধ্যে আবার কথা আছে, সাধারণ ভিক্ষাজীবী অনাগরিকবৃন্দ যে বারান্দার সম্পূর্ণটাই যে রাত্রে দখল ক'রে নেবে সে রাত্রে সেখানে কালুর স্থান মিলবে না। কারণ রাজ্যের আঁস্তাকুড়ের সঙ্গে কালুর কারবার বলে সে নিঃসন্দেহে একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি। একান্ত অপাংক্তেয়। অবশ্য ভিখারীভোজের আমন্ত্রণে কালুর পাত এক সঙ্গেই পড়ে। কারণ তখন ভোজনের তাগিদে কৌলিন্য বিচারের অবকাশ থাকে না। তবু রাত্রে শোবার সময় বা কোনদিন

দুপুরে বা অবসন্ন বিকালে পরান্নজীবীদের পাশে বসবার অধিকারটুকু পর্যন্ত কালুর মেলে না। এইজন্যে সে অনেকবারই ভেবেছে আঁস্তাকুড়ের কাগজ কিছুতেই নেবে না। কিন্তু হয়নি। তা না নিলে বস্তার সিকি অংশও ভরেনি সেদিন। কাজেই হাতের বাঁকানো শিকটা দিয়ে পরের দিন ডাস্টবিনে খোঁচা দিতে সে বাধ্য হয়েছে। কেবল রাতের অন্ধকারটুকু অতিক্রম করতে সে কোন এক অন্ধকার কোণে বস্তাটা পেতে শুয়ে পড়ে কাগজের স্তূপে মাথা রেখে। আর এমনিভাবেই নিজের অতীতকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবিয়ে বর্তমানের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে কালু। এমন কি নিজের নামের উৎস এবং নামটুকুর পরে যে পৈত্রিক পদবী থাকতে পারত সেটাকে পর্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধে কোনক্ষণে যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে আজ আর হদিশ পায় না। সে সব সন্ধান যে রাখত সেই মার কথাও মনে নেই বলে নিজের কোন উৎস আদৌ আছে কিনা সে জানে না।

মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য পশ্চিমাভিমুখী। গড়ের মাঠের গাছের ছায়া দেখে কালু লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ডালহৌসী ঘুরে বৌবাজার পর্যন্ত গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপর পঁচিশ পয়সার রুটি কিনে খেয়ে এলাকায় ফিরতে যেন কষ্টই হচ্ছিল। গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছাটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

গাছতলায় তিন চারটি যুবককে তাস খেলতে দেখে নিজের আধভর্তি বস্তাটার খালি অংশে বসে ভর্তি দিকটায় তাকিয়ার মত হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। যে কজন তাসে মগ্ন ছিল তারা একবার ফিরেও তাকাল না। একজন হাতের শেষ তাসটা ফেলে দিয়ে বলল, কা বে, কোন মহল্লা ?

কালু সে কথার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। গম্ভীর হয়ে খেলা দেখতে লাগল। বর্ণচ্যুত সার্টটার ভগ্নাংশের অক্ষত বুক পকেট থেকে একটা আধ পোড়া বিড়ি বেড় ক'রে নিয়ে কানে গুঁজে রাখল। তার নজর ছিল খেলোয়াড় কজনের শেষ হয়ে আসা সিগারেটের দিকে। অল্পক্ষণ বাদেই একজন তার সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই সেটাকে ছুঁড়ে ফেলল। কালু সঙ্গে সঙ্গেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে নিল তার আগুন থেকে। ঘাসের ওপর থেকে একটু আগে যে যুবকটি পয়সাগুলো গুটিয়ে নিল সে ঘটনাটি দেখে নিয়ে বলল, ব্যাটা শান্‌শা পার্টি।

তার কথা কানে যেতে কালুর দিকে নজর দিল অন্য সকলে এবং একজন জানতে চাইল, এ বেটা খেলেগা বে ?

কালু মাথা নাড়ল। সে খেলবে না।

আবে ছোড়্, ভিড় হাটা—অন্য একজন ধমকে উঠল কালুকে।

কালু সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে বিড়ি টানতে মগ্ন থাকায় যুবকটি প্যাণ্টের তলা থেকে একটা দু দিক ধারালো লম্বা ছোরা বার ক'রে জানতে চাইল, ভাগে গা বে ?

কালু মনে মনে আঁতকে উঠল। অথচ অন্তরে তার প্রতিবাদ, সে তো কোন দোষ করে নি তবে কেন তাকে তাড়াচ্ছে ? সে যুবকটির দিকে তাকাল, ছোরাটি যথাস্থানে ফিরে গেছে কিন্তু তার চোখদুটো তখন ছোরার চেয়ে ধারাল, ক্ষুরধার। কালু ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল, হাতের বিড়িটা ফেলে দিল তারপর বস্তাটা কাঁধে ফেলে দক্ষিণ দিকে পা বাড়াল ঘাসের ওপব দিয়ে।

ঘাসের ওপর ইতস্তত বাদামের খোলা আর কাগজের ঠোঙ্গা ছিটিয়ে রয়েছে। চলতে চলতে কালু সেই ঠোঙ্গা ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে বস্তায় ভরতে লাগল। তার চারপাশে অসংখ্য মানুষ হেঁটে ছুটে বা অলস মন্থরতায় গল্প করতে করতে চলেছে সেদিকে নজর নেই তার। হঠাৎ একটা কাগজের বড়-সড় টুকরো তুলতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে চমকে উঠে চোখ তুলে দেখল একটি অতি সুবেশ লোক একজন অপ্সরাকে সঙ্গে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে। লোকটি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাতের সিগারেটটির আগুনটার মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আর সঙ্গিনীটিও মুখমণ্ডলে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে কালো চশমায় ঢাকা চোখ দুটিকে ওরই দিকে ফিরিয়ে যেন অসীম ঘৃণা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। কালু যে ওদের ঘৃণা জানানোর যুগ্ম প্রচেষ্টা অনুধাবন করতে পারছে এমন ভাব না দেখানোতে লোকটি বলল, ধুলো ছিটাতা কাহে ! ডার্টি বীচ। বাস্তবিক কি নোংরা দেশ।—বলে সুবেশার কোমর ধরে আলতো করে তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর কালু ধমকানিটার শব্দে একবার ওদের দিকে তাকাল মাত্র, তারপব একটু দূরে আর একটুকরো কাগজ পেয়ে সেইটা নেবার জন্যে দু পা এগিয়ে গেল। ভদ্র-বেশধারী লোকটির ধমকের কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছে বা তার কথাগুলো বুঝেছে এমন কোন লক্ষণ কালুর চোখে মুখে কোথাও ফুটে উঠল না।

বর্ষাকালের মন্দার পর একটু বেশী উদ্যমে কাজ ক'রতে হয় একটু দূর পর্যন্ত ঘুরে। গত কয়েকমাসে যা রোজগার হয়েছে তাতে কোনক্রমে পেট চালানোই অসম্ভব ছিল। মহাজনের কাছে বাধ্য হয়েই সাতটা টাকা ধার ক'রে ফেলতে হয়েছে। মহাজন দীর্ঘদিনের যোগানদার হিসেবে ওটুকু আগাম দিয়েছে তাকে, দিয়েছে দয়া ক'রে। সেই সাত টাকা শোধ ক'রতে হবে বলেই এত পরিশ্রম কিন্তু এত ক'রেও শোধ হবে বলে মনে হয় হয় না। দুপুর বেলা ভাত খাওয়া তা ভুলেই গেছে সে, কোনদিন দুটো রুটি খেয়ে বা কোনদিন ছাতু খেয়ে দিন কাটানোর অভ্যেস গড়ে তুলতে হয়েছে তাকে। ইদানীং তাও সম্ভব হচ্ছে না।

আগে তিন আনায় ছাতু খেলেই দুপুর বেলা কোন রকমে চলে যেত এখন যা দিন পড়েছে আটআনার ছাতু লাগে আর ছাতুগুলো এমন বিশ্রী যে খেতে গেলে গলার মধ্যে পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে ওঠে। কোনরকমে জলের ধাক্কা দিয়ে সেই ছাতু পেটের মধ্যে নামিয়ে দিতে হয়। আজকাল যেমন নতুন পয়সা বেরিয়েছে যার হিসেব সে বোঝে না তেমনি বোঝে না নতুন দিনের এই অদ্ভুত পরিবর্তনকেও। কি ক'রে যে সব বদলে গেল বুঝতে পারে না। আগেকার দিনে কত লোক ডেকে ভোজ খাওয়াত, মচ্ছবে ডাকতো, বড় লোকের বিয়েতে, শ্রাদ্ধে কত বড় বড় খাওয়ান-দাওয়ান হ'ত আজকাল আর সে সবের কোন চিহ্ন নেই। কোন কোন দিন মাড়োয়ারীরা কালী বাড়ীতে পূণ্য করতে সন্ধ্যায় দু চারখানা রুটি আর দুচারটে জিলিপি হাতে ধরিয়ে দেয় মাত্র। আর মচ্ছবের নেমন্তন্ন একরকম ভুলেই গেছে যদি বা দু-একটা কখনও মেলে তো তার এত প্রার্থী যে দশটার একটায় খাবার জোটে তার। আর ওই মচ্ছবের নেমন্তন্নর আশায় আশায় আরও অসংখ্যের সঙ্গে তাকে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেয় হাজির থাকতে হয় কালী মন্দিরের আশে পাশে। কোন সময় কে ডাকে বলা তো যায় না ? চোখও রাখতে হয় চারিদিকে কোন লোকটা ডাকতে এসেছে কে জানে। আজকাল আবার সকলে ইশারায় ডাকে, বেশী লোক জমে যাবার ভয়ে।

চরতরাম যখন তাকে এ লাইনে এনেছিল তখন বেশ ভালভাবে অর্থাৎ বিনা চিন্তায় দিন কাটত তার। সে সব দিনের কথা মনে আছে। একটা ঘটি চুরি ক'রতে ধরা পড়ে প্রচণ্ড মার খেয়েও দৌড়ে পালায় নি কালু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের যন্ত্রণায় কাঁদছিল। কি ক'রবে আগের দিন কিছু না খেতে পেয়ে ভিক্ষে ক'রতে গিয়ে নিরাশ হয়ে বাধ্য হয়ে একাজ ক'রতে গিয়েছিল। কিন্তু যে সব লোক তাকে কোনদিন ও একমুঠো খেতে বা একটা পয়সা দেয় নি তারা সবাই মিলে হাত মুচড়ে ধরে প্রচণ্ড মার দিয়েছে তাকে। শরীরের এখানে ওখানে ছড়ে ছিঁড়ে জ্বালা ক'রতে থাকায় আর মোচড়ানো হাতটায় অসম্ভব যন্ত্রণা হওয়ায় সে সেইখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ওই ভিড়ের মধ্যেই ছিল চরতরাম। চোরাই মালের কেনাবেচার ব্যবসা তার, সে চোর চেনে। তার দৃষ্টিতে ঘটনাটা এড়াল না, ভিড় সরে গেলে সে বলল, এ বেটা আ যা হামারা সাথ।

কালু তখনও দাঁড়িয়ে। চরতরাম ফের বলল, হামরা সাথ আ যা তোকে একঠো কাম দিয়াইব হম।

এবার লোকটার দিকে তাকাল কালু, না সন্দেহ করবার মত কিছু নেই বরং সস্নেহ দৃষ্টিই বলতে হবে। লোকটা হাঁটা সুরু করতে পেছন পেছন চলতে

সুরু ক'রল কালু। ঘটনা ঘটেছিল রাসবিহারী এভেন্যুর উত্তরে আর সে হাঁটতে হাঁটতে চেতলা এসে হাজির হয়ে গেল লোকটার পেছন পেছন। খালের ধারে একটা টিনের চালাঘরে এসে কাগজের গাদার মধ্যে বসল লোকটি। কালু দাঁড়িয়ে রইল। বসেই চরতরাম জানতে চাইল, কুছ খাইব কি ?

শুনেই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল কালু। জীবনে কেউ নিজে থেকে এমন-ভাবে এ প্রশ্ন করে নি। চরতরামের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঘরে একটি ছোকরা বসে ছিল তাকেই চরতরাম দুটো রুটি আনতে বলায় সে দুখানা শুকনো রুটি আর ভেলিগুড় এনে দিয়ে যেন প্রাণ বাঁচাল কালুর। ছেলেটা কালুর হাতে জল ঢেলে দিতে চোঁ চোঁ ক'রে ঘটিটা শূন্য ক'রে দিল কালু। চরতরাম জিজ্ঞেস ক'রল, পহলে দফে ও কামমে গিয়া থা রে ?

সে আজ বছর আটেক আগের কথা কালু তখন একেবারেই ছেলেমানুষ চরতরামের বক্তব্য না বুঝেই সে হাউমাউ করে বলেছিল, আমি কোনদিন করিনি বাবু। আজ প্রথম···আর কোনদিন ক'রব না বাবু আপনার পা ছুঁয়ে ······টপ করে চরতরামের পায়ের পাতা চেপে ধরেছিল কালু। হাত দুটো তার নোংরা বলে চরতরাম পা টেনে নেয় নি, অমায়িক হেসে বলেছিল, আউর কোভি নেহি করেগা কা বে, তু ই কাম নহি সখেগা। বিলকুল নেহি।

কালু সে কথা না শুনেই কেঁদে চলল ফুঁপিয়ে। চরতরাম বলল, শুন বে শালা, দুসরা কোই ফিকির দেখ রোজগারকা। সব আদমী সে সব কাম নেহি হোতা হ্যায়।

কি কাজ ক'রব ? অসহায়ের মত প্রশ্নটা কালুর মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে চরতরাম বুদ্ধি বাতলেছিল, কাগজ কুড়ানোর বুদ্ধি। সারাদিনের কুড়ানো কাগজ দুপুর বেলায় চরতরামের দোকানের পেছনে টিন ঘেরা মাঠে এনে ঢেলে দিত, আলাদা ক'রে দিত বোর্ড, রদ্দি, গিলা, সরেস। দিনের শেষে যা পয়সা পেত তাতে পেট চলে মাত্র। আর এই আট বছরে চরতরাম টিনের চালা সমেত সমস্ত জমিটা কিনে নিয়েছে বলে সে শুনেছে। আট বছর আগেকার দিনগুলোয় সে কোন হিসেব বুঝত না, পেট চলার পয়সা পেলে বুঝতেও চাইত না। তারপর যখন সে হিসেব বুঝল তখন একমন গিলার জন্যে এক টাকা, সরেস-এর জন্যে দেড় টাকা ইত্যাদি পাওনা ছিল তার। এখন দাম কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে চরতরাম কিন্তু দুটাকার ওপর ওঠেনি। প্রথম প্রথম সে বিস্মিত হ'ত, তার এবং তার মত আরও বহু লোকের আনা এত নোংরা কাগজ দিয়ে কি করে চরতরাম! পরে বুঝেছে পয়সা করে। এবং ওই আস্তাকুঁড়ের কাগজেই অমন চকচকে দেহ হ'য়েছে লোকটির। তবু ব্যাপারটা আছে বলে তারা খেতে পাচ্ছে নইলে কে নিত এই নরককুণ্ডের

আবর্জনাগুলো ? তাই দিনান্তে পিঠের 'বোঝাটা বাড়লে চরতরামের এখানে এসেই তা খালি করে কালু। আজকাল চরত ব্যস্ত থাকে নানা 'পার্টি'র সঙ্গে কথাবার্তায়, মাল ওজন ক'রে বুঝে পয়সা দেয় পঞ্চমরাম কিংবা লুচাই বা দাদু।

তাই সারাদিন যেখানেই থাক বিকাল বেলায় নিশ্চিন্তে কালু চরতরামের খালের ধারের চালা ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কোনদিন কিছু অধিকপ্রাপ্তি ঘটে গেলে আগেই এসে জোটে, নতুন কোন অপরিচিত বস্তুর সন্ধান পেলেও চরতরামের কাছেই গছিয়ে দেয় সেটি যে কোন মূল্যের মাধ্যমে। কাজেই নিশ্চিন্ততা, সর্ব প্রকার নিশ্চিন্ততা নিয়েই সে শুধু পথ কুড়োয়। ময়দানে ছেঁড়া ঠোঙ্গা আর বাদামওয়ালাদের বই-এর ছেঁড়া পাতা কুড়োতে কুড়োতে শহরের সেরা হাসপাতালের সামনে দিয়ে গঙ্গার দিকে ডান হাতে বেঁকে গেল কালু। কিছুটা এগিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠের থেকে বাঁ দিকে বেঁকে গেল রেসুড়েদের ফেলে যাওয়া বেশ কিছু কাগজ ঝোলায় পুরে। চিড়িয়াখানার সামনেটায় কুড়িয়ে ভেতর ভেতর চলে যাবে মহাজনের গদীতে। সকালের দিকে আজ কিছু মাল জমা ক'রেছে, এবেলা আরও কিছু দিতে পারলেই চালতা কাজটা চলে যাবে। বর্ষা কাটলে কি হয় বাজারটা বড়ই খারাপ পড়েছে, মালের টান নেই। মহাজন মালের জন্যে তেমন গরজ করে না, টানের মুখে থাকলে মাল দে মাল দে ক'রে প্রাণ বের ক'রে দেয় এবার এসময় কিছু নেই। বলে চালের দাম বেড়ে গেছে বলে না কি বিক্রী নেই কোন জিনিসের। একথার কারণ সে বোঝে না, চালের দাম বেড়েছ তো হয়েছে কি ? কাগজের দাম তো আর বাড়ে নি, তবে কেন কাগজ বিক্রী হবে না! এর ফলে আর একটাও মুস্কিল হয়েছে আজকাল মালে বড্ড বাছাবাছি করে পঞ্চম লুচাই। একটু কমা মাল হলেই পঞ্চমরাম মুখ করে, খিচ খিচ করে। ফলে খুব সাবধানে কাগজ কুড়োতে হয়, দেরী হয় অনেক। গিলা না কি একেবারে চলতেই চাইছে না আজকাল।

খালের পোলে উঠতেই কালু দেখল রেলিংএ ভর দিয়ে একটি ছোকরা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটার মুখ দেখে অভাবী সংসারের বলে স্পষ্টই বোঝা যায়। কালো গায়ের রং, শীর্ণ চেহারা, একটা কমদামী শাড়ী পরণে তাও পায়ের কাছটা ময়লা এবং ছেঁড়া। একটি অতি সস্তা স্যাণ্ডেল তারও বেশীর ভাগ অংশ ক্ষয়ে গিয়ে পায়ের অর্ধেক মাটিতে। কালু ভাল ভাবে তাকিয়ে দেখল মেয়েটার মুখ মলিন এবং তাতে বিষন্নতা মাখানো। ছেলেটির পরণে একটি ঢিলে পাজামা, গায়ে ছিটের হাওয়াই সার্ট, হাতের ঘড়িটা এবং তার ধাতব ব্যাণ্ড দুটোই স্বল্পমূল্যের বলে মনে হল। কারণ একটু আগে সেই ধমক দেওয়া লোকটির হাতে যে প্রকম ঘড়ি দেখেছিল এটা তুলনা-মূলকভাবে অতিশয় দীন। এদের দুজনকে দেখে কালুর কেমন কৌতুহল হ'ল,

সে দাঁড়িয়ে গেল এবং সামান্য দূরত্ব থেকে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের হাবভাব। মেয়েটা ছেলেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিন্তু ছেলেটি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক দেখছে। সে যেদিন ঘটি চুরি করতে গিয়েছিল সেদিন যেমন তাকিয়েছিল আজও তেমনি দৃষ্টিই যেন দেখতে পেল সে ছোকরাটির চোখে।

কালু একটু দূরে ছিল কিছুটা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি কথা বলতে মগ্ন ছিল হঠাৎ একবার কালুর দিকে তাকাতেই সে তার ছাতা পড়া দাঁতগুলো বের ক'রে অর্থহীন হাসি মেলে দিল। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিজের সঙ্গীর চোখে তাকাল, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল আবার। কালু ওদের প্রত্যক্ষ উপেক্ষা দেখে ওখানে দাঁড়ানোর আর কোনই আনন্দ পেল না। চলে যেতে যেতে ওদের খুব কাছ দিয়ে পা চালিয়ে শুনল ছেলেটি হিন্দিতে কথা বলছে। যেমন হিন্দি মাড়োয়ারীরা বলে থাকে। কি বলছে সে বুঝল না। তাছাড়া ভদ্রলোকেদের বলা বাংলাভাষারই সে অনেক কথা বুঝতে পারে না অন্য ভাষা তো অতি দূর।

দরকার নেই বোঝবার, সামনের পরিত্যাক্ত ঠোঙ্গাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিল। একটা একটা ক'রে তুলতে তুলতে লক্ষ্য করল চিড়িয়াখানার দরজা পর্যন্ত এমনি অনেক ঠোঙ্গা। আইসক্রীমের কৌটোও পড়ে আছে অনেক। ইস্ আইসক্রীমের কৌটো যদি চলত—নিয়ে নেবে নাকি বরফ মাখা ভিজে কাগজ গুলো? কালু ভাবল। চটপট তুলে নিল সেগুলো। ডান দিকে পড়ে থাকা কাগজটা তুলতে গিয়ে হাতে কি যেন লাগল। ইস্ কে যেন শিকনি ঝেড়েছে কাগজটায়, হলুদ চাপ শ্লেষ্মা। শা-লা, কালু মনে মনে উচ্চারণ করল। হাতটাকে বস্তার গায়ে মুছে নিল, বেশ ঘষে ঘষে আঙ্গুলগুলো মুছল তবু যেন মনে হতে লাগল আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে হাতের মধ্যে দিয়ে দেহের ভেতর ঢুকে গেছে। বড় অস্বস্তি হতে লাগল। আগেও এরকম হয়েছে সেই সব পুরানো স্মৃতিগুলো বর্তমান হয়ে যেন যুক্ত হ'ল নতুন অনুভূতির সঙ্গে। প্রথম প্রথম এরকম প্রায়ই হ'ত। কতদিন যে ছেলেদের মলসহ কাগজ সে টেনে তুলেছে তার আর হিসেব নেই, আরও কত রকম নোংরা জিনিষ মুড়ে ফেলে দেওয়া কাগজ ধরে টেনেছে সে প্রথম দিকে—। আজকাল চিনে গেছে, বুঝে গেছে, কোনগুলো নেবার নয়।

চরতরামের গদীতে গিয়ে নতুন সংবাদ পেল কালু। সে গদীঘরের পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার সময়ই তাকে দেখে নিয়েছিল চরতরাম তা ছাড়া পঞ্চমকে আগেই বলে রেখেছিল বলে কালুর কাগজের বস্তা পিঠের থেকে নামাতেই পঞ্চম জানাল, আরে কালুয়া, শেঠ তোকে বোলায়া। যানে কী বখত ভেট করেগা বে।

শেঠ মহাজন ডাকলে কালুর কেমন ভয় করতে থাকে। যে চরতরাম তাকে বাঁচিয়েছে তাকেই দেখে আজকাল তার ভয় হয়। হ্যাঁ ভয়। তাই সে ঢোকার ও বেরিয়ে যাবার সময় কখনই গদী ঘরের ভেতর দিকে তাকায় না। আজকাল সবসময় কত ভাল ভাল লোক বসে থাকে, কত ভাল ভাল কাপড় পরা লোক! শেঠজী কিন্তু অত ভাল কাপড় পরে না। তবু তাকে দেখলে ভয় লাগে। কেন জানে না। আজও শেঠ আগের মত ক'রেই কথা বলে তবু যেন কেমন বেসুরো শোনায় কালুর কাছে, একটু অন্য রকম মনে হয়। তবু শেঠ যখন ডেকেছে যেতেই হবে। কে জানে আবার পাওনা টাকার কথা বলবে কিনা। অতি সন্তর্পণে দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে নিজের ভাষায় চরতরাম জিজ্ঞেস করল, কালু একটা কাজ করবি?

কি কাজ কিছু না জেনেই কালু সম্মতিসূচক মাথা হেলালো। টাকা যে ফেরত চায়নি শেঠ এতেই কালু খুশী। তার সম্মতি পেয়ে চরতরাম বলল, কাল আমাদের দেশের স্বাধীনতা দিবস। খুব ভাল দিন, আনন্দের দিন। কাল সব বড় বড় জুলুস হবে রাস্তায়। আমাদের মহল্লাতেও বেশ রঙদার জুলুস হবে, তুই ওই মিছিলে ঝাণ্ডা নিয়ে যাবি। একটা সাফাই জামা পরে আসবি। বুঝলি?

গোল বাধল এইখানেই। আর জামা পাবে কোথায় সে? জানাল, জামা তো আর নেই বাবু—।

নেই? কালুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল চরতরাম। বাস্তবিক, সংগ্রহ ক'রে আনা কাগজগুলোর চেয়ে নিজে কালু বেশী নোংরা। ছেঁড়া হাফ প্যাণ্টের এখানে সেখানে বিভিন্ন অংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলছে, ময়লায় বাকি অংশেরও বর্ণ বোঝা যায় না; গায়ের ছেঁড়া জামাটার তলায় একটা কালো রঙের গেঞ্জী উঁকি মারছে, মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে উঠেছে প্রায়। সারা দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুখের ওপরেও চাপ চাপ ময়লা। মনে হয় সারাজীবনে জল বলে কোন বস্তু দেহের কোনখানে ঠেকায়নি ছোঁড়াটা। সে যা হোত তা হোত আস্ত একটা জামা অন্তত যদি থাকত তবু না হয় ঝাণ্ডা বয়ে বেড়ানোর কাজে লাগানো যেত। নগদ একটা টাকা আর এক হাতা বোঁদে খেতে পেত ছোঁড়াটা। আর তাহ'লে কাগজের দাম থেকে দাদনের বাবদ একটা টাকা কেটে রাখতে পারত চরতরাম। অনেক ভেবে চিন্তে সে জানতে চাইল, কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা জামা পরতে পারিস না কাল?

কালু ভাবনায় পড়ল কার কাছেই বা চাইবে। চরতরাম বলল, দেখিস যদি যোগাড় হয় তো আসিস। একবেলা খাবার দেবে নগদ একটা টাকা

ইনাম দেবে বেটা—। স্বাধীনতার দিন তো দেশের সবসে ভারী দিন আছে— শেষ কথাগুলো বাংলায় বলার চেষ্টা করল চরতরাম।

কিন্তু ইনাম নেওয়া কালুর পক্ষে সম্ভব নয় তার একটা তাপ্পি দেওয়া জামাও ধার করার ক্ষমতা নেই বলে। কাজেই বিমর্ষ কালু চরতরামকে নিরাশ ক'রে আজকের কুড়ানো সমস্ত কাগজের রদ্দির দাম বুঝে নিয়ে খুচরো পয়সাগুলো তালি দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করা পকেটে ফেলে রওনা হল আপন এলাকার দিকে।

অনেক দিন পর আজই প্রথম কালুর লক্ষ্য পড়ল রেখা আর তার মা তাদের ঝুপড়ির সামনে খোলা জায়গায় রান্না ক'রছে। বর্ষার দিনগুলোয় সন্ধের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ায় এদিকে আসেনি কালু। তিনটে কাত করে রাখা ইঁটের মধ্যে দাউ দাউ করে কাঠের টুকরো জ্বলছে, সেই আলোয় এবং আভায় পাশে বসে থাকা রেখাকে দেখতে খুব ভালই লাগল কালুর। সে আরও দেখল কর্পোরেশনের চাপরাশীটা ওর সামনেই উবু হয়ে একটা ইটের ওপর বসে কি যেন বলছে রেখাকে। গল্প করছে বলেই মনে হল। তার ইচ্ছে হ'ল সে-ও গিয়ে বসে অমনি গল্প করে। আর একটু কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতগুলো বের ক'রে হাসতে লাগল।

কিন্তু রেখা ব্যস্ত হয়ে ছিল উনুনের ওপরে চাপানো ডালের মধ্যে কাঠি দিয়ে নাড়ানাড়ি করায়। তাই কালুর দিকে বেশ কিছুক্ষণ বাদে তার নজর পড়ল আর নজর পড়তেই কালুর মুখটা নিমেষের মধ্যে ফাঁক হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। রেখা মজা দেখার স্বরে বলল, কিরে ম্যারা হাসস্ ক্যা?

কালু কিছু যে বলবে সেই সাহস খুঁজে পেল না। তার বুকের মধ্যে শুকিয়ে গেল হঠাৎ, তবু সে মুখের হাসিটাকে আরও একটু প্রসারিত ক'রে দেবার কষ্টকর প্রয়াস পেল। রেখা একটু হেসে বলল, বা বতুকে কেমন দেখায় রে!—তার কৌতুকের অর্থ না বুঝলেও কথার ভাবে চাপড়াশীটা হেসে উঠল। তাদের যুগ্ম হাসির শব্দে কালু একটুও বিচলিত হল না। সে তার মত দাঁড়িয়েই রইল। রেখা কৌতুক ক'রল, হেসে বলল, কি রে বতু কি চাস?

মাথা নেড়ে কালু বুঝিয়ে দিল সে কিছুই চায় না। বুঝিয়েও আগের মত দাড়িয়েই রইল। রেখা এবার ঝাঁজিয়ে উঠল, কিছু চাই না তে, এইখানে দাড়াইয়া কি ক'রস্?

কালু রেখার কথার জবাব না দিয়ে খালি বস্তাটা বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ল। একটু বাদেই চাপড়াশীটা চলে যেতে কালু উঠে বসল এবং রগের দুপাশে ঝুলে পড়া চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দু কানের ওপরে গোঁজা দুটো আধপোড়া বিড়ি বের ক'রে একটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে আর একটা হাতে

করে রেখার সামনে গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল। রেখা মুখ করে উঠল, কি চাস্ রে পোড়া কপাইল্যা ?

হাতের বিড়িটা দেখিয়ে কালু বলল, একটু আগুন দিবে ?

তর লাইগ্যা আগুন করছিরে মরা ?

রেখার মুখ থেকে ভৎর্সনা কেড়ে নিল তার মা। অকস্মাৎ হাত নেড়ে উচ্চস্বরে ধমকে বলল, যা গা ! যা গা এইখান থিকা।

হঠাৎ শব্দের ঝঙ্কারে প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিল কালু। কিন্তু সরে সে গেল না। ফলে রেখার মায়ের কণ্ঠস্বর সপ্তমের দিকে চড়তে লাগল, অতিশিরা পিচাশটারে মুড়া ঝাঁটা দিয়া পালিশ কইরা দিমু না ? শয়তানের পুত এইখানে কি চাইবার আইসৎ চুর কুনহানকার জানি—। —রেখার মার পরবর্তী কথাগুলো স্বগতোক্তি। সেগুলো থেকে বোঝা গেল কালুর চুরি করার স্বভাবটার জন্যেই তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাতে রেখার মার যত দুশ্চিন্তা। নিশ্চয়ই কিছু চুরি ক'রে সরে পড়বার মতলবে এমনি ভাবে ভিজে বেড়ালটির মত দাঁড়িয়ে আছে ছোকরাটা। প্রচণ্ড উদ্যমে তাই ওকে ভাগাবার অদম্য প্রয়াস। রেখা বিতাড়ন প্রচেষ্টা শুরু করলেও এতটা করায় তার অপছন্দ। এই ছোঁড়াটা লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তো নেহাৎ মন্দ লাগে না। কেমন যেন ভিক্ষে চাওয়া ভিক্ষে চাওয়া ভাব। ভালই লাগে। নিজেকে বেশ গর্বিত মনে হয়। এটিও রেখা জেনেই তাড়ায় যে অল্প অল্প তাড়ালে আকর্ষণটা ওর বাড়বে।

ওদের তাড়ানোতে বিব্রত বোধ না করে কালু চারি দিকে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। সে যেন দেখাতে চাইল রেখার চেয়ে অন্য কারও প্রতি তার বেশী আকর্ষণ। আকর্ষণ তার ছিলও। সেই কালো কুচকুচে বউটাকে দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে কালুর। সে না থাকলে এই ছুঁড়ি। ছুঁড়িটার চেয়ে বউটার বুকের গড়ন কি বড় ! ভাবতেই শরীরের মধ্যে কেমন আঁকুপাকু করে, মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া দেহেও কেমন বেশ একটা দোলানি দোলানি ভাব। কালুর মনের মধ্যে কেমন একটা ইচ্ছে যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, কি ইচ্ছে সে জানে না। তাই মনটা অবশেষে অকস্মাৎ ফুটো হয়ে যাওয়া ফোলানো বেলুনের শব্দের মত অনুভূতিতে ভরে ওঠে। দৃষ্টিতে অসহায়তা ফুটে উঠল। দু চারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সেখান থেকে সরে যায় কালু অন্য দিকে, হয়ত যেদিকে বিন্দেশ্বররা তাস উলটিয়ে পয়সা লেন দেন খেলছে। সেখানে গিয়ে তাসের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে থেকে কালু ধীরে ধীরে সরে যায়। তখন হয় একপাশে গিয়ে বসে নিজের পায়ের নখ খুঁটতে থাকে নইলে কোন নিরিবিলি জায়গা

বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

গায়ে জলের ছিটে লাগতে ঘুম ভেঙ্গে গেল কালুর। জলের ছিটেগুলো যেন তীরের মত এসে বিঁধছে গায়ে। সে উঠে বসল। দেখল, যে ধাঙড়গুলো লম্বা লম্বা পাইপ দিয়ে রাস্তা ধুচ্ছে তারাই ইচ্ছে ক'রে জল ছিটিয়ে যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। অথচ লোকগুলো নির্বিকার ভাবে কাজ করে চলেছে। কালু ওদের দিকে চেয়ে দেখল কিন্তু তার মুখমণ্ডলে কোন বিরক্তি নেই। বস্তাখানা তুলে নিয়ে সে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। একটু এগিয়েই দেখতে পেল মাড়োয়াড়ীর কাপড়ের দোকানটা বেশ রঙীন কাগজ দিয়ে সাজান। ব্যাপার কি? মচ্ছব টচ্ছব আছে নাকি? চারপাশে তাকাল তার সহবাসীদের আর কেউ সন্ধান পেয়ে আসছে কিনা দেখতে। ওমা, ওই রেলিং-ওয়ালা বড় বাড়ীটাতেও অমনি কাগজ ঝুলছে, ওপাশেরটাতেও—আবার ওই দূরের বাঁ দিকের বাড়ীটাতেও মনে হচ্ছে যেন! হঠাৎ তিনরঙের পতাকাটা দেখে তার মনে পড়ল শেঠ আজ একটা কিসের দিন যেন বলেছিল। কি দিন নামটা ভুলে গেলেও কালু বুঝতে পেরেছিল বড়লোকের খুব আনন্দের দিন। মনেও আছে। মনে আছে খেতে পাবে শুনেছিল। একটু এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল পাঞ্জাবীর হোটেলের রেডিয়োটা খুব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আজ, রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত গান ভেসে আসছে। মোড় পর্যন্ত পৌছে আরও তাজ্জব দৃশ্য দেখল যে বহু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সাদা সাদা জামা প্যাণ্ট পরে সারি-বন্দী হয়ে চলেছে। সামনে একটা একটু বড় ছেলে একটা পতাকা নিয়ে যাচ্ছে। একটা বড় মানুষ মাঝে মাঝে কি যেন চেঁচিয়ে বলছে অমনি ছেলেগুলো সব একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে। হ্যাঁ, মহাজন কাল এমনই একটা মিছিলের কথা বলেছিল বটে, বলেছিল খাবার আর এক একটা ক'রে টাকা পাওয়া যাবে। তাহ'লে এদেরই জোগাড় ক'রেছে শেষ পর্যন্ত! তা সুবিধেই হয়েছে শেঠদের, বড়দের এক টাকা দিতে হলেও এদের নিশ্চয়ই অর্ধেক দিলেই চলবে। অনেক পয়সা কম লেগেছে। কিন্তু তার মত একজনকেও তো দেখছে না! তা হ'লে কি কারও একটা আস্ত জামা নেই?

বিকাল বেলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের গাড়ী বারান্দার তলায় বসে কালু এক নতুন শোভাযাত্রা দেখল। কি ভয়ানক শব্দে কতরকম বাজনা বাজিয়ে সব ময়দানের দিকে চলেছে। এবার আর ছোট ছেলে নয়, সব বড় বড় মানুষ। দুধারে সারি সারি নিশান বয়ে চলেছে। হ্যাঁ চিনতে পারল এরা তাদেরই লোক। তারই মত চেহারা। মুখে, হাতে, শরীরের যতটা অংশ অনাবৃত ততটায় চাপ চাপ ময়লা জমে আছে। ময়লা তালি দেওয়া, সেলাই করা জামা গায়ে। বিরাট বিরাট ডাণ্ডায় বাঁধা ঝাণ্ডা বয়ে চলেছে দু পাশে,

চলেছে ক্লান্ত পা ফেলে। মধ্যে আছে রঙীন রঙীন বাজনদারের দল। একদল বাজনাদলের পর আবার কিছু লোক, তারমধ্যে সে শেঠের কর্মচারী লুচাইকেও দেখতে পেল। বেশ ধোপ দুরস্ত জামাকাপড় পরে চলেছে। অমনি আরও অনেকে। সবাই কি একটা ক'রেই টাকা পাবে? না বাজনদাররা অনেক বেশী। তা থাক, কিন্তু ওই একটা টাকার জন্যে বড় মন খারাপ হয়ে গেল কালুর। দলটা ততক্ষণে উত্তর দিকে অনেকটা চলে গেছে। শব্দ কেবল ক্ষীণতর হচ্ছে বহমান বাতাসে।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে কালু দক্ষিণ দিকে চলতে সুরু ক'রল পূব দিকের ফুটপাথ ধরে। এ অনেকটা অন্যমনস্কতার চলা। অকারণের পথ। পচা কাগজ কুড়োতে ভাল লাগছে না। তার মন ভাল নেই। এমন সুন্দর বাজনার মিছিলে সে যেতে পায়নি একটা জামার জন্যে। একটা জামার অভাব তাকে নিপীড়ন ক'রতে লাগল। সামনেই ডাষ্টবিনটা। অভ্যাসবশে কালু তাকিয়ে দেখল অনেকগুলো কাগজ উঁকি মারছে। যেন তার দিকেই চেয়ে আছে ওগুলো। তার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে। হাত বাড়াতে গিয়েও বাড়াল না। নাঃ, তার মন ভাল নেই। ডাষ্টবিনটার দিক থেকে নজর গিয়ে পড়ল ওপাশটায়, ছাই ময়লাগুলোর থেকে সামান্য একটু তফাতেই কে একজন অদ্ভুতভাবে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে! কালু ঠিক দুবার পা ফেলতেই লোকটার কাছে পৌঁছে গেল। ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল হাঁটু গেড়ে বসেছিল লোকটি, বসে থাকতে না পেরে উবু হয়ে পড়ে গেছে। এমনভাবে পড়ে আছে যেন শরীরের দুই অংশ আলাদা। কোমরের কাছে সব লোকের যে সংযোগ দেহের তলার আর ওপরের অংশে তা এর নেই।

কালু ঝুঁকে পড়ল অনুসন্ধানের চোখে। আ রে! এ যে তুলসী! বুড়িটাকে —কালুর মনে পড়ল কালও তো বোধহয় দেখেছে ঘুরে বেড়াতে! একটু ভেবে দেখল, না কাল দেখেনি। অনেক ক' দিনই তুলসীকে চোখে পড়েনি। ইদানীং অনেক কষ্টে চলে চলে বেড়াত। কারও সঙ্গে কোন কথা বলত না বুড়িটা অনেক দিন ধরে। একটা মাটির মালসা হাতে ক'রে শুধু খাবার চেয়ে চেয়ে বৃথাই ঘুরে ঘুরে বেড়াত সে রাস্তায়। আজকাল লোকে বরং দুটো-পয়সা ছুঁড়ে দিতে পারে, খাবার দিতে পারে না, তাই বেচারীকে কেবল ঘুরতেই হ'ত। কালুর নজরে সবই পড়ে। তুলসীকে দিনের মধ্যে বহুবার চোখে পড়েছে কখনও বসে খেতে দেখেনি। সব সময়ই দেখেছে শুকনো সরা হাতে ক'রে হয় হাঁটছে, নয় ব'সে আছে। ইদানীং বোধহয় অনাহারের জন্যেই অত্যন্ত ধীরে ধীরে শ্রান্তভাবে অল্প অল্প চলে বেড়াত তুলসী। কবে যে এখানে এসে পড়েছিল কালু জানে না। কে আর কাকে লক্ষ্য ক'রে বেড়াচ্ছে? সব

জায়গায় ব্যর্থ হয়ে এবং শেষের দিকে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়াতেই বোধহয় উপায়ান্তর না পেয়ে ডাষ্টবিনে খুঁটে খাবার আশায় এসেছিল। আর ফিরে যেতে পারে নি, ক'দিন ধরে যে পড়ে আছে কালু আন্দাজ করতে পারল না। পরন্তু রাত্রের প্রবল বৃষ্টিটাও বোধহয় সারারাত ধরে ভিজিয়েছে তুলসীকে, আবার সেই ভিজে কাপড় চোপড় ভিজে চুল শুকিয়েছে কালকের সারাদিনের রোদ্দুর। কি আশ্চর্য তবু তুলসী বেঁচে আছে! বেঁচে কি আছে? কালু একটু ঝুঁকে পড়ে বোঝবার চেষ্টা ক'রল। পারল না। তার কুড়িয়ে বেড়ান কাগজের মত বিবর্ণ সাদা চোখ দুটো দেখতে পেল না কালু। দেখতে পেল না পাথর চোখেব নিশ্চল জীবন্ততা। অথবা কোন প্রাণস্পন্দনের চিহ্নও সে খুঁজে পেল না তুলসী বুড়ির দেহটার মধ্যে। অথচ এই সেদিন পচা লিচুর মত চোখ মেলে প্রায়ান্ধ তুলসী কালো কাপড় ঢাকা হাড়গুলো নিয়ে টুক টুক ক'রে এখানে সেখানে ঘুরেছে। তখন বরং সেই বুড়িটার তুলনায় সবল মনে হ'ত তুলসীকে যে বুড়িটার কোমর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্মৃতির কম্বলটা গায়ের ওপর ফেলে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সমস্ত পথের ধূলো কাদা মেখে বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তায় এপাশ ওপাশ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালুর মনে হয়েছে পৃথিবীর মন্থরতম প্রাণী বুঝি ওই বুড়িটা। এই ক'দিনের মধ্যে অকস্মাৎ এই পরিবর্তন দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হ'তে লাগল তার। শুধু অসহায়তাই নয়—এক গভীর আতঙ্ক তাকে যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে যায়। দৌড়ে এই তুলসীর এলাকা ছেড়ে যায় সে। পারল না। কোথায় যাবে? তুলসীও নিশ্চয়ই এই ভবিতব্য আরও অনেক পূর্ববর্তীর মধ্যে দেখেছিল, পেরেছে কি পালাতে? পালাল না সে। আরও একটু ঝুঁকে পড়ে অনুভব ক'রল অতি মৃদু স্বরে কি যেন বলতে চেষ্টা ক'রছে তুলসী। সেকথার একবর্ণও কালু শুনতে পেল না। অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও কিছু বুঝতে না পেরে কিছুটা বিষণ্ণ হ'ল। হতাশ ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়াল কালু। অত্যন্ত অসহায়ভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখল সুসজ্জিত হৃষ্টপুষ্ট জনতার চলাচলের মধ্যে যেন একান্তই অসঙ্গত ভাবে তুলসী মরবার জন্যে দখল ক'রেছে স্থানটুকু। অনধিকারে চিন্তা তার ছিল বলেই বোধ হয় আবর্জনার স্তূপ সে বেছে নিয়েছিল। আরও ওপর দিকে তাকাল কালু। তাকাতে চাইল আকাশের দিকে। সামনের আকাশচুম্বী অট্টালিকার ছাদে আড়াল ক'রেছে আকাশ; সেই ছাদে একটা তেরঙ্গা বড় নিশান উড়ছে দৃপ্ত ভঙ্গীতে। কালুর মনে পড়ল শেঠ বলেছিল আজ দেশের স্বাধীনতার দিন।

দিন যখন যায় আশ্চর্যভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষ স্মৃতি রেখে' যেতে চেষ্টা করে। থাকে না। কালকে কীর্তির শাঙ্কে ধরবার চেষ্টা করলেও যে

মোছা শ্লেটের মত লেখা ছিল বোঝা যায়, কি লেখা পড়া যায় না। তাই কাল মানুষের সব প্রচেষ্টাকেই নির্মম হাতে মুছে দেয়; নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয় মানুষকেও। শোক করে ঘনিষ্ঠতম, শোক করে কয়েকদিন। তারপর মনের চিহ্নলুপ্তির পালা। সেই নিশ্চিহ্নতা। কাজেই মানুষের বেঁচে থাকার জন্যই। যতটুকু যার আয়োজন ততটুকুই তার অনেক। এই আয়োজন জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত হলে মানুষ সুখী, পর্যাপ্ত না হলে অসুখী। কিন্তু নিম্নতম আয়োজনটুকু না থাকা সত্ত্বেও কালু খুব অসুখী ছিল না যতটা তার হওয়া উচিত। মোটামুটি ভাবে সন্তোষের আপেক্ষিক শান্তিতেই দিন কাটছিল তার। বাধ সাধল এই বউটা এলে। সীতা। কি ক'রে যে বউটা তার বুকের মধ্যে মেঘ ডাকার আলোড়ন তুলল কালু বোঝে না। আগেও রাতগুলো ঠিক এমনই ছিল কিন্তু এমনিভাবে ঘুম ভেঙ্গে যেত না অসময়ে। এমনি ভাবেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত সন্ধে একটু ঘন হলেই, কিন্তু এখন যে কেন আসে না! সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে ছুঁড়িটা। কেমন শুকনো শুকনো দেখতে ছিল ন্যাড়া গাছের মত দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে কি ক'রে যে কোত্থেকে কি পরিবর্তন এল কালু ভেবেই পায় না। এতসব হ'ল কি ক'রে! শুকনো মুখখানায় কি যেন উজ্জ্বলতা। চোখদুটোর চাউনিও কেমন বদলে গেছে। সরু দেহটা আগের মতই কাপড় দিয়ে ঘেরা থাকলেও ভেতর থেকে দুটি নিটোল মাংসপিণ্ড ঠেলে উঠেছে বুকে। আরও কি বড় হচ্ছে ওরা! কোমরের নিচেটা কেমন ভারী ভারী। চললে বড়ই সুন্দর দেখায়। কালু পেছন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পলক পড়ে না তার চোখের, বুকের মধ্যে কি একটা যেন দৌড়ো-দৌড়ি ক'রতে থাকে। কে যে দৌড়োয় সে বোঝে না। কেবল অনুভব করে বুকের ওই অচেনা প্রাণীর ছুটোপুটির সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন কি এক চঞ্চলতা এসে সারা দেহে দৌড়ে বেড়ায়। মনে হয় বুকের মধ্যে ঢুকে পড়া ওই প্রাণীটাই বুঝি গোটা দেহের সমস্ত রক্তবাহী শিরা উপশিরাগুলোর মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অসামান্য আবেগে। তবে যত যাই হোক এই অজানা প্রাণীটিকে আমদানী ক'রেছে ওই বউটা। নিটোল দেহ কালো বউটার ওপর তাই রাগ ক'রতে চায় কালু। পারে না। অনেক ইচ্ছে ক'রেও রাগ করতে পারে না। বরং প্রচণ্ড দুর্বলতাই অনুভব করে সীতার সামনাসামনি হ'লে। আশ্চর্য এই যে, তাকে দেখলেই সীতার চোখদুটো কেমন ক্রূর হয়ে ভ্রুদুটো কুঁচকে যায়। সে অনেকবার হেসে সীতার মুখখানাকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা ক'রেছে, ফল হয়েছে এই যে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে সীতা, এদিকে আর একেবারেই ফেরে নি। এজন্যে কালুর বেশ একটু বেদনা বোধ হয়েছে বটে—সে বেদনা ক্ষণস্থায়ী। কোনদিন

সন্ধেবেলা সে ওদের চৌহদ্দীতে শুতে এলে সবাই মিলে যখন ওকে তাড়িয়েছে তখন তাড়নার নেতৃত্ব ক'রেছে সীতা। নিজে মুখে হয়ত সে কিছুই বলে নি তবে বলার চেয়ে অনেক বেশী ক'রেছে সকলকে ইন্ধন জুগিয়ে। অবশ্য সেজন্যে কালু আহত হয়নি। সে জেনেছে—সে সকলেরই অস্পৃশ্য। সেই বিশ্বাস নিঃশব্দে লালিত ক'রে সে একা। এবং তাই যখন নতুন ক'রে কারও দ্বারা সে তাড়িত হয় তাতে দুঃখ পায় না। একা সে এক প্রান্তে অথবা কোথাও একেবারে একা শুয়ে থাকে তার নোংরা বস্তাটা মাথায় দিয়ে। রাত কেটে গেলে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে সেও একজন হয়ে যায়। তখন সে অদ্ভুত এক শান্তি ফিরে পায়।

তবু সব মানুষের থেকে সীতার প্রশ্ন পৃথক। সীতা তার কাছে বিস্ময়। তাই প্রশ্ন। আর সেই প্রশ্ন নিয়ে নিঃশব্দে সে অপলক চোখে চেয়ে থাকে সীতার দিকে। আর দিনের বেলায় অনেক লোকের চোখের সামনে বেশীক্ষণ নিঃশব্দে দেখতে পারে না বলে রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে সীতাদের সবচেয়ে কাছের ফাঁকা স্থানটুকু শোবার জন্যে বেছে নেয়, সেখান থেকে বিনিদ্র ক্ষণগুলোয় আধো আলোয় কিছু কল্পনা মিশিয়ে সীতাকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পারবে ভাবে সে।

মুস্কিল হয়েছে বর্ষা শুরুর পর থেকে। কালু এসে দেখল গাড়ীবারান্দার তলায় মানুষগুলো এমনভাবে শুয়েছে যে কোথাও এক চিলতে মাটিও দেখা যাচ্ছে না। ইদানীং রাস্তার ধারের বাতিগুলো বদল ক'রে বেশ সুন্দর লম্বা লম্বা কাঁচ লাগানোর ফলে আলায় জোর হয়েছে। বাতিদান কিছু দূরে হলেও মানুষ চেনবার মত আলো এখানে পৌছায় বলে কালু দাঁড়িয়ে বেশ ভাল ক'রে খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু জায়গা আজ কোথাও নেই। সামান্য একটু কেবল ফাঁক রয়েছে সীতার পাশে। ঘুমের ঘোরে সীতা নিরঞ্জনের গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে গেছে বলে ফাঁক হয়ে গেছে খানিকটা, অথবা ছেলেটার জন্যে জায়গাটুকু রেখেই শুয়েছে, ছেলেটা আসেনি। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখল কালু। আরও বেশী সময় ধরে ওই সামান্য স্থানটুকুর কথা ভাবল। তারপর মরীয়া হয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করতেই শুনল—এই! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন ঘুমন্ত লোক উঠে বসেছে। রূঢ় স্বরে জানতে চাইল, উহা কাহে শোতা হ্যায় রে?

কোথায় শোব তবে—কালু প্রতিপ্রশ্ন ক'রল।

ভাগ রে শালা—আবার ধমক শুনল কালু। এবার যেন গলার স্বর পরিচিত মনে হ'ল। ঠিক ক'রতে পারল না কে। কালুও লোকটার মত বসেই রইল। একবার কেবল তাকিয়ে দেখল সীতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ইতিমধ্যেই লোকটা উঠে এসে পায়ের কাছটায় দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বলল, যা আমার জায়গায় ঘুমো গিয়ে—। কালু উঠে গিয়ে সেখান থেকে দেখল লোকটা শুয়ে পড়েছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কালু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না তার। লোকটার অদ্ভুৎ ব্যবহারের সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না অন্য কোন ঘটনা বা ঘটনার সাম্ভাব্যতার সঙ্গে। কিছুক্ষণ বাদে দেখল একটা ছোট গরু এসে তাদের পায়ের কাছটায় রাস্তায় জাবর কাটতে লাগল। গরুটাকে দেখতে দেখতে তার মনে হ'ল বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্ন খেয়ে বেরিয়ে এসে লোকেরাও ঠিক এমনি ক'রেই পান চিবোয়। ঠিক সেই একই ভঙ্গী সে দেখল গরুটার মধ্যে। আঃ, এমন তৃপ্তি ক'রে খেতে পায়নি সে অনেকদিন। গরুটাকে দেখে কেমন হিংসে হতে লাগল তার। আজকাল মচ্ছবের নেমন্তন্ন প্রায় থাকছেই না। থাকলেও খদ্দের অসংখ্য। গেলে এক হাতা ক'রে খিচুড়ি মেলে। চাইলে খিঁচুনি। অথচ গরুটা—

এই এই এই—চমকে উঠল কালু। এ তো সীতার কণ্ঠস্বর। মাথা তুলে কালু দেখল সে যেখানটায় শুতে গিয়েছিল সেখানকার লোকটা তাড়াতাড়ি মুখটা চাপা দিল নিজের। সীতা যেন অনেকটা ঘুমের ঘোরেই বলল, কে রে?

কারও কোন সাড়া নেই, সব চুপ চাপ। ওদিক থেকে কার একটা নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকে কে যেন একজন বিড়বিড় ক'রে কি বলে উঠল কালু বুঝল না। কিন্তু সীতার সেই হঠাৎ চিৎকারে কালুর বুকের ভেতর ধড়ফড ক'রতে লাগল। কান খাড়া ক'রে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। তবে কি কেউ মেরে ফেলল কালো বউটাকে? আর কোন শব্দ পাওয়া যায় কি না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল কালু। না, আর কোথাও কোন শব্দ নেই। দুপাশ থেকে নাক ডাকার শব্দটুকুও না এলে পৃথিবীটাকে মৃত বলেই মনে হ'ত তার। তবু মহানিঃশব্দতার মধ্যে নাক ডাকার সামান্য শব্দটুকুকেও যেন জীবনের চিহ্ন মনে হচ্ছে না। তার পাশের লোকটাও একখানা কাপড় দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ে শুয়েছে। কালুর মনে হ'ল তারও একখানা কাপড থাকলে মন্দ হ'ত না। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার ফলে ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ঠাণ্ডার দিন তো আসছে। ঠাণ্ডার দিন এলে বড়ই কষ্ট হয়। আজকাল আগুন করবার মত কাঠও জোগাড় হয় না। আগে মুনিয়ারা চেতলার ওদিকের কাঠ চেরায়ের কল থেকে ছোট ছোট কাঠের টুকরো নিয়ে আসত, ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে আসত শানগর-কালীঘাট মালগাড়ীর স্টেশনের গাদা ক'রে ফেলে রাখা গোল গোল কাঠগুলোর। আজকাল চেতলার কাঠগোলাগুলোর আশেপাশে ঝুড়ি হাতে কাউকে দেখলেই লোকেরা মারতে আসে। রেলওয়ে সাইডিং-এ এসে পড়া গোল গাছের ছাল ছাড়ানোরও অনেক খদ্দের জুটে গেছে আজকাল।

ওপাশ থেকে পাকিস্থানের অনেকগুলো ছেলে মেয়ে আসে। মুনিয়ারা তাদের সঙ্গে পারে না। নইলে মাঝখানে আগুন জেলে গভীর রাত পর্যন্ত তাতে হাত-পা সেঁকে বাকি রাতটুকু কোনক্রমে ঘুমিয়ে কাটানো যেত আগেকার দিনে। বদমাস ছেলেরা ওই রাজু-টাজু করে কি দুনিয়ার দেওয়াল থেকে কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পোড়ায়। শুধু তাই নয়—সুবিধে পেলে তার বস্তা থেকেও কাগজ চুরি করে। কাজেই শীতকে তার ভয় আরও বেশী।

পরের রাত্রে ঠিক আগের রাতের মতই সীতার পাশে খালি স্থানটুকুতেই এসে শুয়ে পড়ল কালু। গতকাল রাতের লোকটির কথা তার মনে পড়ল। সে লোকটার গলার স্বর চেনা মনে হলেও তাকে ঠিক চিনতে পারে নি কালু। আজ হঠাৎ সীতার কাল রাত্রের চিৎকারের সঙ্গে লোকটির তাকে সরিয়ে শোবার সামঞ্জস্যের কথা মনে হ'ল কালুর। আজ আবার এসে হাজির হবে কি না ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত আরও একটু গভীর হলে দুজন লোক এসে হাজির হ'ল। তাদের পেছন পেছন একটি ছোকরা, সাহেবের বাড়ীর চাকর। তিন জনের মধ্যে একজন নিচু হয়ে কা'কে যেন খুঁজতে লাগল। একটু খুঁজেই অপর দুজনকে ডেকে কালুকে দেখিয়ে নিজেই কালুর গায়ে এক লাথি বসিয়ে দিল। কিন্তু অত সহজে কালুর ঘুম ভাঙ্গে না বলে আর একজন চুল ধরে ঘুমন্ত কালুকে টেনে তুলল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে এবং যন্ত্রণায় কালুর কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে হকচকিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ঘুষি এসে তার মুখে পড়তেই সে টাল সামলাতে না পেরে সীতার গায়ের ওপর পড়ে গেল। লোক তিনজন ততক্ষণে নিজেদের আঞ্চলিক হিন্দি ভাষায় অকথ্য গালাগালি দিয়ে চলেছে তাকে। ঘুমন্ত সীতা আঘাত পেয়ে জেগে উঠেই দেখল তা'র দেহের ওপর আছড়ে পড়া একজন লোককে আরও তিনজন লোক টেনে তুলেছে। হেঁচড়ে হেঁচড়ে তাকে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে উঠে বসল সীতা। লোকগুলোকে চেনবার জন্যে চোখ রগড়ে নিল। ততক্ষণে কালু চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। 'ওরে বাবারে, মারল রে। আমাকে মেরে ফেলল রে—'। আর পালটা গর্জন শুনল সীতা, শালা, এ রাস্তী-থানা মিলা হ্যায়! এতনা লোক হামলোক শোতা হায়, আর তুম শালা তামাম রাত বদমাসী করেগা দুসরা আদমীকা জানানা সে?—কালুর কানে অভিযোগ সামান্যই পৌঁছেছিল। তার আঘাতের প্রচণ্ডতার জন্যে সে ভাল ক'রে কিছু শুনতেই পাচ্ছিল না—জবাব দেবার তো কথাই ওঠে না। তার সর্বাঙ্গে সমানে আঘাত এসে পড়াতে মুখের সামনে দু বাহু দিয়ে আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টাটুকুও সে হারিয়ে ফেলল। মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতায় তার আর্তনাদ

তার সহবাসীদের অনেককেই জাগিয়ে তুলল। সীতা তো হকচকিয়ে গেল ঘটনাটার আকস্মিকতায়। অন্য সকলে যারা জাগল বিমূঢ় হয়ে উঠে বসল, কেউ শুয়ে শুয়েই দেখতে লাগল। তবে কেউই কোন কারণ বুঝল না, কেবল দেখল কয়েকজন লোক মিলে একজনকে ভয়ানক মারছে আর সে প্রাণ ফাটানো চিৎকার ক'রছে। সীতা কণ্ঠস্বর শুনে কালুকে চিনল, কিন্তু তাকে ধরে এইভাবে প্রহার করার কারণ সে বুঝতে পারল না।

সামনের বাড়ীর চাকর ছোঁড়াটাই প্রথম থামল। তার সহযোগীদের বলল, ছোড় আভি। যানে দে শালে কো।

উত্থান শক্তিরহিত কালু তখন ফুটপাথ আর গাড়ী চলার রাস্তার সঙ্গম-স্থলের নর্দমায় পড়ে আছে। সেই অবস্থাতেই তার ওপর একটা লাথি সজোরে বসিয়ে ঘটনার উদ্যোক্তা বলল, শালা দোগলাকা বাচ্চা ফিন্ উসকী পাস শোনে দেখেগা তো তোরা জান লেকে ছোড়েগা। শুর তার শেষ লাথিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবার কোঁক ক'রে উঠল কালু। অবশ্য তারপরই তার আগের শব্দগুলোও থেমে গেল।

সীতা লোকদুটির মধ্যে একজনকে চিনল সে ওপারে সুরকীর মিলে কাজ করে। কখনও কখনও এখানে সেখানেও নানারকম কাজ ক'রে বেড়ায়। দিনের বেলা কোথায় কোথায় থাকে, রাত্রে এখানেই শোয় এসে। রেখার মা লোকটাকে একবারেই দেখতে পারে না। অনেক কথা বলে ওর নামে। শুধু তাই বা কেন লোকটাকে তার নিজেরও ভাল লাগে না। কেমন কেমন ভাবভঙ্গী যেন। চোখ দুটো তাদের গ্রামের ইসমাইলের বদরাগী কুকুরটার মত। কুকুরটাকে মনে আছে খুব স্বাভাবিক অবস্থাতে তাকালেই মনে হ'ত যেন যে কোন মুহূর্তে ও গলার নলীটা ছিঁড়ে নিতে পারে। অথবা গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে শরীরের যে কোন অংশ থেকে এক থাবলা মাংস তুলে নিয়ে ইচ্ছাপূরণ ক'রতে পারে।

লোকগুলো চলে যেতে সীতা ভাবল কালুকে গিয়ে ধরে তুলে নিয়ে আসে—বেচারা নর্দমার কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, বোধহয় বেহুঁস হয়ে গেছে। একটু শব্দ পাবার জন্যে কান পেতে রইল সীতা। পেল না। কেবল শুনল নিরঞ্জন অতি ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রছে, অ বউ, উরা অমন করে মারলে ক্যানে রে?

কথাটা কানে যেতেও সীতা কোন জবাব দিল না। নিরঞ্জনের এই রোগ-যন্ত্রণাজড়ানো কথাগুলো কানে ঢুকলেই তার কেমন বিরক্তি আসে আজকাল। 'এই একঘেয়ে শব্দগুলো শুনে শুনে যেন কানের থেকে সুরু ক'রে মন পর্যন্ত পচে গেছে তার। বরং কালুর প্রতি যেটুকু সহানুভূতি জন্মাচ্ছিল সেটুকুও ওই

লোকটার জিজ্ঞাসায় উবে যেতে বসল। সীতা এতক্ষণ কালুর দিকে তাকিয়েছিল এবার অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমিয়ে পড়ল। ততক্ষণে অন্য সকলের নাক ডাকতে সুরু ক'রেছে, যারা জেগেছিল সকলেরই।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙতেই সীতার রাত্রের ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ল। কালুকে খুঁজল সে চারদিকে তাকিয়ে। কোথাও নেই। ওই তো ওদিকে কাঙালের মা মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, ওই ঘুমোচ্ছে রেখার মা আর রেখা। রেখা তাহ'লে ভোর বেলা এসে শুয়েছে কিংবা কাল রাত্রে আর কোথাও যায় নি। মরুক গে। কিন্তু অত মার খেয়ে কালু আবার গেল কোথায়? ওই লোকগুলো আবার এসে ওকে নিয়ে যায় নি তো? মরে যায় নি তো কালু? আহা, বড় শান্ত ছিল ছোঁড়াটা। অন্য যে সবগুলো আছে তাদের চেয়ে অনেক ভাল। কালুর হলদে দাঁতের সারি বের করা হাসিটা সীতার মানসচোখে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল ঠাণ্ডা কালো কালো চোখ দুটোও। চুরির ভয়ে সীতা নিরঞ্জনকে জাগিয়ে বিছানা নামক ছেঁড়া চটখানা তার হেফাজতে দিয়ে উঠে পড়ল প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশ্যে। উঠেই সে দেখল একটা ছোঁড়া রাস্তার ওপাশের ফুটপাথের কিনারায় বসে নালাতে মলত্যাগ ক'রতে লেগেছে। সকালবেলায় এই কুকর্মের দৃশ্য দেখে মনে মনে ছোঁড়াটাকে দু চারটে গালাগালি দিল সীতা। দু পা এগিয়েই দেখল রাস্তার ওপারেই যে বিরাট শিরিস গাছটা আছে তার গোড়ায় হেলান দেবার ভঙ্গীতে কে যেন একজন শুয়ে আছে। আকাশে যেন মেঘ এবং সূর্য ওঠার সময় হয় নি তাই স্পষ্ট দেখতে পেল না তাকে। তবু কালু বলেই মনে হ'ল। তা যে-ই হোক সে ফিরে এসে দেখবে। আহা, বেচারী কখন উঠে ওইখানে গিয়ে বসেছে—। কাল রাত্রে লক্ষ্মীছাড়া মোষগুলো যে কেন অমন ক'রে মারল ওকে—। সীতার তো মনেই হয় না কারও অন্যায় ছোঁড়া ক'রতে পারে। বোকার মত চাউনিতেই ওর ক্ষমতা বোঝা যায়। আহা গো, অনর্থক বেচারাকে মারল ক'জন মিলে।

সমস্ত মুখটা ফুলে গেছে কালুর। কপালের ওপরে একটা গভীর কালো দাগ বেশ স্পষ্ট। ডানদিকের গালে কি ক'রে যেন লম্বা হয়ে বেশ খানিকটা জায়গা কেটে মাংস বেরিয়ে এসেছে। রাত্রে সেখান দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, এখন কিছুটা রক্ত জমে আছে কালো হয়ে। তলার ঠোঁটটা ফুলে দ্বিগুণ মোটা হয়ে রক্ত জমে লাল টসটস ক'রছে। তা ছাড়া মুখমণ্ডলের নানাস্থানে এখানে সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে বলে আরও যে কত জায়গায় কেটেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে আছে কালু, বাঁ দিকের চোখটা একটু যেন ফুলেছে বলে মনে হচ্ছে। আর একটু তীক্ষ্ণ ভাবে নজর দিলে স্পষ্টই

বোঝা যায় বাঁ দিকে চোখের ওপরে ভ্রুর মধ্যে রক্তের লালিমা। কেটেছে সেখানেও। সমস্ত আঘাতের চিহ্নগুলো মিলে কালুর মুখটা বেশ বীভৎস দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে কোন বাসি মৃতদেহের অংশ বুঝি। অযত্নে বর্দ্ধিত দাড়ি-গোঁফের অরণ্যে আচ্ছাদিত মুখাংশেও আঘাতের অস্তিত্ব বর্তমান বলে অনুমিত হচ্ছে। অবসন্ন দেহভঙ্গীতে এমনভাবে কালু পড়ে আছে যে সে মৃত কি নিদ্রিত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সকালে যথারীতি ঘুম ভাঙ্গল একে একে সকলেরই, কিন্তু একজনও রাত্রের ঘটনার কথা মনে ক'রতে পারল না, কেউ চেষ্টা ক'রল না, যারা জেগে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ ক'রেছিল তাদেরও কারও মনে রাত্রের ঘটনার স্মৃতি সকালের আলোয় জেগে উঠল না। হরিমাধব তার ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, যোগেশ্বর চলল এধার ওধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে কোথাও বসে এক ভাঁড় চা খাবে সেই ইচ্ছায়। কেষ্টা দাসী চলে গেল বাবুদের বাড়ীর বাসনগুলো মেজে দিতে। তারপর বাসদেব তার বউ, রাঙিয়া তার নাতি, যোগেন আর তার রাখা মেয়ে মানুষ সব একে একে উঠে এপথে ওপথে জনতার অরণ্যে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টুকুর জন্যে। পাশাপাশি শুয়েছিল রাত্রে অথচ প্রত্যুষে কেউ কারও দিকে চাইল না, কেউ কারও সঙ্গে কথা কইল না। এমন কি রাত্রের অন্ধকারে তার পাশে কোন যে লোকটি শুয়েছিল একথা জানবারও প্রয়োজন অনুভব করল না কেউ।

কালু কেবল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পড়ে রইল আচ্ছন্নের মত। চলতি গাড়ীর শব্দ, মাথার ওপর কাকের ডাক তার কানে এসে ঢুকছিল কিন্তু সেই অনুপ্রবেশের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। নিঃশব্দে নিঝুম স্তব্ধতায় তার সমস্ত শরীর এবং মন শূণ্যচেতন একটি জীবিত জড় বস্তু মাত্র। সন্দেহবশতঃ একটি কাক এসে একবার একটু দূরে বসল। এপাশে ওপাশে ঘাড় হেলিয়ে দেখল কালুকে ভাল ক'রে। লাফিয়ে লাফিয়ে আরও একটু কাছে সরে এসে দাঁড়াল। সকাল থেকে এখানে একইভাবে মানুষটাকে পড়ে থাকতে দেখছে কাকটা। অনেকক্ষণ গাছের ওপর নিম্নতম ডালটায় বসে চেঁচিয়েছে এই জ্ঞানে যে জীবন্ত হলে নিশ্চয়ই উঠে বসবে অথবা তাকে তাড়াবে। কিন্তু কিছুই ক'রছে না। ওপর থেকে লক্ষ্য ক'রেছে লোকটা নড়ছে না পর্যন্ত। তাই আরও ভাল ক'রে দেখবার জন্যে কাছে এসেছে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে রৌদ্রের তাপের চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল। তার তারস্বরের বার্তা শূন্যে ধ্বনিত হতে লাগল। এতে যদি জাগে লোকটা। আর নাই যদি জাগে তো সহকর্মীরা আসুক। বিচার করুক গায়ের ওপর গিয়ে বসে ঠোঁটের ঠোক্করে চোখ খুবলে নেবার মত মৃতদেহ এটা কিনা।

অন্যকোন কাক এসে জোটবার আগেই সীতা এল। আবিষ্কারক কাকটা অমনি উড়ে গিয়ে গাছের নিচের ডালটায় বসে প্রণেপণে গালাগালি দিতে লাগল সীতার দিকে তাকিয়ে। সীতার সেদিকে লক্ষ্য যাবার কথা নয়। কালুর কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, এই ছোঁড়া! কালু জবাব দিল না। সীতা গলার স্বর আর একটু চড়িয়ে দিল, এই ছোঁড়া, এই! এবারও সাড়া না পেয়ে গায়ে একটু ঠেলা দিল সীতা। সাড়া মিলল। যেন গভীর নিদ্রার অন্তঃস্থল থেকে একটু স্বর উঠে এল, উঁ। সেই সঙ্গে আর একটা স্বর সীতার কানে এল, সে স্বর নিরঞ্জনের। ডাকছে, অ বউ, বউ—। বেশ একটু বিরক্তি সহকারে পেছন ফিরে সীতা দেখল ওপারের ফুটপাথের প্রান্তে বসে নিরঞ্জন ডাকছে। সীতা তাকাতেই সে বলল, শীগগির ইদিক পানে আয়।

বাধ্য হয়েই কালুর প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ ক'রে সীতা ওদিকে গেল। গিয়ে দেখল যে বারান্দার তলায় তারা শোয় সেখানে দেওয়ালের ধারে তাদের জিনিষপত্র রাখা ছিল কে বা কারা যেন তা ছিটিয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। কে যে ক'রল সীতা আন্দাজ ক'রতে পারল না। এই তো ভোরে উঠে সীতা নিরঞ্জনকে ডেকে জিনিষগুলো আগলাতে বলে গেল, এর মধ্যে আবার কে এরকম করল! সীতা তা-ই অভিযোগ করল, তোমারে বলেই তো গেলাম। নিবে না লোকে!

এই! নিরঞ্জন ধমকে উঠল, সকালবেলা গালাগালি দিবি না বলতেছি।

এঃ, মড়ার আবার মেজাজ—সীতা জিনিষপত্র নাড়তে নাড়তে আপন মনেই গর্জে উঠল।

বাজে কথা বলবি না বলতিছি। সক্কালবেলা গালাগালি সহ্য হয় না।

গীতের নাই জোর বাজনার দেখ তোড়। শরীরে এক কড়ির মুরোদ নাই গলার জোর কত! রাত ভোর মড়ার মত ঘুমিয়ে হ'ল না আবার সকাল বেলাও ঘুম হচ্ছে। জানেই তো গর্ত বোজাবার তরে আমিই মাগী ব্যবস্থা ক'রব।—গজগজ ক'রতে ক'রতে সীতা যখন সব জিনিষগুছিয়ে দেখল কিছুই খোয়া যায় নি তখন আশ্বস্ত হয়ে গলার শব্দ কমালো। সীতার শব্দের ঘাটতিকে নিজের জয় মনে ক'রে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে নিরঞ্জন বলতে লাগল, অমনি কি আর ছোঁড়াটা রেতে অত মার খেলে? তোর বেহায়াপনার জন্যেই খেলে। এখন আবার দরদ দেখান হচ্ছে! এঃ সোহাগে মাগী ডগমগ ক'রতেছেন!

নিরঞ্জনের বাক্য ক'টি কানের পর্দায় ঘা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই সীতা ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মত ছিটকে উঠল সক্ষোভে—খবরদার বলতেছি ঘাটের মড়া, কোমর নাড়ার মুরোদ নেই মুখ নাড়ার গোঁসাই গো! আহা। নজ্জা করে না বলতে? সাতজন্মের ভাগ্য যে আমার মত মেয়েকে ঘর ক'রতি পেয়েছিলি।

অন্য কেউ হলে কবে মুয়ে ছাড়া বুলিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেত।

কথাগুলোর চেয়ে সীতার জিবে ধার বেশী ছিল বলে আহত নিরঞ্জনও ক্ষুব্ধ সাপের মত ফুঁসে উঠল—এঃ বাপের বাড়ী দেখাচ্ছে! আছে কি বাপের? মদ আর গ্যাঁজা টেনে তো সব দুলাল মণ্ডলের ঘরে নিকে মরেচে। যেত্তিস কোথায় রে?

বাপের নামে কুনো কথা ক'য়ো না বলে দিচ্চি। আমি তুমার ঘর ক'রতে এইচি বলে আমার বাপ তুমার কুন পাকা ধানে মই দিয়েচে শুনি?

বলবে না? যেমন বাপ তার তেমনি বিটি। ওই ছোঁড়ার সঙ্গে তোর অত কি রে? আমি শালা ব্যামোয় মরে যাচ্চি তা একবার ছাখবার নাম নেই আর কোথাকার কে বদজাত মার খেয়েছে তারই জন্যে ওনার দরদ একেবারে উথলে উঠল।

সীতার কণ্ঠে অনেক অস্থির ঝংকার—ওনার জন্যে দেশ ঘর ছেড়ে এই রাস্তায় বসলাম আর এতবড় মিথ্যে কথা সতীসাধ্বীর নামে! ভগবান সইলে হয়। হে ভগবান, হে মা তুমিই শুধু দেখো। এর বিচার যেন হয়।

অভিশাপের জন্যে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল নিরঞ্জন—এঃ ভগবান বিচার ক'রবে। বিচার ক'রলে তোর গায়ে পোকা লাগবে না মাগী?

আমার গায়ে লয় তোমার মুয়ে পোকা পড়বে বলে দিচ্চি। বেশী কথা বলো নি। সারাজীবনটা জ্বালিয়ে এখন আবার শাপ শাপান্ত ক'রতেছে—লজ্জা করে না? অন্য মেয়ে হলে অমন মিনসের মুখে পোঁদ ঘুরিয়ে কবে যে দিকে দুচোখ যায় চলে যেত।

তোর আর যাবার পেয়জনটা কি শুনি? আমি রুগী মানুষ ঘুমিয়ে পড়ি দেখে কিছু বুঝি না?

কি বোঝ, কি?—মিথ্যা অপবাদের আগুনে সর্বশরীর জ্বলে উঠল সীতার। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে যেন তেড়ে গেল নিরঞ্জনের দিকে।

দৃশ্যটি কিছু লোক পথ চলতে চলতেই উপভোগ ক'রছিল এখন অনেকে পরিণতি দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিরঞ্জন তার চারপাশে এতগুলো লোকের উপস্থিতি খেয়াল ক'রতেই চুপ করে গেল। নিজের রাগ দমন করবার জন্যে মুখ নিচু ক'রে রইল। সীতা কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে তুমুল বিক্রমে চেঁচাতে লাগল নানা রকম অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে, পুরানো দিনের গ্রামের কথা এনে নানাবিধ বাক্যবাণে জর্জরিত ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রল। কিন্তু অশালীন কথা সত্ত্বেও নিরঞ্জন মাথা তুলল না। তার কানের মধ্যে যেন জ্বালা ক'রতে লাগল অশ্রাব্য ভাষার কদর্য ভঙ্গীমার ধ্বনিতে। দু একজন অত্যুৎসাহী দর্শক ঝগড়াটা জমে উঠতে না পাবার জন্যে নিরঞ্জনকে দুয়ো দিতেও কার্পণ্য

ক'রল না। তবু মুখ তুলল না নিরঞ্জন।

ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সীতাকে চিৎকার থামাতে হ'ল। কিন্তু রাগে গজ গজ ক'রতে ক'রতে নদীর দিকে চলে গেল। বলে গেল ভিক্ষে সিক্ষে কিছু ক'রবে না সে, রান্নাও আর ক'রবে না। কারণ ভিক্ষে ক'রে এনে যাকে খাওয়াবে সে-ই যদি এরকম কথা বলে তো আর দরকার কি ভিক্ষে করবার? অনেক কষ্টে চুপ ক'রে রয়েছে নিরঞ্জন কাজেই সে কিছু বলল না নইলে আগের দিন হলে এক লাথিতে অমন মেয়েছেলের দাঁতগুলো সব ফেলে দিত না! আজ সে একটি মৃত সাপের মত। তাকে লাঠির আগায় ক'রে সরিয়ে দিলেও নড়বে না। দাঁতে দাঁত চেপে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে বসে রইল নিরঞ্জন। এখন তার গ্রামের দিনগুলোকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা যখন ডালে নুন বেশী হবার অপরাধেই ভাতের থালা কতদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নিরঞ্জন। তারপর বিনা প্ররোচনাতেই সীতার ঘন চুলগুলোকে ধরে টেনে মাটিতে আছড়ে ফেলেছে তাকে। আরও মনে আছে ডিঙ্গিচরের মেলায় গিয়ে দেশী মদ খেয়ে এসে একরাত্রে সীতার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিল কালী কেন শিবের বুকে চড়েছে। আর সে কৈফিয়ৎ না দিতে পারায় এক লাথিতে তিন হাত দূরে ফেলে দিয়েছিল সীতাকে। প্রায় সময়েই চোরের মত ভয়ে ভয়ে থাকত যে সীতা, আজ তারই কাছে এত লাঞ্ছনাও তাকে সহ্য ক'রতে হচ্ছে! সবই গ্রহের ফের। বরাত মন্দ হলে অনেক কিছুই সইতে হয় মনে ক'রে নিরঞ্জন নিঃশব্দে থাকাই সাব্যস্ত ক'রল।

সীতা চলে গেলে নিরঞ্জন ভাবতে লাগল তার সেই সেই পুরোনো দিন গুলোর কথা। ধানের পালা ভর্তি গাড়ী টানতো যোগেন মণ্ডলের মোষ জোড়া। বর্ষার সময় ক্ষেতের পথে গাড়ীর চাকায় বিরাট বিরাট খানাখন্দ হয়ে যেত আর সেই গর্তে পড়লে যখন মোষগুলোও গাড়ী টেনে তুলতে পারত না তখন এই নিরঞ্জনই একা কাঁধ দিয়ে চাকা ঠেলে সচল ক'রে তুলত সেই গাড়ীর চাকা। সে সব আজ স্মৃতি মাত্র। কি এক অদ্ভুত ব্যামোয় ধরে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই পেশী, সেই শক্তিই বা কোথায় গেল! দীর্ঘ শ্বাস পড়ল নিরঞ্জনের। দিনে দিনে হেঁটে বেড়াবার শক্তিও যেন নষ্ট হয়ে গেছে তার। যেটুকু আছে তাও যাচ্ছে। বিকালে একটু একটু ক'রে দিনের আলো যেমন ভাবে নিভে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে, তেমনি ভাবেই তার জীবন থেকে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। এতদিন এখানে সেখানে ঘুরছে কিন্তু শান্তিতেই ছিল। যত অশান্তি হয়েছে এইখানে এসে। হাঁটতে চলতে পারছে না বলে চোখ তো আর নষ্ট হয়নি! সে স্পষ্টই বুঝতে পারে চৌহদ্দীর বাসিন্দাগুলো

সীতার দিকে যখন তাকায় তাদের চোখ তখন লোভে চকচক ক'রতে থাকে। বাড়ীতে মাছ আসলে পালিত বেড়ালটা যেমন চারপাশে ম্যাও ম্যাও ক'রে ঘুরে বেড়াত এদের দেখেও সেই কথাই মনে হয় নিরঞ্জনের। ভয় পায়।

মদনও আজকাল ঘরে ফেরে না। ঘর তো নেই ডেরায় ফেরে না আজকাল। দিনে তো নয়ই রাত্রেও আসে না প্রায়ই। ঘর থাকলে ঘরে ফেরার কথা থাকে, খাবার থাকলে খেতে আসার চিন্তা হয়, খাদ্য এবং শোবার জায়গা দুটোই যখন জোগাড় ক'রে নিতে হয় তখন যেখানে জোটে সেখানেই সেদিনটা কাটিয়ে দেওয়াই ভাল এটা সে পল্টনদের সঙ্গে থেকে বুঝেছে। পল্টনরা দশ এগারোজন। সারাদিন যে যেখানে পায় ফেলে দেওয়া ভাঁড় কুঁড়িয়ে, খাবারের দোকানের সামনে শালপাতা চেটে খেয়ে বেড়ায়। কারও কারও ভাগ্য কোনদিন প্রসন্ন হলে কোন ভোজের বাড়ীর সন্ধান জুটে যায় সেদিন ভুরিভোজের ভুক্তাবশিষ্ঠ মেলে বাইরে ফেলে দেওয়া শালপাতার স্তূপে। সমস্যা হয় কুকুর তাড়ানো। কুকুরগুলো স্বাধিকারের চিন্তায় কিছুতেই সরতে চায় না। গরুগুলো অবশ্য একটু তাড়া দিলেই পালায়। তখন কেবল কুকুর-গুলোকে ভাঙ্গা মাটির গ্লাস ছুঁড়ে ভাগাতে পারলে পল্টনদের আর ভোজনের অসুবিধে হয় না। এসব জেনে শুনেই মদন সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে ওদের মধ্যে জুটে গেছে। কিন্তু কটাচোখ বেঁটে ছোঁড়াটা খুবই বদমাস বলে মদন ওর সঙ্গে পারতপক্ষে যায় না। শুধু মদনকেই নয় ওর সমান অথবা ওর চেয়ে বড় যদি দুর্বল হয় তবে যে কোন ছেলেকেই ধরে ধরে মারতে থাকে বদ ছেলেটা। অকারণেই মারে। আর ওই দক্ষিণ সারির টিকিওয়ালা হোটেলের মালিকটা ওকে আরও উস্কানী দেয়। মারতে লেলিয়ে দেয়। হোটেলওয়ালা রোজ রাত্রে কত রুটি তরকারী খেতে দেয় ছোঁড়াটাকে অথচ অন্য কোন ছেলেকে কোথাও কিছু খেতে দেখলেই এসে কেড়ে খেয়ে নেবে এমনই ছোঁড়াটা বজ্জাত। ওদের দলের মধ্যে যে ছেলেটা সবচেয়ে দুর্বল ওর কানে কি একটা ঘা হয়েছে সব সময় রস গড়ায়, রক্তপুঁজ থকথক করে সব সময়েই। হাতগুলোও সরু সরু—ঝাঁটার কাটির মত। কিছু খেতে পেলেই পেটটা বেলুনের মত ফুলে ওঠে, অন্য সময় চামড়া চুপসে কালো দেখায়। ঘায়ে যখন যন্ত্রণা হয় একা একা বসে কাঁদে, অন্য সময় রাসবিহারী এভেন্যু থেকে সুরু ক'রে হাজরারোডের মোড় পর্যন্ত সমস্ত পথটার খাবারের দোকানগুলোর সমনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এঁটো পাতা চেটে। মদনকে বলে দোস্ত। উচ্চারণ করে দোস্। কচিৎ কখনও ডেকে কথা বলে, দু চারটেই কথা বলে বেশী সময় চুপচাপ ক'রে বিষন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়। মদনই বেশী কথা বলে কেলো শোনে। দশটা কথার একটায় জবাব দেয় মাত্র। তবু মদনের ভাল লাগে কেলোকে; ভাল

লাগে ওই ঠাণ্ডা স্বভাবের জন্যেই। কেলো দুঃখ ক'রে বলছিল, রাতে ওই শালা কটা ঘুমোতে দেয় না দোস্‌।

কেনে রে? মদন জানতে চায়।

কি জানি। হারামীর বাচ্চারা আমাকে বলে 'শালা ঘেয়ো কুকুরকে ভাগিয়ে দেব'।

ওর জায়গা যে ও ভাগাবে? মদন শুধু এই প্রতিবাদটুকুই উচ্চারণ করতে পারার বেশী সাহায্য করতে পারে না।

কেলো মদনের কথার উত্তর না দিয়ে বলল, রাত্তিরে কোন আড়ালে লুকিয়ে শুয়ে থাকি শালা ঠিক খুঁজে বের ক'রে চুল ধরে টেনে তোলে। একদিন ঘুমোচ্ছি এসে এক লাথি মারল শালা।

তুই কিছু বললি না?

বলব কি? শালা মেরেই ভেগে পড়ে। একদিন হলে হয়, রোজ হারামীটা এইরকম করবে।

আজ আমার সঙ্গে শুতে যাস—।

কোথায় শুস তুই?

আমি ওই পুকুরের ধারে শুয়ে থাকি।

একা?

হ্যাঁ।

তোর তো বাপ-মা আছে—?

হ্যাঁ।

আমার মা থাকলে শালা আমি কিছুতেই একলা থাকতাম না।

তোর মা নেই বুঝি?

না রে। মাটা একদিন মরে গেল। বাবা আর একটা বিয়ে ক'রে নিয়ে এল। সে এসে আমাকে দেখেই প্রথম মুখ ভ্যাংচাল।

কেন?

কি জানি ভাই।

তুই কি বললি?

আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর রাত্তিরে খেতে দিয়ে বলল, এই ছোঁড়াটা অত ভাত কোথায় পাব? কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমার ছোট বোনটাকে ধরে বেশ কয়েক ঘা মার দিয়ে আমরা দুটো যে কেন মরিনি তাই জিজ্ঞেস করল। বোনটাকে অমন মারতে দেখে আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম আর বাড়ী যাই নি।

গেলি না কেন?

আমাদের বস্তির আশেপাশেই থাকতাম বস্তির ছেলেদের কাছে শুনতাম আমার বোনটাকে সারাদিন বকে।

কে বকে ?

ওই যে মা-টাকে বাবা বিয়ে ক'রে এনেছিল সেই। তারপর আমার এই মাটার পাঁচটা ছেলেমেয়ে হয়েছে সব আমার ওই ছোট্ট বোনটা কোলে ক'রে ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে এখনও বোধ হয় ঘোরে।

একটু থেমে কেলো বলেছিল, তোকে কি বলব দোস্, ছেলে মেয়ে একটু কাঁদলে আমার বোনটাকে কি মার যে মারত কি বলব। আমি বস্তির মধ্যেই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম।

তোকে কিছু বলত না ?

আমাকে দেখতে পেত না। একদিন বোনটাকে আমি ভিক্ষে ক'রে জমানো একটা টাকা দিয়েছিলাম। তাতে ভাই উল্টো কাজ হল। মা হাত মুচড়ে কেড়ে নিয়ে রোজ বেচারীকে ভিক্ষে করতে পাঠাতে লাগল।

তারপর— ?

একদিন বাবার সামনে পড়ে যেতেই বাবা আমাকে তেড়ে এল। তার গালাগালি আমি শুনতে পেলাম। সেই যে পালালাম আর কোনদিন ও দিকে যাই নি।

মদন কেলোর কথাগুলো শুধু শুনছিল কিছু বলে নি। যে কেলো কথা বলে না তার কথা শুনতে শুনতে সে আর নিজের ভালো লাগা না লাগার কথা বলতে পারে নি। বাপ মায়ের জন্যে তার নিজের কোন টান আছে মনে হয় না। মা ভিক্ষের জন্যে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, বাবা এক জায়গায় বসে থাকে চুপচাপ। মা খেতে চাইলে গালাগালি দেয় বলেই না সে ধীরে ধীরে খাবার খুঁজতে শিখেছে। মা তো বাবাকেও গালাগালি দেয়, বলে, জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমায়। নিজে তো মরবে না-আমাকে শেষ ক'রে তবে নিষ্কৃতি পাবে। মা যতই গালাগালি দিক খাবার দিলে বাবা আর কিছু বলবে না। খিদের সময় খাবার না জোগালেই বাবা কেমন দাঁত খিঁচিয়ে গালাগালি দিতে থাকবে। মদনও খিদে পেলে চেঁচাতো রাগ ক'রত হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি ক'রত কিন্তু মা সে সব গ্রাহ্য ক'রত না। একদিন বেশি ঝামেলা করাতে তাকে বেদম মার মেরেছিল তার মা। বলেছিল, হাত পা আছে খুঁটে খেতে পারিস না ? তার পর থেকে চেয়ে চিন্তে খেয়ে ফিরে যেত মার কাছে। ফিরতে ফিরতে একদিন পল্টনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর মা-বাবার কাছে গেল না। পরের দিন সকালে মা এসে খুঁজে ডেকে নিয়ে গেল। আবার দুদিন রাত্রে মার কাছে শুয়ে তৃতীয় রাত্রে সারারাত কেওড়াতলা শশ্মানের ধারে শুয়ে কাটাল আর একটা

ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটিই সেইরাত্রে পয়সা ঘুরিয়ে হাত চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, সামনা কি পিছু? মদন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিল ছোঁড়ার মুখের দিকে। ছোকরা তখন সবিস্ময়ে বলেছিল, ক্যা বে, খেলা নেহি জানতা? তারপর শিখিয়েছিল সামনা-পিছের খেলা। হাতের তলায় চাপা পড়া পয়সার সম্মুখ ভাগ যদি ওপর দিকে পড়ে তবে সামনা, মুদ্রা উপুড় হয়ে পড়লে পিছু। আর মদন যা বলবে যদি সেই ভাবেই পড়ে তবে হাতের তলের পয়সা মদন পাবে নইলে সমপরিমাণ পয়সা দিতে হবে তাকে। সেই রাত্রের খেলায় অনেক ক'টা পয়সা জিতেছিল মদন কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভাঙলে দেখল তার ইজারের পকেট শূন্য। তার পাশেও শূন্যতা। ছোকরা রাত্রে কখন উঠে চলে গেছে। জেতা পয়সার জন্যে নয় ভিক্ষেয় পাওয়া পয়সা ক'টির জন্যেই সেই দিন একটু কেঁদেছিল মদন। কেঁদে মার কাছে এসেছিল। তারপর আবার ধীরে ধীরে মিশে গিয়েছিল দলের সঙ্গে। আজকাল আর ফেরে না, মা বাবার কথা তার মনেও আসে না কখনো।

হাঁটতে হাঁটতে আজ চেতলার হাট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল মদন। টিপ টিপ বৃষ্টিতে সকালবেলা একটু ভিজলেও সব শুকিয়ে গেছে। কিন্তু অতবড় হাটেও তার কোন লাভ হয় নি। খাবার জোটেনি মন মত। যা জুটেছে সেটুকু নিজেদের এলাকায় থাকলেও জুটত। তাই বিকালের দিকে একলা ধীরে ধীরে ফিরছিল। পথের ওপরই বাতি জ্বলতে দেখছিল, হাজরা রোডের মোড় পর্যন্ত এসে দেখল অন্ধকার যেন আলোগুলোকে ঢেকে দিতে চাইছে। দু এক পা এগোতে না এগোতেই চড়বড় ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে সুরু হ'ল। মদন অনুভব ক'রল সারা শরীর বয়ে এমন একটা ক্লান্তি নেমেছে যে তার আর ভিজতে ইচ্ছে ক'রল না। কাজেই আরও অনেক লোকের মত মোড়ের বাড়ীটার গাড়ীবারান্দার তলায় আশ্রয় নেবার মন ক'রে এগিয়ে গেল। বৃষ্টি আর ছায়ার তলায় যে গরুটা দাঁড়িয়ে অর্ধেক ভিজছে তাকে পেরিয়ে ভেতর দিকে ঢুকতেই একজন লোক তাড়াতাড়ি একটু সরে গেল। তার পাশের লোকটি অমনি ধমকে উঠল, এই ছোঁড়া! গায়ের মধ্যে ঢুকছিস কেন রে?

মদন মুখ তুলে তাকাতেই সুবেশ ব্যক্তিটি নিজের পাশের মানুষটিকে বলল, যত সব নোংরা জানোয়ারগুলো—। মদন ধমক খেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। জলের ছাট এসে তার ছোট্ট শরীরের একপাশ ভিজিয়ে দিলেও সে ভেতর দিকে যেতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারান্দার তলায় খুঁজতে লাগল কেলোকে। এখানেই আজ রাত্রে শোবার কথা। যেখানেই থাকুক না কেন সন্ধের পর এখানেই আসবে সে। ভিড়ের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে অনেক খুঁজেও কেলোকে পেল না। তাবল ওপাশটা এখান থেকে দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে না বলেই হয়ত পাচ্ছে না কেলোকে। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে একটু ওপাশ দিয়ে অন্য কয়েকজন লোকের পাশ কাটিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে চশমার দোকানের দরজার পাশটায় গুড়িসুড়ি মেরে বসে পড়ল।

বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুম এসে পড়েছিল মদন বুঝতে পারে নি। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ রাত। তার পাশে একটা গরু শুয়ে আছে চোখ বুঁজে। আকস্মিকতায় ধড়মড়িয়ে উঠতে যেতেই গরুটার গায়ে ধাক্কা লাগল। গরুটা ঘুম ভেঙে কান দুটো কেবল একবার পেছন দিকে মেলে দিল। মদন নিজের মনেই উচ্চারণ ক'রল, ধুর শালা। কাকে যে গালাগালি দিল সে নিজেও জানে কিনা সন্দেহ। তারপর দুহাতে দুচোখ রগড়ে বসে চারিদিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল রাস্তাঘাট শুকনো খটখটে। সামান্য বৃষ্টির পর কখন যে জল পড়া থেমে গেছে সে সন্ধান পায় নি। কখন যে লোকজন সব ধীরে ধীরে নেমে গেছে বৃষ্টি ধোয়া পথের ওপর, কখন যে চলমান বাসের শব্দ আর ট্রামের ঘড়ঘড় শুনতে শুনতে দোকানগুলো আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে, কখন যে বাড়ী ফিরে গেছে দোকানীরা সে সবের কিছুই সে জানতে পারে নি। শুধু দেখল তার চারপাশে ঝুপড়ি অন্ধকার আর দূরের উঁচু বাতিদানগুলো প্রহরারত। দোকানী লোক ভাল নইলে নিশ্চয় তাকে তাড়িয়ে দিত দোকান বন্ধের আগে। একটু বদ লোক হলে হয়ত জল ছিটিয়ে দিত, ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়াল মদন। চারপাশে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল কেলো কোথাও শুয়ে আছে কিনা। হয়ত আছে। সারি সারি লোক সমস্ত গাড়ীবারান্দার তলাটা জুড়ে শুয়ে আছে। ওরই মধ্যে কোথাও কেলো নিশ্চয়ই আছে। এখন তাকে খুঁজে নেওয়া অসম্ভব। গেলে কেউ ঘুম ভেঙে উঠে চোর বলে পেটাতে পারে। উঠে দাঁড়িয়েই আবার সে শুয়ে পড়ল। মনে হল পেটটা চিন চিন ক'রছে। খিধে লেগেছে। কোথায় পাবে খাবার? এত রাত্রে হোটেলগুলোর সামনের এঁটোপাতাও কি আর অবশিষ্ট আছে? পল্টনেরা চেটে চুটে যা ফেলে গিয়েছিল তা এতক্ষণে গরুতে শেষ ক'রে দিয়েছে। দুবার এপাশ ওপাশ ক'রতে ফিরতি ঘুম আসতে দেরী হ'ল না।

দিনে দিনে সীতা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল এবং যেটুকু সহিষ্ণুতা তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাও ক্রমান্বয়ে কমছিল প্রতি মুহূর্তে। অতি তুচ্ছ কারণে নিরঞ্জনকে আক্রমণ ক'রে মনের আক্রোশ কিছুটা মেটাতে পারে সীতা, অকারণে কটু কথা শোনাতে পারলে যেন মনের ভার তার হালকা হয়। তায় ভিক্ষে আজকাল একেবারে মেলে না। যে দেয় সেও যেন অনিচ্ছা সত্বে দেয় প্রাণ খুলে দেয় না। আরও পুরেনো ভিখিরিরা সবাই আক্ষেপ ক'রে অতীতের

সঙ্গে তুলনা করে, এমন কি কবছর আগের সঙ্গে তুলনা ক'রে হতাশা প্রকাশ করে। সীতার কোন অতীত অভিজ্ঞতা না থাকায় সে শুধু শোনে। বিকাল বেলায় সেই কথাই কালা বুড়ি আর একজনকে বোঝাতে চাইছিল—সে সব কি দিনই ছ্যাল গো।

যে বুড়িটিকে বলা হচ্ছিল তার শোনবার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলেই বোধহয় অত জোরে কথা বলছিল কালা বুড়ি। যাকে বলা হচ্ছিল, সেই হাড়ের বুড়িটির একটা পা অনেকদিনই পক্ষাঘাতে অক্ষম হয়ে তার চলচ্ছক্তি লুপ্ত ক'রে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে শরীরের আরও কিছুটা পক্ষাঘাতাক্রান্ত হবার পর একদিন বুড়ি উত্থান শক্তি রহিত হয়ে যায়। তার আগে পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবাটি সংসারের কর্তৃত্ব হারিয়েও ছেলের কাছেই থাকত। যখন শরীর অচল হয়ে পড়ল তখনই বুঝল বাড়ীতে সে বড়ই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তারপর যখন সে তার কনিষ্ঠ নাতিটিকে পর্যন্ত কোলে নেবার ক্ষমতা হারাল তখনই ধীরে ধীরে পথে নেমে আসতে হল তাকে। আগে ছেলের বউ মাঝে মাঝেই মুখ ক'রত এখন অহরহ গঞ্জনা দিতে লাগল। ছেলে একদিন বাড়ী এসে রাগ ক'রে সদর দরজার বাইরে বের ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে অসহায়তায় অনেক চোখের জল ঝরাল বুড়ি, ছেলের অকল্যাণ হবে বলে কান্না চাপার অনেক চেষ্টা ক'রেও থামাতে না পেরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে আর ফিরে যায় নি। এর মধ্যে সর্বক্ষণ ভগবানকে ডেকে আত্মসমর্পণ ক'রেছে ভগবান নেয় নি বলে এখন ডাকতেই ভুলে গেছে। এখন আর ছেঁচড়েও চলতে পারা সম্ভব হয় না বলে দিগম্বরী বৃদ্ধা জীর্ণ বিবর্ণ কাপড়টা কোনক্রমে গায়ের ওপর ফেলে এক জায়গাতেই বসে থাকে। একটুখানি এগিয়ে ভোরের বেলা নর্দমার ধারে মলত্যাগ ক'রে সকালে ধাঙড়ের গালাগালি নিঃশব্দে সহ্য করে। সারাদিন তার চারিদিকে মাছি ভ্যান ভ্যান করে, ঘুমিয়ে থাকলে দু একটি দুঃসাহসী কাক এসে মৃত মনে ক'রে ঠুকরেও যায়।

সীতা অন্যদিনের চেয়ে আজ আরও গভীর ভাবে দেখছিল বুড়িটিকে। কারণ সময় ছিল আজ। তার বারংবার মনে হচ্ছিল বুড়িটা মরে না কেন—মরলে তো বেঁচে যায় অথচ কি কঠিন প্রাণ যে কিছুতেই বেরোতে চায় না! আর ভাবছিল ভগবান কখন যে কাকে কি অবস্থায় ফেলেন কেউ কি বলতে পারে? তার নিজের কপালেই যে কি আছে কে সেকথা জানে? এই তো আধমরা স্বামী আর দুধের শিশু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কত আশা ছিল কলকাতায় বড় বড় হাসপাতাল সেখানে দেখিয়ে মানুষ-টাকে ভাল ক'রে নিয়ে আবার সে বাড়ী ফিরবে; তা কি হ'ল? মানুষটা

তো ভাল হ'লই না উপরন্তু ছেলেটাও আজকাল অবাধ্য, কাছেই আসে না। আজ আটদিন হ'ল কোথায় যে গিয়েছে তার আর কোনই হদিস নেই। যত ছেলেকে দেখছে জিজ্ঞেস ক'রছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এর আগেও মাঝে মাঝে ডুব দিয়েছে কিন্তু এতদিন না এসে থাকে নি। বেশ কয়েক দিন ভুলেই ছিল সীতা কিন্তু কাল থেকে মন তার উতলা হয়ে পড়েছে। যে গাড়ী ঘোড়া কলকাতার রাস্তায় তাতে চাপা পড়তে বাধাটা কোথায়? কত বুড়ো মদ্দ চাপা পড়ে থেঁতলে যাচ্ছে আর ওইটুকু বাচ্চা—। এই বুড়িটিকে দেখে যেন দুশ্চিন্তা তার বেড়েই গেল। নাঃ আজ সে খুঁজবে। যেখানে হোক খুঁজে নিয়ে আসবে মদনকে। ওই তো তার অন্ধের নড়ি। ওটুকুকে নির্ভর ক'রেই তো ভবিষ্যতে পথ চলতে হবে।

কিন্তু খুঁজবে কোথায়? কোথায় তার হদিস মিলবে? পশ্চিমের ফুটপাথ ধরে উত্তর দিকে চলতে সুরু ক'রল সীতা। টালিগঞ্জ আর বালীগঞ্জ লেক যাবার দুটো রাস্তা যেখানে আলাদা হয়ে গেছে ওখানটায় রাস্তা অনেক চওড়া এবং ফাঁকা। সীতা অনেকদিন বাদে এল এখানে, দেখল, তাদেরই মত অসংখ্য পরিবার দক্ষিণের গ্রামগুলো থেকে চলে এসে পথের ওপরেই আস্তানা গেড়েছে। সীতা অবাক হয়ে গেল, এত লোক একসঙ্গে আসবার কারণ কি? বেশ কিছুদিন ধরে সে দেখতে পাচ্ছে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরা বাবুরা প্রতি রবিবারে রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে আবার কথাবলার যন্তর নিয়ে চেঁচিয়ে বলছে কোথায় না কি দুবছর বৃষ্টি হয় নি তাই সেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তাদের জন্যে কাপড় দাও, চাল দাও, পয়সা দাও, যা পার দাও। দেশটার নামও বাবুরা বলে সে শুনেছে বুঝতে পারে নি। তবে কি তাদের দেশেই তাই হয়েছে? বৃষ্টি হয় নি হালের বলদ ঘাস না পেয়ে মরছে, মানুষ তাহ'লে বাঁচবে কি ক'রে? দু এক পা এগিয়ে গেল সে একটা একলা বসে থাকা বউএর দিকে। অতি সন্তর্পণে প্রশ্ন ক'রল, তোমাদের ঘর কোথা গো?

সি দখ্‌নে—বৌটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দিল। মাথার চুলগুলো তেলের অভাবে শনের মত হয়ে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় বাসা বেঁধেছে উকুনেরা। তারই কামড়ে বেচারী বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই দুই হাতে ক্রমাগত চুলকাতে গিয়ে সীতার কথার জবাব খুব স্পষ্ট হ'ল না, সীতা তবু বুঝল। তাই আবার জানতে চাইল, কোন গেরাম?

ছন্দের মাঠ, কাকদ্বীপ।

সে কি! ওদিকে আকাশবৃষ্টি হয় নে? জমিতে চাষ নাই?

জমিতে ধান ওঠবার দেরী তো আছে। গাঁয়ে একটা দানা নাই কারও ঘরে। খাবো কি? তিনটাকা দিলে এক সের চাল।

সীতা কিরকম ঘাবড়ে গেল। তাহলে কোথাকার কথা বলে ভদ্দর লোক-গুলো! কোথায় জমিতে ঘাস পর্যন্ত নেই? সমস্ত মাঠ আগুনে পুড়তেছে? কোথায় জলের অভাবে মানুষ বুক ফেটে মরতেছে? সে কোনখানে? ঘরে চাল না থাকার অভিজ্ঞতা অবশ্য তারও, সে জানে ফসল ওঠার কিছুদিন পর চাষীদের জীবন ফসল আর তাদের ঘরে থাকে না। ক্ষেত মজুররা ধানগুলো তুলে জমির মালিকদের গোলায় ভরে দেবার পর তাদের নিজেদের খাবার চাল কিনেই নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সীতার ঘরে চাল রাখবার একটা ছোট্ট মাটির কলসী ছিল কোনদিনই ভরে নি সেটা। কিন্তু সীতা অবাক হ'ল এই জন্যে যে কোন বছরই তো এইভাবে গ্রামের সমস্ত মানুষই কলকাতা চলে আসে নি! অথচ তাদের ওদিকে তো অনাবৃষ্টিও হয়নি, তবে? প্রশ্ন ক'রল বউটাকে, জানল গ্রামের চাল সব ভিন দেশী মানুষ গিয়ে বেশী দামে কিনে নিতে লাগলে চালের দাম এত বেড়ে গেল যে আর কিনে খাবার উপায় রইল না। কাজেই অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সবাই চলে এসেছে।

সীতা ব্যথিত হ'ল। এই যে যার ঘর ছেড়ে এসেছে, পারবে কি এরা আবার ঘরে ফিরতে? পারবে না। সীতা পারে নি। প্রথম প্রথম আশা ক'রত এখন করে না। হঠাৎ সীতার নজরে এল ওপাশে যে পরিবারটা গাছের তলায় জায়গা ক'রে নিয়েছে ওদের সঙ্গে একটা সোমথ মেয়ে আছে। সবে যৌবন আসছে মেয়েটির। ইস্, সীতার দুঃখ হ'ল, এই মেয়ের কি যে হবে সে আজ ভাবতেই পারছে না। এই কলকাতায় যৌবন বিক্রি হয় বড় তাড়াতাড়ি। কোনদিন যে কে এসে ফুসলে বা চুরি ক'রে নিয়ে যাবে আজ সে কথা ভাবতেও পারা যায় না। অথবা এমনও হতে পারে রেখার মত এ মেয়েটিও একদিন নিজে থেকেই গলির রাস্তা চিনে নিতে পারবে। রেখা মেয়েটা দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল! পেটটা কি অসম্ভব বড় হয়ে গেছে ছুঁড়িটার। শীগগিরই বাচ্চা-কাচ্চা হবে। ওই নিয়েই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়—কতটা বেহায়া হলে যে পারে সীতা তা ভেবে পায় না। মিঠাইওয়ালা নাকি ওকে রাখবে বলেছিল সে রাখে নি, উপরন্তু দেশে পালিয়েছে। পেটটা এত বড় হবার আগে পর্যন্ত রোজ রাতে বেহায়া ছুঁড়ি ওই বিশ্বাসঘাতক মিঠাইওয়ালার সঙ্গেই শুতে গেছে তার দোকানে। সীতা আশ্চর্য হয়ে যায়। আজ কদিন মার কাছেই ছুঁড়ি শোয়, ওই চটির মধ্যে। খোঁজ খবর নিয়ে সীতা জেনেছে মিঠাইওয়ালা দেশে গেছে বলেই নাকি এই ব্যবস্থা। রেখার মা রেখার এই অবস্থার প্রথম প্রকাশ পেতে কি গালাগালিই না দিয়েছিল, কি চিৎকার করেছিল, গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল মেয়ের, তারপর কোন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছে। আজ ব্যাপারটা খুবই সহজ বলে মনে হয় সকলের

কাছে। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছিল ছোঁড়াগুলোর উৎপাতের সময়। রেখার গোপন দেহদানের খবর প্রকাশ হয়ে পড়তেই প্রত্যেক রাত্রে ও দিককার ছিঁচকে চোর ছোঁড়াগুলো এসে খুঁজত রেখাকে। ভয়ে দিনের বেলা পর্যন্ত রেখা ওই ঝুপড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকত।

গ্রামের এখনও সবুজ মেয়েটাকে দেখে রেখার ছবি মনে পড়ে গেল। কে জানে সেই একই ভবিষ্যৎ আবার এই কচি মেয়েটার জন্যেও লেখা আছে কিনা। এদের সকলের জন্যেই দুঃখ বোধ ক'রল সীতা। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে সে সামনের দিকে পা বাড়াল।

একটু এগিয়েই টালিগঞ্জের রেল পোল। নতুন পোল, তলা দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণে। সেই পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সীতা। নাঃ এখানেও নেই। জায়গাটা বেশ চকচক ক'রছে, কোথাও কোন স্তূপীকৃত গৃহস্থালী সরঞ্জাম নেই যে তাদের মত কাউকে প্রশ্ন করবার জন্যে পাওয়া যেতে পারে। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরল। সাম্ভাব্য সকল স্থান খুঁজে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল, হদিস মিলল না। অনাহারে অভ্যস্ত হয়ে যাবার জন্যে আজ আর সারাদিন না খেলেও তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার। ক্যাওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে একটু দাঁড়াল, ভাবল নিজের আস্তানায় ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। রাত্তিরে যা হোক দুটো খেতে হবে। কিন্তু কি খাবে? চাল ভিক্ষেয় এক কণাও মেলে না। পয়সা দেয় লোকে কিন্তু পয়সা দিয়ে চাল কিনতে পাওয়া যায় না। আটা পাওয়া যায় দুটাকা দিলে এক কিলোগ্রাম। সে আটার মধ্যে যে কিসের গুঁড়ো থাকে মুখে দিয়ে তার হিসেব মেলে না। তার ওপর রুটি খাওয়া এখানে এসেই যা অভ্যেস হয়েছে, তাদের দেশে থাকতে কখনও রুটি তৈরী ক'রতেই শেখে নি। তবু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এখন আর উপায় কি?

সীতা ফিরে এসে দেখল নিরঞ্জন চুপচাপ শুয়ে আছে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সীতারও পা দুটো ব্যথা করছিল। সে আর দাঁড়াতেও পারছিল না বলে এসেই বসে পড়ল। নিরঞ্জনকে প্রশ্ন ক'রল, হ্যাঁ গা, শুয়ে আছ কেনে?

নিরঞ্জন জবাব দিল না। সারাদিন সীতা না থাকায় ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। দুপুরে তার পুরানো দিনগুলোর কথা মনে পড়েছিল। মাঠে যখন সে কাজ ক'রত সীতা কত কথা শুনতে চাইত আর এখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে সীতা একবার দেখে না সে কি খেল বা খেতেই পেল না সারাদিন।

নিরঞ্জনের জবাব না পেয়ে সীতা আবার প্রশ্ন ক'রল—কি, ঘুমুলে? কথার জবাব দাও না কেনে? —গায়ে হাত রাখল সীতা।

নিরঞ্জন অমনি বিরক্তি প্রকাশ করে উঠল, সারাদিন ক'থা ঘুরে বেড়ালি? মদনকে মিলতেছে না। তাকে খুঁজতেছিলাম —।

সে কুনদিকে ঘুরতেছে কথা মিলবে তাকে ?

ইদিক সিদিকে কত দেখলাম, মিলন নি।

মিলল নি তো আমাদের খেতে দেতে হবে নি ?

সীতার মন বড়ই খারাপ ছিল মদনকে না পেয়ে। খাওয়া দাওয়া তার ভাল লাগছিল না। নিরঞ্জন খাওয়ার প্রসঙ্গ তোলাতে সে বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার মুখ কি আমি আটকে রেখেছি ? তুমি খাও না কেনে ?

এবার নিরঞ্জনের চোখ থেকে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে কি উঠতে চলতে পারছে যে উঠে খাবার জোগাড় ক'রবে ? অনেক কষ্টে একবার বসতে চেষ্টা ক'রেছিল কিন্তু মাথাটুকু পর্যন্ত তোলবার শক্তি পেল না। কাজেই সারাদিন একইভাবে পড়ে আছে। রোগের যন্ত্রণা আর ক্ষিধের যন্ত্রণা মিশে পেটের মধ্যে যন্ত্রণার কুম্ভ রচিত হয়েছে যেন। সেই কুম্ভ থেকে যন্ত্রণা নির্গত হয়ে সমস্ত শরীরকে কেমন অবশ ক'রে দিয়েছে। কথাগুলোও সে খুব ধীরে এবং অস্পষ্ট স্বরে বলছিল। সীতা নিরঞ্জনের চোখে জল দেখে ব্যথিত হ'ল। সহানুভূতি সহকারে সে নিজের মনেই বলল, আমিই পড়েছি যাতনায়। ইদিকে ছেলে কোনপানে যায় তাকেই দেখি, না একেই দেখি। কি যে করি আর ভাল লাগে না। কোমর থেকে গুঁজে রাখা আঁচল টেনে বের ক'রল সীতা। গুণে দেখল সাকুল্যে বিরানব্বই পয়সা আছে। তার মধ্যে থেকে একটা সিকি বের ক'রে হাতে নিয়ে আটার চাকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চাকির মালিক আপন নিটোল দেহটির ওপর একটি অতি মূল্যবান গেঞ্জীমাত্র চাপিয়ে বেচাবিক্রী ক'রছে। সীতার সম্মুখে আরও দুজন লোক থাকায় সীতা দাঁড়িয়ে দেখবার সুযোগ পাচ্ছিল এবং যতক্ষণ সুযোগ পেল সে শুধু দোকানদারের তেলচকচকে ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানদার গেঞ্জীটাকে ওপর দিকে তুলে নধর ভুঁড়িটা অকারণেই উন্মুক্ত ক'রে রেখেছিল। সীতা ভাবছিল ভুঁড়িতে হাওয়া লাগাচ্ছে, বড়লোকের দেহ—। খরিদ্দার দুজনের মধ্যে একজনের গা খালি বলে সীতা তারও শরীর দেখতে পাচ্ছিল ঠিক তাদের গ্রামে গরুর গাড়ীচলা কাঁচা রাস্তার মত। গর্ত। সীতা কখনও নিজেদের তুলনা আনে না। শহরের অধিবাসী আর পথিকদের কথাই ভাবে। নিজেরাও যে ওদের মত মানুষ এ ধারণাই তার যেন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। সে তাই ভুলে গেছে যে দ্বিপদ প্রাণী হিসেবে সেও ওদের তুল্য।

কিতনা ?—দোকানীর হাঁকে সীতা সিকিটা তার প্রসারিত হাতে তুলে দিল। সেটার দিকে তাকিয়ে দোকানী অর্ধ বিস্ময়ে হিন্দিতে বলল, দুটাকা কিলো। চার আনাকা আটা হবে না।

দুটাকা! সীতা যেন চমকে উঠল। চাল সাড়ে তিনটাকা তাও মেলে

না। চালের কথা ভুলে তাই আটার দিকেই চেয়েছে মানুষ তারও দাম এমনি· ক'রে বাড়লে—। সীতা আর ভাবতে পারে না কি হবে। সারাদিনের অনা-হারের শেষে আর ভাববারই বা অবকাশ কোথায়। অনুরোধ ক'রল সে, কিছু কম হবে না বাবা?

ভাগো, ভাগো—দোকানদার তাকে ধমক দিয়ে একজন লম্বা গোঁফওয়ালা আগন্তুককে আমন্ত্রণ জানাল—আও ভাইয়া।

নতুন খরিদ্দার হাতের মুঠোর অনেকগুলো নোটের মধ্যে থেকে একখানা পাঁচটাকার নোট বের ক'রে ছুড়ে দিয়ে বলল—দু কিলো।

সীতা চুপচাপ তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে। সে যেতে না যেতেই বেশ লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা অন্য একজন এল। একে দেখে সীতার চেনা মনে হ'ল, কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে। এ নিঃশব্দে একটা একটাকার নোট ফেলে দিল এবং সীতা অবাক হয়ে দেখল দোকানদার এক কিলো আটা মেপে দিল তাকে। তখনও সীতার মনে প্রশ্নটা ঘুরছে একে কোথায় দেখেছে—? এবং সে পেছন ফিরতেই মনে হ'ল একে রাস্তায় পাহারা দিতে দেখেছে। লোকটি পুলিশ। পোষাক পরা অবস্থায় দেখেছে বলেই চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু এই একটাকায় এক কিলো আটা পাওয়া যায়! তারা কি পাবে? তা পাবে না। বাধ্য হয়েই সীতা আঁচলের গেরো খুলে আরও পঁচিশটা পয়সা বের ক'রল। দোকানদারকে বলল, এক পো দাও—।

দোকানদার সামনের টিনটা থেকে আড়াই শো গ্রাম আটা ওজন ক'রল, অন্য সব লোককে পেছনে রাখা একটা টিন থেকে আটা ওজন ক'রে দিচ্ছিল অথচ তাকেই একমাত্র সামনের টিন থেকে দিল। এই পার্থক্যের কারণ সে বুঝতে না পেরে বলল—ওই আটা দাওনা বাপু—।

এ হি মিলে গা—খিঁচিয়ে উঠল দোকানদার।

সকলকে যে পেছন থেকে দিচ্ছ—?

অকারণ বাক্য ব্যায় না ক'রে ওজন করা আটা ঢেলে রেখে ধমক দিল—ভাগ মৌউগী। উধার দেখ।

সীতা এমন অসুবিধেয় পড়বে আগে বোঝে নি। বড় অসহায় ভাবে সে প্রশ্ন ক'রল, ঢেলে রাখলে ক্যানে, হ্যাঁ গা? আমি কি নেব না বলেচি?

দোকানদার নিজের মাতৃভাষায় বেশ কিছু পরিমাণ কটূক্তি ক'রতে ক'রতে আবার ওজন ক'রে দিল। সীতা পাঁচটা পয়সা কম দিতে চাইবে ভেবেছিল ভয়ে ভয়ে তা আর সাহস ক'রল না।

এই শহরে ঋতু বদল বোঝা-ই যায় না। কবে যে বৃষ্টিঝরার কাল শেষ

হয়ে গিয়ে আকাশে বাতাসে রোমাঞ্চ এসেছে এখানে তার কোন হদিসই মেলে না। কিন্তু নিবারণের খেয়াল ছিল। দেশে বউ ছেলে মেয়ে রেখে বরাবরই অনাবাদী সময়টা সে কলকাতা চলে এসে মজুর খাটে। বউ গ্রামের বাড়ীতেই ছেলে মেয়ে আগলায় আর গৃহস্থ বাড়ীতে ফাইফরমাস খাটে। নিবারণ মাঝে মধ্যে যে দু চার টাকা পাঠায় তাকেই জোড়াতালি হিসেবে লাগিয়ে স্বোপার্জিত ধান-চা'টা দিয়ে মজা পুকুরের কলমীর শাক কুড়িয়ে ছেলেপিলেদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই নিবারণের ঠিক হিসেব থাকে। কলকাতাতে থাকলেও তার পুঁথিপড়া বিদ্যাশূন্য মস্তিষ্কে হিসেব থাকে কখন জমিতে চাষ দেবার আর নিড়েন চালাবার লগ্ন আসছে। কখন মরশুম আসছে ফসল কাটার। তাদের দেশের জমিতে একবারই ধান হয়। আউশ হয় না। কিন্তু নিবারণদের গাঁয়ের বড় জোতের মালিক শামসুদ্দীন আউস ধান করে। তার জমিতেই ক্ষেত মজুরের কাজ নিবারণের। তাই কলকাতায় আকাশছোঁয়া অট্টালিকার তলে শুয়ে থেকেও নিবারণ ফসল কাটার আমন্ত্রণ শুনতে পেল। অমনি মন উচাটন হয়ে উঠল ঘরের জন্যে। ইদানীং সে অনেকদিন দেশে যায়নি। সব কেমন আছে কে জানে। গত রবিবারেই সে চলে যেত কেবল মিস্ত্রি হিসেব দিল না বলে যেতে পারেনি। আসছে শনিবার মিটিয়ে দিলেই সে চলে যাবে রবিবার সূর্যের আলো না বেরোতে। এবার এসে মইনুদ্দিন মিস্ত্রির কাছে কাজ ক'রে অনেক-গুলো টাকা বাকী পড়ে গেছে, না তুলেও সে যেতে পারছে না। একবার যদি বাড়ী যায় ফিরে এসে আর বকেয়া টাকা পাবে না—নিয়ম নেই। এই বেআইনী আইন রোজ মজুর মহলে চলে আসছে অনেক দিন ধরেই। কাজেই টাকাটা নিয়ে তবেই বাড়ী যেতে পারবে। হাতের বিড়িটা বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলল নিবারণ। অন্য সময় হলে এই বিড়িটা আরও কিছুক্ষণ সুখস্বাদে টানতে পারত। বিড়ি নিভিয়ে ফেলবারই অভ্যেস তার। এবার ব্যাতিক্রম হওয়াতে তার মনে যেন অপরাধবোধ বিঁধতে লাগল। জ্বলন্ত বিড়ি ফেললে খামারে আগুন ধরে যায় খড়ের গাদায় পড়ে। বাবার কাছে ক্ষেত খামারের কাজ শেখার সময়েই সে বাবাকে বিড়ির ক্ষুদ্রতম টুকরোটা মাটিতে টিপে নিভিয়ে ফেলতে দেখত। সেই সময়েই নিবারণ বিড়ি খাওয়া এবং বিড়ির টুকরো নিভিয়ে ফেলা শিখেছিল। আজ সেটা অভ্যাসে পরিণত। এবং না নিভিয়ে ফেলে দেবার জন্যে তার স্বতই মনে হচ্ছিল সে যেন খামারেই বসে আছে, হয়ত এখনই তার বোকামীর জন্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠবে। বিমর্ষ হয়ে পড়ল নিবারণ। সে যেন স্পষ্টই দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলতে দেখতে পাচ্ছে। সে বাপের সেই মটকার মাঠের অড়হরের পাঁজায় আগুন। কি ক'রে যে লাগল কেউ বুঝল না। আগুনটা যেন খেসারীর ক্ষেত দিয়ে দৌড়ে গ্রামের

দিকে আসতে লাগল। রাতের বেলায় কে যে প্রথম চেঁচিয়ে উঠল হিসেব নেই। নিমেষের মধ্যে আতঙ্কের ঐকতান উঠল গ্রামের আকাশ বিদীর্ণ ক'রে। ছেলে বুড়ো যুবতী কারও কণ্ঠ নিঃশব্দ রইল না। ঘর ফাঁকা ক'রে অনেকেই দৌড়োল, হরিসাধন দৌড়োল বউ ছেলে মেয়ে সব ফেলেই। কেবল মাত্র বুড়ো মোড়ল আহাসেন মিয়া সাঙ্গাৎ মিয়া আর যোগেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের আল বরাবর শুকনো খেসারী কেটে সাফ ক'রতে লেগে গেল এক একজনে দশ জোয়ানের শক্তি নিয়ে। তাদের পেছন পেছন মানিক দলুই, রসুল শেখ, তমিনুদ্দিন দৌড়োল আগুনটাকে লক্ষ্য ক'রে। আগুনটা আসতে আসতে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বলে গ্রাম বেঁচে গেল। কিন্তু নিবারণ আজও তার স্মৃতিতে সেই ভয়ানক আগুন জ্বলতে দেখে।

সেই স্মৃতির আগুন তার মনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দেয়। আজও তাই দিচ্ছিল। নাঃ আজ মইমুদ্দিনকে ধরে যে ক'রে হোক টাকা নিয়ে বাড়ী চলে যাবে সে। আর একদিনও থাকবে না। মইনুদ্দিন যদি পুরো টাকা না-ও দিতে পারে তবু নিবারণ চলে যাবে। যা দেবে তাই নিয়েই যাবে। এবার অনেক দিনই এসেছে। আসবার সময় বউটাকে অমন অবস্থায় রেখে এসেছে এতদিন কি হ'ল কে জানে। বড় ছোঁড়াটার জ্বর হচ্ছিল সারল কি বাড়ল তাও হদিস পায়নি। খবর নিতে অবশ্য পারত তাহলে দুদিন রোজ কামাই করতে হ'ত। তা ক'রলেই বা চলবে কি ক'রে? তিন টাকা রোজ কাজ, চারটাকার কম তো খাওয়াই হয় না। সে জায়গায় পশ্চিমাদের কাছে একবেলা ছাতু কিনে আর একবেলা ভাত ফুটিয়ে খেলে কোনরকমে নয়-দশ সিকেতে হয়। দুদিন কাজ কামাই করলে একদিন উপোস দিতে হবে। সেই নিমতলার কাঠ চেরাই কলে গিয়ে দাঁড়ালে জয়নালের বউ কিংবা আতরের চাচীর সঙ্গে দেখা হতে পারে। তাদের বললে পরের দিন কাঠের কুচো নিতে আসবার সময় তার বউ এর সঙ্গে দেখা ক'রে বাড়ীর খবরটা এনে দিতেও পারে। ওরা তো প্রায় রোজই কাঠের কুচো নিতে আসে ওখানে। সারাদিনে তিনটে টাকাই খরচা হয়ে যেতে চায়। কত কষ্টে যে মইনুদ্দিনের কাছে এই সামান্য টাকা কটা জমেছে তা কেবল সে-ই জানে। যে কদিন ধর্মতলায় কাজ হচ্ছিল কাজ শেষ হতে না হতেই পাউরুটির জন্যে লাইনে দাঁড়াত প্রায় তিনশ জনের পেছনে। রুটি পেতে পেতে অনেক রাত হয়ে যেত তখন ওই তেত্রিশ পয়সার রুটি কিনে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত ভবানীপুর। চায়ের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি সময় পৌঁছে এক ভাঁড় চা পানের পয়সা দিয়ে কিনে রুটিটা খেয়ে কোন বারান্দার তলায় রাত কাটিয়ে দিত। কিছুদিন ধর্মতলায় কাজ চলেছিল আর প্রায় দিনই রুটি পেত বলেই টাকা কটা জমেছে। নইলে

সবই খরচ হয়ে যেত। পেটভাতায় কাজ ক'রে শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে যেতে হত। ছেলেপিলেগুলো তার আশায় চেয়ে থাকলেও এক কিলো চাল কিনে দিতে পারত না সে তাদের জন্যে। একটাই মাত্র শাড়ীতে কোনরকমে মনের লজ্জা ঢাকছে বউটা। শাড়ী কেনা আর এবারও হ'ল না। ট্রেনের টিকিটে ক'টা টাকা না লাগলেও কচি ছেলেটার একটা জামা কিনতে পারত। কিন্তু না তার কাজ নেই। সেবার জয়নাল টিকিট না কেটে যেতে গিয়ে হাজত খেটেছে ক'দিন। সে আবার উল্টো বিপত্তি। অথচ কত বাবু মশাই টিকিট কাটে না, দূর দূর যায়। টিকিট বাবুর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে দিব্বি পেরিয়ে যায় স্টেশন। যত মুস্কিল তো এই গরীব লোকের কিনা! এই তো এই কলকাতা শহরেও বাবুদের জন্যে রেশনকার্ড আছে। কার্ডে বাবুরা সস্তায় চাল পাবে; গম পাবে চিনি পাবে আরও কি কি পায় কে জানে। বাবুরা সব অফিসে চাকরী করে এত এত টাকা পায় কিনা তাই ওদের জন্যে সস্তার ব্যবস্থা। আর নিবারণরা তাদের গ্রামেও রোজগার নেই বলে রেশন নেই, শহরে সামান্য ক'টাকা দিন মজুরীর জন্যে এসেছে এখানে তাদের রেশন কার্ড নেই।

এই সব আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে নিবারণের মনে হ'ল শহুরে বাবুরা যেন গ্রামের সঙ্গে চক্রান্ত করেছে। যে কটা টাকা তারা এখানে এসে রোজগার ক'রবে তাদের আর বাড়ী নিয়ে যেতে দেবে না শহর থেকে। বাবুরা সব রেশন কার্ডের ভাত খাবে আর তারা তিনটাকা রোজগার ক'রে তিনটাকাই রোজ খরচা ক'রতে বাধ্য হবে বেঁচে থাকবার জন্যে। এক কিলোগ্রাম চাল সাড়ে চারটাকা। কাজেই তিনটাকাতেই বা পেট ভরে খাওয়া হবে কি করে? রুটি খাবার জন্যে আটা জোগাড় ক'রতে হলেও তাকে চুবি করে কিনতে হবে এক কিলো আড়াই টাকায়। এই চার পাঁচ দিন আগেও দাম ছিল দুটাকা। বাড়তে বাড়তে আড়াই হয়ে গেল। নাঃ বাঁচতে আর দেবে না। আর সে সে কলকাতা আসবে না। এসেই বা লাভ কি, পেটও ভরে না আবার পয়সাও বাঁচে না। এভাবে মরতে হয় তো নিজের গ্রামেই মরবে। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে নীলকেষ্টর সম্বন্ধীর মত। এখন নিবারণ বুঝতে পারছে কি যন্ত্রণায় গোষ্ট তাকে বলেছিল, আর পারি না নিবারণদা ইচ্ছে করে ছানাপোনাগুলোর গলা টিপ্পে নিজে গে মা গঙ্গায় ডুইবে মরি। এ আর সহ্য হয় না নিবারণদা, পেট জ্বলে। হু হু ক'রে জ্বলে। কামড়ে কামড়ে ধরে। ছানাগুলোন চ্যাচায় কাঁদে। ওদের মা বলে আমারে। সে মাগীরই কি আর কিছু আছে, তার আর খাবে কি? অতগুলোন ছানা পোনা তার সব তো টেনে টেনে খেয়ে নেচে।—শুধু গোষ্টের বউ-এর নয় তার বউ-এরও কেবল হাড় গুলোই অবশিষ্ট আছে আর সবই চুষে খেয়েছে ছেলেগুলো। এবার যেটা

আসছে সে যে কি খাবে কে জানে? ছেলেবেলায় একবার মাংস খেয়েছিল নিবারণ। হাড চুষতে খুব ভাল লেগেছিল তার নতুন ছেলেও তাহলে হাড চুষেই খাবে। যাক মরুক গে যা হবে তা হোক। ওসব ভেবে কি লাভ। নিবারণ আর একটা বিড়ি ধরাল। সামনে দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল তার হাতে ঘড়ি দেখে জানতে চাইল, ক'টা বাজে বাবু?—বাবু না বললে আবার রাগ করে অনেকে। প্রায় সবাই করে। কথার সাড়াই দেয় না। এখানে এলেই সবাই বাবু হয়ে যায়। অমন বাবু সে জীবনে অনেকই দেখেছে। সত্যিকারের বাবু যে ক'জন তাও জেনেছে।

আট টা—চলমান লোকটি জানাল।

ওঃ তবে তো উঠতে হয়। এখন যে দুটো ছোলাভাজা খাবে সে উপায়ও নেই। কি অসম্ভব দামই যে হয়েছে ছোলার। আগে চারপয়সায় যা ছোলা-ভাজা পাওয়া যেত এখন চার আনাযও তা দেয় না। কাজেই এখন দুটো বেগুনী আর একটু জল খেয়ে কাজে গেলেই হবে। দুপুরে সেই গাছতলায় গিয়ে ছাতু—নাঃ আর পারা যাচ্ছে না। তবু না হয় আজ ও ছাতুই খাবে।

এতক্ষণ বসে বসে একটু ক্ষিধে টের পাচ্ছিল বটে তবে উঠে দাঁড়াতে পেটটা কি রকম মোচড়াতে লাগল। মনে হ'ল কোন কাঁকড়া জাতীয় জীব পেটের মধ্যে যে সব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর গলার মধ্যে দিয়ে কেমন একটা টক টক স্বাদ উঠে আসছে অনেকটা শূন্যভাবেই। মুখের ভেতরটাও জল জল টক স্বাদে ভরে যাচ্ছে। ক্ষিধেটা বেশীই লেগেছে। প্রথমটায় একটু নজর দিলেও পরে গুরুত্ব দিল না। ওরকম ক্ষিদে তো রোজই পায়। ঘুম থেকে উঠলেই পায়। কিছুদিন আগে যখন আয়ে ব্যায়ে এত টানাটানি না ছিল তখনকার দিনে এক ভাঁড় চা খেয়ে নিত সকালে উঠে তাহলেই এই ভাবটা কেটে যেত আজকাল এক ভাঁড় চা-এর দাম হয়েছে পনের পয়সা, তার ওপর অবস্থা এমনই যে পনেরটা পয়সাও খরচ করা চলে না। প্রতিটি পয়সা এখন হিসেব ক'রে খরচ করতে হয় অথচ পয়সাগুলোর কেবল খরচ হয়ে যাবার দিকেই ঝোঁক।

কাজে পৌঁছে নিবারণ দেখল মইনুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে সামনেই। রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে। তবে কি তারই প্রতীক্ষাতে আছে? তাই বা থাকবে কেন? ইস, তার একটু দেরী হয়ে গেছে এসে পৌঁছাতে। অতদূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসা—সময় লাগে বইকি। নাঃ আজ শুধু শুধু বসে থেকেই সে দেরী ক'রেছে। কাল থেকে সকালে এমনই অকারণ বসে থাকবে না। জটিয়া বা কানুর মত সে-ও না হয় আগে ভাগেই আসবে, এসে বসেই থাকবে। কাছাকাছি আসতেই মইনুদ্দিন বলল, কাম চালু হো গিয়া

দেরী কেঁউ করতা রে বাঙ্গালী ?

আসতে এট্টু দেরী হয়ে গেল—নিবারণ কোন কারণ দেখাতে পারল না। মইনুদ্দিন ওকে সঙ্গে ক'রে ভেতরে যেতে যেতে বলল—জলদি কাম চালু কর। একনম্বর পয়েন্ট মে মিক্সচার উঠা।

চারতলা বাড়ীর কাঠামো হয়ে গেছে। একনম্বর পয়েন্ট হচ্ছে চারতলায়। ভেতরের অর্ধসমাপ্ত সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে মাথায় ক'রে বয়ে বয়ে তুলতে হবে কড়াই ভরা বালি সিমেন্ট-এর মিশাল। একনম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বাইরের দিকের বাঁশের ভারায়। বাড়ীর পেছন দিকে। এখান থেকে দেখা যায় না। কিন্তু কোন পয়েন্টেই মিস্ত্রি যায় নি এখনও। কামিনগুলো কেবল ইট বইতে সুরু ক'রেছে। মাথার ওপর থাক থাক ইট সাজিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে চলে যাচ্ছে সেই ওপরে। মইনুদ্দিনের ভাই জাহাঙ্গীরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে দোতলা থেকে। সে চেঁচাচ্ছে—আবে, সুরু সে ঢিলা দিয়া দিনভর ক্যা কাম করে গা বে ?

কাকে বকছে কে জানে। বড্ড বকে জাহাঙ্গীর। যাকে তাকে যা তা বলে বকে। এখন হেড মিস্ত্রি সে-ই। মইনুদ্দিন নিজে খুব কম কাজ করে। কাজ দেখে বেড়ায় যে ইনজিনিয়ার, সেই সায়েবদের কাছে কাজ বুঝে নেয়, বাবুরা এলে তাদের মর্জি বুঝে তাদের বুদ্ধি বাৎলায় আর কাজ করায় সমস্ত বাড়ীতে। জাহাঙ্গীর নিজে খাটে কখন কখন তদারকও করে কাজের। বিশেষ ক'রে কারও কাজ পছন্দ না হ'লে গালাগালি এবং নিয়োগ বরখাস্ত সে নিজেই করে। নিবারণ ভয় পেল জাহাঙ্গীরের সামনে পড়লে দু চারটে গালাগালি তাকে এখন নিশ্চয় খেতে হবে, যা নজর ছাড়বে না সে কিছুতেই। প্রতিবাদ ক'রলেই হাতের হাত বরখাস্ত ক'রে দেবে। মইনুদ্দিন কিছু বলবে না। কাজেই নিবারণ খুব সন্তর্পনে সিমেন্ট মেশানোর জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

দুপুরে চনচনে রোদ উঠছে আজকাল। একটানা কাজ ক'রতে ক'রতে একটু দাঁড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে। উপায় নেই। কাজ এমনভাবে চাপান থাকে যে তুলতে তুলতেই ওপরের মশলা ফুরিয়ে যায়। ফুরিয়ে গেলেই মিস্ত্রি চেঁচায় খারাপ মেজাজের মিস্ত্রি থাকলে খারাপ খারাপ গালাগালি দেয়। কাজেই শরীর না চললেও পা টেনে উঠতে হয় মাথায় সিমেন্টবালির কড়া চাপিয়ে। সবাই ওঠে। নিবারণের মত উঠছিল কামিনরাও মাথায় ইট চাপিয়ে, আর ভাদুয়া বাঁশের মই বেয়ে বেয়ে বাইরের দিকে মশলা ইট যোগান দিচ্ছিল তিনতলায় হাকিছ মিয়া, তেরফান মিস্ত্রি আর সাগিরুদ্দিনকে। ভাদুয়ার দেহে যৌবন একটা রেসের ঘোড়ার মত সতেজ। তাই বড় মিস্ত্রির নির্দেশে বাড়ী তৈরীর প্রথম দিন থেকে ভাদুয়া মাল যোগানের কাজই ক'রছে। বাঁশের ওপর পা

রেখে রেখে মাথায় ইটের বা মশলার কড়াই নিয়ে অথবা জলের ড্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌছানোর কাজ তার অনেকটা সার্কাসের ব্যালান্সের খেলার মত। কতক্ষণে যে বারটা বাজবে সেই কথাটা জানার প্রবল ঔৎসুক্য সকলেরই। কিন্তু ঘড়ি তো একমাত্র ছুটি দেবার মালিক জাহাঙ্গীর ছাড়া আর কারও হাতেই নেই, কাজেই তার মর্জিই বারোটা। আর কদাচিৎ ওপরসিওর বাবু বা মালিকের দারোয়ান প্রভৃতি সামনে এলেও তাদের জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই যতক্ষণ না হুকমত আসে মাল বয়ে চলতে হয়, ক্লান্ত হলেও বিশ্রাম মেলে না। ভাদুয়া এই সময়টায় বারংবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় বুঝতে চেষ্টা করে। সূর্য ঠিক মাথার ওপর উঠল কিনা সে লক্ষ্য করে। সে বোঝে বলে কামিনরাও মাঝে মাঝে ওকেই জিজ্ঞাসা করে—ক্যা হো, কা টাইম ভইল ? ছুট্টি মিলব কি না ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাদুয়া জবাব দেয়—আভি মিলি। তে-নি সে দের হ—।

এরকম রোজই ঘটে। এই সময়ই ঘটে। আজ ব্যতিক্রম হ'ল। হাকিছ মিয়া আর তেরফান মিস্ত্রির চিৎকার ভরে গেল সারা অর্ধসমাপ্ত অট্টালিকায়। সেই আতংকিত চিৎকারে শংকিত বিমূঢ় শ্রমিককুল নিজের নিজের বোঝা মাথায় নিয়ে যে যেখানে ছিল নিশ্চল হয়ে গেল। তবে কি বাড়ীর কোন অংশ ভেঙ্গে পড়ছে ? কেউ কি চাপা পড়েছে তাতে ? অথবা কোন অংশ ভাঙ্গছে ? কে জানে সামনে পা বাড়ালেই হয়ত বিপদ হবে। কিংবা বিপদ হতে পারে পেছোলেও। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কেবল এক জোড়া আতংকিত স্বর ভারা বাঁধা বাঁশগুলোতে লেগে যেন খন খন ক'রতে ক'রতে ছুটছে এলো-মেলো। নিবারণ একতলায় খালি কড়াইটা কেবল নামিয়েছিল ইতিমধ্যে ওপর থেকে সেই আতংকিত শব্দ শুনল তেরফান মিস্ত্রি চেঁচাচ্ছে—নিচে সে পাকড়ো, নিচে সে পাকড়ো—গির গিয়া—গির গিয়া—আ। আর বাঙ্গালী হাকিছ মিয়া কিছু বলতে না পেরে শুধু—আ-হা-হা-হা- ক'রে চেঁচাচ্ছে। নিবারণ উত্তর দিকে দৌড়াল ভাঙ্গা ইটের লাট, খোয়ার ঢিবি, পুরানো পেরেক লাগানো তক্তার গাদা আর বালির পাহাড় পেরিয়ে। বেলচা ছুঁড়ে ফেলে মশলা মিস্ত্রী বাসেদ ছুটল তার সঙ্গে। তেরফান মিস্ত্রি আর হাকিছ মিয়া ওই পাশটায় তিন তলাতেই কাজ করে তাই এদের লক্ষ্য সেইখানেরই ভূমিতল।

তেরফান মিস্ত্রিদের চিৎকার কানে এসে পৌছাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলেও সেখানটায় পৌছে নিবারণরা দেখল ভাদুয়ার দেহটা ওপর থেকে পড়ে অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। নিবারণ ভয় পেয়ে থতমত খেল। বাসেদও প্রায় কর্তব্যবিমূঢ়। তার দীর্ঘ মিস্ত্রি জীবনের অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার সামনে

পড়েনি আর কখনও। নিমেষের মধ্যে কাঁপুনির বদলে ওদের চোখের সামনেই কয়েকবার খিঁচিয়ে হাত পা শিথিল হয়ে গেল ভাতুয়ার। বাসেদ সাহস ক'রে ঝুঁকে পড়ে ভাতুয়ার মাথাটা একটু তুলে ধরতেই নাকের ভেতর থেকে কিছুটা রক্ত গড়িয়ে এল। মুখ থেকেও চাপ চাপ রক্ত এল বেরিয়ে। দেহের বিভিন্ন স্থানে রক্ত ফুটে ফুটে উঠল। এদিকে ততক্ষণে সমস্ত মিস্ত্রি এবং মজুর জড় হয়ে গেছে। কেবল জাহাঙ্গীর ছাড়া প্রত্যেকেরই মুখে চোখে দারুণ আতঙ্ক। জাহাঙ্গীর এসেই চেঁচিয়ে উঠল—আবে বেয়াকুফ গাড়ী বোলা কোই। হাসপাতাল চল। এ ইমতিয়াজ, পানী লাও ইধার।

ব্যস্ত জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্র হাতে বৃথাই জল ঢালল ভাতুয়ার মাথায়। নাকের পাশে জল দিল, পেটে দিল, গায়ের গেঞ্জীটা বুকের কাছ থেকে দুই হাতে টেনে পড় পড় ক'রে ছিঁড়ে দিল। সবই সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ক'রেও কোন ফল পেল না। হুঁশ হ'ল না ভাতুয়ার। প্রৌঢ় মইনুদ্দিন কেবল হতবাক হয়ে ঘটনার কাছে আত্মসমর্পন ক'রে অসহায়তায় ছুটে বেড়াচ্ছিল এপাশ থেকে ও পাশ। মিস্ত্রিরা সবাই, ইঁট সিমেণ্ট বওয়া মজুর আর কামিনরা সকলে চারপাশে ঘিরে ধরেছিল পিঁপড়ের মত। দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোন অন্য ভূমিকাই কেউ খুঁজে পেল না। নিবারণের মনে হচ্ছিল সে যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তে চড়তে পারছে না। জমাট বাঁধা চাপা রক্তের ওপর নজর পড়ল নিবারণের। তার শরীর কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ওই দৃশ্য সহ্য ক'রতে পারছিল না, কেবল মাত্র সরে যাওয়া যায় না বলেই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল। কামিনদের মধ্যে থেকে কে যেন একজন কেঁদে উঠল। কেউ সেদিকে তাকাল না। আপনিই কান্নার শব্দ থেমে গেল। নিবারণেরও কেমন ভয় ভয় ক'রতে লাগল। ভাতুয়াকে আজ সকাল বেলা কেমন সতেজ দেখেছে আর কেমন দেখছে এখন। অতবড় ভরা জোয়ান ছোকরাটা এখন কেমন ভাবে ভাঙ্গা ইট, বাঁশের টুকরো, কাঠের পেরেক পোঁতা তক্তা আর নানাবিধ আবর্জনার মধ্যে পড়ে আছে জড় পদার্থের মত। কয়েক মুহূর্ত আগেও মাথায় ইটের বোঝা নিয়ে অনেক দিনের অভ্যাসে অনায়াসে বাঁশ বেয়ে বেয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল তিন দেয়ালের বাইরে—অট্টালিকা গড়ে তুলছিল অথবা সাহায্য ক'রছিল তোলায়।

দেখতে দেখতে একখানা সাদা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দারোয়ান তিনজন খাকীর পোষাক পরা লোককে সঙ্গে করে ইটের গাদা পেরিয়ে নিয়ে এল। তাদের হাতে একটা কাপড়ের মাচার মত। নিবারণদের দেশে বাঁশ দিয়ে যে রকম মাচা ক'রে মড়া নিয়ে যায় তেমনি। চটপট সেটাকে নামিয়ে তার ওপর ভাতুয়াকে শুইয়ে তুলে নিয়ে গেল লোকগুলো। জাহাঙ্গীর গেল ওদের সঙ্গে।

সকলেই পেছন পেছন গাড়ী পর্যন্ত চলল, নিবারণ গেল না। দেখল ভাতুয়া যেখানটায় পড়েছিল সেখানে কেবল কিছু তাজা রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। রক্ত পড়ে রয়েছে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

সবাই কেমন বোবা চোখে চেয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ ক'রে কামিনরা বোঝা গেল খুবই ভয় পেয়েছে। ভাতুয়াকে পড়তে দেখেছিল হাকিছ মিয়া আর তেরফান মিস্ত্রি। কাজেই মইনুদ্দিন তাদেরই জিজ্ঞেস ক'রল, কেইসে কুদ গিয়া?

প্রশ্ন শুনে নিবারণ আকাশ থেকে পড়ল। তাহ'লে পড়ে যায়নি ভাতুয়া! লাফ দিয়েছে! তবে কি সে ভুল শুনল! সে যে নিজের কানে কার একটা কণ্ঠ শুনল, গিয়া গিয়া, গির গিয়া হো—। সে কণ্ঠস্বর হাকিছের নয়, তেরফানেরও নয়। হৈ চৈ-এর মধ্যে স্পষ্ট ক'রে চেনা যায় নি, চেনবার প্রয়োজনও ছিল না। কে জানত যে এই রকম প্রয়োজন আসতে পারে। আর এখনই বা কি এমন প্রয়োজন হল। যার যা খুশি বলুক না। আসলে লোকটা বাঁচবে কিনা সে-ই তো এখন সংশয়। আহা যেন বাঁচে ছোকরাটা না বাঁচলে ওর বউটা বিধবা হবে, কে জানে হয়ত কতগুলো প্রাণী না খেয়েও মারা যেতে পারে। ভগবানের কাছে, বাবা তারকেশ্বরের কাছে নিবারণ প্রার্থনা করল অনাত্মীয় অপরিচিত একটি যুবকের জীবনের জন্যে। এবং সে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ায় মইনুদ্দিন যে তার কথার কি জবাব পেল তা শুনতে পেল না।

আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটল তারপর মইনুদ্দিন বলল,যাও সব আপনা কাম সামালো। খোদাতাল্লা উসকো দোয়া করে।

মিস্ত্রিরা যে যার কাজের দিকে গেলেও মজুররা নড়ল না দেখে মইনুদ্দিন আবার এদের নতুন করে জানাল যা হয়ে গেছে তা তো হয়েছেই। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখন এখানে সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো কোনই লাভ হবে না, তার চেয়ে সবাই খাওয়া দাওয়া ক'রে এসে কাজে লেগে যাক।

মইনুদ্দিনের ইচ্ছা পূরণ হ'ল বটে কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে কাজ এগোতে লাগল। মজুরদের পা যেন আর চলছে না। ধীরে ধীরে মাল মশলা যোগান দিচ্ছে তারা। মিস্ত্রিরাও খুব একটা তাড়া ক'রছে না। কাজের শিথিল ভাব মইনুদ্দিনের নজরে পড়লেও সে বিশেষ কিছুই বলছিল না। মইনুদ্দিনের ভয় ভয় ক'রছিল ভাতুয়া মরে গেলে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক ঠিকাদার, বছর কুড়ি আগেকার কথা মইনুদ্দিনের মনে আছে, এক শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়েই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এখন কি হবে কে জানে। জাহাঙ্গীর ফিরে না এলে সে কিছুই ক'রতে পারছে না।

জাহাঙ্গীর লেখাপড়া জানে, ইস্কুল পাশ। সে এসব বোঝে ভাল। তাই ভেবে মইনুদ্দিন কেবলই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। জাহাঙ্গীর এসে পড়লেই যেন সে বাঁচে। আতংক একটা বিরাট ভারী বোঝার মত তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। একমাত্র জাহাঙ্গীরই সেই বোঝা তোলবার শক্তি রাখে।

জাহাঙ্গীর ফিরে এল বিকাল বেলায়। তখন সকলের ছুটি হচ্ছে। মইনুদ্দিন প্রতি মুহূর্তে ভয় পেতে পেতে ছুটির মুহূর্ত আসায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে মিস্ত্রিদের সঙ্গে যখন সুড় সুড় ক'রে বাইরে চলে যাচ্ছে সেই সময়েই এল জাহাঙ্গীর। এসে জানাল হাসপাতালে পৌঁছেও আর জ্ঞান হয়নি ভাদুয়ার। কিছুক্ষণ বাদেই মারা গেছে। এতক্ষণ নানা রকম ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় সে আটকে ছিল হাসপাতালেই। আরও জানাল আজই পুলিশ আসবে খোঁজ খবর নিতে। সকলকে ছুটি দিয়ে কেবল তেরফানকে আর মইনুদ্দিনকে থাকতে বলল জাহাঙ্গীর। তেরফান জাহাঙ্গীরের শ্বশুর হয় সম্পর্কে। মইনুদ্দিনের দীর্ঘদিনের সহকর্মী সে। মইনুদ্দিন যখন ইমতিয়াজের কাছে কাজ করে তখন থেকেই দুজন একসঙ্গে। কাজেই জাহাঙ্গীর তেরফানকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে ক'রে শেখাল পুলিশ যখন আসবে তখন তাদের বলতে হবে ভাদুয়া তার সামনেই ইচ্ছে ক'রে লাফ দিয়েছিল। আজ সকাল থেকেই সে কাজে অত্যন্ত ঢিলে দিয়েছিল মন খারাপ বলে। সারাদিনই বিমর্ষ হয়ে ঘুরছিল। জাহাঙ্গীর নিজেও সেই কথা বলবে। সে বলবে তেরফান আর সে এক জায়গাতেই পাশা-পাশি কাজ ক'রছিল। হঠাৎ সে দেখল একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঁকি মারছে ভাদুয়া। ও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে লাফ দিয়ে পড়ল। ও যে ধরতে চেষ্টা ক'রবে সে অবসরটুকুও পেল না।—এরপর এই সব কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে যা করবার দরকার তা সে ক'রবে। নিজের পকেটে হাত দিয়ে হিসেব ক'রল মাত্র আঠারোটা টাকা আছে। মইনুদ্দিনকে জিজ্ঞেস ক'রল, এ বড়ে মিয়া, রুপিয়া কেত্না হ্যায়?

মইনুদ্দিন নিজের খাকী সার্টের ঢাকা বুক পকেট থেকে একচল্লিশ টাকা বের ক'রে জানাল, একতাল্লিশ।

জাহাঙ্গীর এবার চিন্তিত হ'ল। টাকা আরও লাগবে। দারোয়ানের কাছে সুদ দিলেই দু-একদিনের জন্যে ধার পাওয়া যাবে। মইনুদ্দিন আর তেরফানকে বসতে বলে সে দারোয়ানের কাছে গেল। তেরফান ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি বের ক'রে দাঁত দিয়ে চেপে দেশলাই জ্বালল নিজেকে শক্ত করবার জন্যে। পুলিশ যতক্ষণ না আসে একটু আরাম ক'রে নেওয়া যাক। পুলিশ-টুলিশের ঝামেলা ভাল লাগে না তার। তা ভাল না লাগলেই বা এখন উপায় কি। ছোকরাটা মরে যা ব্যবস্থা ক'রে গেল তাতে পুলিশ তো আসবেই।

ও ব্যাটা তো মরেছেই উপরন্তু আরও দশজনকে ফাঁসাবার ব্যবস্থা ক'রে গেল।'
বিড়িটাতে বেশ লম্বা ক'রে একটা টান দিল তেরফান মিস্ত্রি।

মনটা নিবারণেরও খুবই খারাপ হয়ে গেছে। ইচ্ছে ক'রছিল সেই মুহূর্তেই কাজ ছেড়ে বাড়ী চলে যায়। ভাদুয়ার ঘটনায় সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, উপায় থাকলে নিশ্চয় হাত পা ধুয়ে অন্তত পক্ষে নিজের বাসের এলাকায় চলে যেত, বাড়ী না গেলেও। ওই যে লোকটা পড়ে মারা গেল তারও ঘরে বউ ছেলে লোকটির আশায় বসে আছে, হয়ত দিন গুনছে কবে বাড়ী আসবে নয় টাকা পাঠাবে অথচ আজ লোকটা যে মারা গেল তা তারা জানতেও পারবে না কোনদিন। রোজ মজুরের কাজ করে যারা তারা কবে কোথায় কার কাছে কাজ ক'রছে তা নিজেরাই জানে না বাড়ীতে কি জানাবে? তা ছাড়া দূর গ্রামে যে নিরক্ষর মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে বসে আছে তার কাছে এসব জানানোরও কোন মূল্য নেই। কি সে বুঝবে, জানবেই বা কি। আর ওই লোকটি তো এই কিছুদিন আগে মাত্র এখানে কাজে লেগেছিল। এই বাড়ী শুরুর সময় দিনকতক কাজ ক'রেছিল তারপর মধ্যে কিছুদিন জাহাঙ্গীরের গালাগালি খেয়ে আসে নি আবার এই কিছুদিন আগে থেকে মরবার জন্যে এসে লেগেছিল। নিজের কথাই মনে হ'ল নিবারণের, ওরই যদি কিছু হয় তাহ'লে কি কোনদিন ওর স্ত্রী ছেলেরা খবর পাবে? এই তো কলকাতা থেকে কতটুকু দূরেই বা বাড়ী তাই তারা খবর পাবে না আর ওই মৃত লোকটি এসেছিল বিহারের কোন দূর গ্রাম থেকে। দিনের পর দিন ওর প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে অনেক পরে একদিন হয়ত অবিশ্বাসের সঙ্গেও বিশ্বাস ক'রবে যে তার স্বামী আর ফিরবে না। তবু সে কলকাতাগামী লোক পেলে বারংবার অনুরোধ ক'রবে তার স্বামীর সংবাদটুকু নিয়ে আসবার জন্যে। ওর স্ত্রী-ও তাই করে। যেবারই ফিরতে দেরী হয় ওর স্ত্রী কলকাতা আসা গ্রামের লোকেদের অনুরোধ করে ওর খবর নিয়ে যাবার। অথচ ও নিজে বাড়ী ফিরে তবেই জানতে পারে কাকে কবে খবর নেবার জন্যে অনুরোধ ক'রেছিল ওর স্ত্রী।

ভাবতে ভাবতে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল নিবারণ। আজ যখন একটু আগে ছুটি হয়েছে একবার যাবে পাউরুটির চেষ্টায়। হয়ত তিনশ লোকের পেছনে দাঁড়াতে হবে, তবু যদি একটা রুটি পায় রাতটুকু তাহ'লে সহজ হবে। দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল নিবারণ। ডান দিকে ফুলটুল আঁকা শেষ বাড়ীটা পেছিয়ে গিয়ে মাঠ পড়ল। মাঠের মধ্যে আবার কেমন সুন্দর সুন্দর সব মন্দির না কি সব যেন হয়েছে—। এ এক আলাদা পৃথিবী যেন। চকচকে বাড়ী গাড়ী লোকজনও ঠিক তেমনি চকচকে। কলকাতায় নিবারণের প্রথম প্রথম মনে হত সবই চুনকাম করা। এমন কি মানুষগুলো পর্যন্ত। পরে সে অনেক দেখে

দেখে বুঝেছে কলকাতায় চুনকাম করা অনেক মানুষ থাকলেও সব মানুষ চুনকাম করা নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে সেই সব না পালিশ না চুনকাম মানুষের কলকাতায় যেন কেন অধিকার নেই। সবাই তারা অনাহুত। যখন জমিতে কাজ করে তখন যেমন লাগানো গাছের সারির মধ্যে অনধিকারে জন্মানো ঘাসগুলোকে দেখতে পেলে বিরক্ত হয় তেমনি কলকাতার মালিকও যেন ওদের মত সকলকে বিরক্ত চোখে দেখছে। কলকাতার মালিক। নিজের ভাবনাতে নিজেই কেমন ঠোক্কর খেল।

হঠাৎ চমকে উঠল নিবারণ। আরে, এ সেই ছোঁড়াটা না! ওই যে কালী মন্দিরের কাছে দখ্‌নে একটা বউ আর অসুখ স্বামীকে নিয়ে থাকে তার ছেলেকেই তো মনে হচ্ছে! এতদূর এল কি ক'রে ওইটুকু ছোঁড়া? তার বড় ছেনাটার থেকে বেশী হবে না বয়েস, অনেকটা সেই রকম দেখতে বলে নিবারণ অকারণে অনেকবার দেখেছে ছোঁড়াকে। তা ছোঁড়াটা এতদূরে কি ক'রছে? রাগ হ'ল ওর মা-টার ওপর। ওইটুকু ছেলেকে এতদূরে পাঠায় কেন? হাতে একটা টিনের মগ নিয়ে এদিকে আসতে আসতে ছোঁড়াটা একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটান লাগিয়ে দিল। ফেলেও দিল সঙ্গে সঙ্গে। এদিক ওদিক মাটিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে ছোঁড়া। সামনে হতেই নিবারণ ডাকল, এই ছ্যানা! এদিক আসছু কেন রে? যা ঘরকে যা—। ঘরকে যেতে বলে নিজেই যেন অপ্রস্তুত হল নিবারণ। কোথায় ঘর? তাড়াতাড়ি শোধরাল, বলল, কতক্ষণ এসছু ইদিকে?

মদন বিরক্ত চোখে নিবারণের দিকে তাকাল। এই লোকটিকে কোনদিন দেখেছে বলে মনে হ'ল না তার। নিবারণ আন্দাজ ক'রেই বলল, তোর বাপ মা সেই মন্দিরের থানটায় থাকে নি?

হ্যাঁ—মদন জবাব দিল।

তা ইদিক পানে কেন আসছু?—

প্রশ্ন শুনে মদন উত্তর না ক'রে চৌরঙ্গী পেরিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে গেল দৌড়ে। কি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সে যে চলমান গাড়ীগুলোকে পাশ কাটাল নিবারণ ভীত বিস্ময়ে তাই দেখেই নিশ্চল হয়ে গেল। এবং অবাক হ'ল ছোঁড়াটার ব্যবহারেও।

রাত সন্ধের পর অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেও সড়কের সব বাসিন্দাই তখন জেগে। সীতা একটা ভাঙ্গা এলুমিনিয়মের কানাউঁচু থালায় ক'রে কোত্থেকে কি যেন কতগুলো খাদ্যবস্তু জোগাড় ক'রে এনেছে; সেটাকে সামনে ক'রে নিরঞ্জন আর সীতা দুজনেই বসে। নিরঞ্জন যতটুকু পেয়েছে খেয়ে হাত চাটছে

আর অবশিষ্ট অংশে সীতা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে চলেছে সারাদিনের শেষে। নিরঞ্জন থালার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যে দেখে মনে হয় থালাটা শেষ হোক এ ওর অভিপ্রেত নয়। কিছুটা থাকলে পরে সে যেন আবার খেতে পাবে। কিন্তু সীতার কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত। ভিক্ষে আজকাল কেউ দেয় না। দিতে পারে না জেনেও তবু চাইতে হয়, খিধের জ্বালা করা পেটেও চেঁচিয়ে ডাকতে হয় মাগো, দুটো রুটি দাও মা। ভাতের ফ্যান একটু দাও।

একলা সীতা ডাকে না, ডাকে অনেকে, অসংখ্য সীতা। নানা দেশ নানা গ্রাম থেকে আসা অনেক কুলবধু অনেক ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। খোলে না। যারা ডাকে তারা জানে আবার জানেও না যে ভেতরে বন্ধ দরজার পেছনে অমন অনেক নিঃশব্দ আর্তনাদ চাপা পড়ে আছে, দরজা খুললেই বাইরে বেরিয়ে পড়বে। এমনি বন্ধ অনেক দরজায় সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সীতা সন্ধে বেলা যখন পয়সা হিসেব ক'রে একটাকা বাইশ পয়সা গুনল ঠিক সেই সময়েই কমলি এসে খবর দিল, খিচুড়ি নেবে গো?

খিচুড়ি! নামটা কানে ঢুকতেই বিস্ময়ে আনন্দে প্রায় আত্মহারা হবার উপক্রম। এই বাজারে দান যারা করে দু-চারখানা রুটি দান করে, খিচুড়ি তো অনেকদিনের মধ্যে কেউ দেয় নি! কমলিকে মুখে কোন জবাব দেবার ধৈর্য টুকুও সীতার ছিল না। সে প্রথমেই ভাঙা-তোবড়ানো এলুমিনিয়মের থালাটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, জানতে চাইল—কই, কোথা?

দুজনে যখন বাড়ীটার সামনে পৌছাল তখনও সেখানে খিচুড়ি দেওয়া শুরু হয়নি। কালো কঙ্কালে সমস্ত ফুটপাথটা ছেয়ে আছে। একটু ওপাশে ফুট-পাথের নিচে নর্দমার ওপরে রাশীকৃত এঁটো কলাপাতা আর খুরীর জঞ্জালে দুনিয়ার কুকুরের জটলা। সীতা দেখল তাদেরই কে একজন ধৈর্য ধরতে না পেরে পরিত্যক্ত পাতা আর ভাড়ের মধ্যে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে আত্মনিয়োগ ক'রছে। মাঝে মাঝে ভাড় ছুড়ে কোন কুকুরকে তাড়িয়ে নিজের দখল কায়েম রাখছে। ফলে কুকুরগুলো প্রায়ই চেঁচামেচি ক'রছে আর পাল্টা তাড়া ক'রছে লোকটিকে। একটা অল্পবয়সী গরুও ওর মধ্যে ছিল তার প্রবল ভাগীদারের তাড়া খেয়ে সে বেচারীও একটু সরে এল একবার। আবার সে ফিরে গেল। সীতা চুপচাপ দেখছিল। ভাবল লোকটা পাগল। ভাল ক'রে দেখবার জন্যে একটু এগিয়ে গেল। দেখল, একজন নয় আলাদা আলাদা দুজন খাদ্য অভিযানে নেমেছে। সে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে চুলের মধ্যে নখ চালিয়ে উকুন খুঁজতে লাগল।

সেই খিচুড়িই নিরঞ্জনকে খাইয়ে নিজে খাচ্ছিল সীতা এমন সময় নিবারণ

এল সেখানে। সীতা নিবারণকে দেখেও দেখল না। সামনের গঙ্গাজলের হাইড্রাণ্টে থালা ধোবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াতেই নিবারণ বলল—হ্যাঁ গা মেয়ে তোমার খোকাটিকে ওই সিদ্দিক পানে দেখলাম। আমি ডাকতেই উত্তর পানে দৌড়োল।

ছেলের কথা শুনেই সীতার হাত থেকে থালাটা ঠকাস ক'রে পড়ে গেল। দীর্ঘদিনের বুক চাপা বেদনা জমাট বাঁধল রন্ধ্রমুখে। গভীর উৎকণ্ঠায় সে জানতে চাইল, কোথা তারে দেখলে গো বাবা?

নিবারণ উত্তরে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, হেই সিদিকে। আমি হেথাকে চলে আসতে বললাম তো- দৌড়ে ভাগলে। আমি যদি জানতুম ছোঁড়া ভেগেছে তা'লে কিছুটি না বলে খপ ক'রে জ্যানটি ধরে নে'সতেম টেন্যে।

সীতার ইচ্ছে এখনই সেদিকে যায়। খুঁজতে যায় ছেলেকে, তাই জানতে চাইল, এখন তো বাবা রাত বিরেত। এখন তো শোবে ঘুমোবে এখন গেলে ধরা যাবে নি?

তুমি তো আচ্ছা মানুষের মেয়ে বটে বাবা। য়্যা! বলি ওই পাড়ার ছোঁড়াগুলো কি রাতে শোয়? রাতভোর চক্কর কাটে রাস্তায়। দিনমানে পড়ে পড়ে মাঠে পথে ঘুম মারে। ওখানের চলই এই।

এইবার সীতা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল, আমার মদনকে তাহ'লে আর আমি পাব নি গো? হায় হায় গো আমার কি হবে। কি অলুক্ষুণে কলকাতায় আমি মরতে এলাম গো। —সীতার বিলাপ চলতেই লাগল। নিরঞ্জন অসন্তুষ্ট হ'ল। নিবারণকে বলল, আপনি লোকটা কে গো মশাই? আমি নিজের রোগের জ্বালায় ম'রে যাচ্ছি আর ওই শালার ছেলের কথা আবার নে এলেন? আপাদ গেছে যত—।

কি? সীতা গর্জে উঠল, আমার ছেলেকে যা নয় তাই বলতেছ তুমি! তোমার মত মানুষের কাছে পড়ে জন্মটা শেষ হয়ে গেল আমার, সব গেল শেষে একটা মাত্র ছেলে তাও গেল।

নিরঞ্জনও বিরক্ত হয়েই ছিল, গেল তো যাক্। কি করা যাবেক তায়।

কেন যাবে, কেন যাবে, তুমি যাও তুমি যাও তুমি যাও। দুবেলা এত লোক শ্মশানে যায় তুমি যাও নে? তোমায় যম নেয় নে? আমায় জ্বালাতে হাড় খেতে বসে বসে রঙ্গ দেখতেছ!

পরিস্থিতি আয়ত্বের থেকে অনেক দূর যেতে দেখে নিবারণ বোকা হয়ে সরে পড়ল সেখান থেকে। সে একটু উপকার করবার ইচ্ছেয় এসেছিল অপরিচিত মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলতে। এসে এমন ফ্যাসাদ হবে কে জানত। সীতা তখনও সমানে গজ গজ ক'রছে, আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্র ছেলে

কেমন পাষণ্ড বাপ বলে কি যাক, হারিয়ে যাক। একটু মায়া মমতা যদি থাকবে তবে কি আর এমনি ক'রে জ্বালিয়ে খায় আমাদের! হায় বাপ রে! এমন পোড়া কপালও আমার হয়েছিল! যার জন্যে এসে পথে বসলাম সেই কিনা এমন বড় শত্তুর!

সীতার আক্ষেপ চলতে লাগল। নিরঞ্জনের শরীর আজ খারাপই চলছিল। তার ওপর এই সব অকারণ বাড়তি অশান্তিতে নিরঞ্জন বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল। রাগ এবং দুঃখ একসঙ্গেই হতে লাগল। এমন অবস্থা অথচ বউটার একটু নজর নেই তার দিকে! সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় ঠিক থাকে না। সন্ধ্যেয় ফিরে এসে নিত্য আবার এমনি ঝগড়া করে! সে নিজের যন্ত্রণায় বাঁচছে না, একটু চিকিৎসা হচ্ছে না অথচ এই রকম অশান্তি। নাঃ আর পারা যায় না। শরীরের মধ্যে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল নিরঞ্জনের। বুকের মধ্যে সমস্ত শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যেকার যে বাতাসটা ওপর দিকে উঠে নিঃশ্বাস হয়ে বেরোয় সেটা আর উঠতে চাইছে না ওপরে, ক্রমশই কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে বুকের মধ্যে, ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে তার। সে ছটফট করতে লাগল। সীতার প্রতি অভিমান বশে, বিশেষ ক'রে সীতা এখন প্রবল রাগে গজরাচ্ছে ভেবে নিরঞ্জন নিঃশব্দে সহ্য করতে লাগল নিজের অসহ্য দেহকষ্ট।

অনেকক্ষণ বাদে সীতার নজর পড়ল নিরঞ্জনের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিরঞ্জন! এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রাত্রেও খালি গায়ে শুয়ে আছে। গায়ের জামাটা বুক পর্যন্ত তোলা। সীতা ভাবল জামাটা আপনি উঠে গেছে তাই সে জামাটা হাত দিয়ে নামিয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ ক'রল নিরঞ্জনের পেটটা শক্ত হয়ে আছে। সামান্য সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে সীতা ভয় পেয়ে গেল। কি ক'রবে ভেবেই পেল না। এই অবস্থায় কি সে ক'রতে পারে? কোন বুদ্ধি না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, শরীল খারাপ ক'রতেছে? কেমন ক'রতেছে?—নিরঞ্জন কোন জবাব দিতে পারল না। কেবল হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিল তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ দুটো যেন বড় হয়ে গেছে অনেক। সমস্ত মুখমণ্ডলে ঘাম বিন্দু বিন্দু শিশিরের মত জমছে—গড়িয়ে পড়ছে দুচারটে ফোঁটা এক সঙ্গে মিশে। সীতা নিরঞ্জনের সাড়া না পেয়ে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। এত অসহায় জীবনে তার কোনদিন মনে হয় নি নিজেকে। এই মর্মান্তিক দুঃসময়ে সে কার কাছে সাহায্য চাইবে কাকে পা জড়িয়ে ধরে বলবে, আমার সোয়ামীকে বাঁচাও—তা সে ভেবেই পেল না। একমাত্র ভরসা বলে মনে হল সেই চা-ওয়ালাকে। তা চা-ওয়ালার কাছেই বা সে যাবে কি ক'রে? কেমন ক'রে পৌঁছোবে, কাকে রেখে যাবে এখানে?

সীতার কান্না শুনে ওপাশ থেকে মাঝবয়সী এক স্ত্রীলোক উঠে এল গায়ে দুই তিন প্রস্থ কাপড় চাদরের মত মুড়ে। এসে সোজা সীতাকে প্রশ্ন ক'রল, কি হয়েছে বুন কাঁদছ কেন?

এই দারুণ দুঃসময়ে ডুবন্ত মানুষের তৃণখণ্ড ধরবার মত ক'রে স্ত্রীলোকটির হাত দুটো চেপে ধরল সীতা, বলল, আমার সোয়ামীর অবস্থা খুবই খারাপ দিদি। আমার কি হবে গো। হায় হায় গো আমার কি সব্বোনাশ হবে গো—। আগের মতই হাঁউমাউ ক'রে সীতা কাঁদতে লাগল। স্ত্রীলোকটি দেখল, দূরের লাইট পোস্টের আলোতেও সে বেশ ভালই বুঝতে পারল নিরঞ্জনের অবস্থা। সে সীতাকে বলল, হাসপাতালে ফোন ক'রে দিলেই গাড়ী এসে নিয়ে যাবে। কাউকে দিয়ে একটা ফোন করিয়ে দাও বুন।

কাকে দিয়ে করাব দিদি, কে ক'রবে—সীতার কথায় তার নিঃসহায় অবস্থা ফুটে উঠল। আক্ষেপ ক'রে সে বলতেই লাগল, এ তিভুবনে আমার কে আছে দিদি, কে ক'রবে আমার জন্যে।

তা বাছা আমিই ক'রছি। দেখি সামনের মোড়ের ডাক্তারবাবুকে বলে। যাবার সময় বলল, আমার নাম গৌরী। তোমার বড় বুন আমি। কিছু ভয় পেয়ো না। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

মোড়ে বাঁকটা ঘুরে তিনখানা বাড়ীর পর ডাক্তারখানার সামনে এসে দাঁড়ায় গৌরী। অনেককজন রোগীর মধ্যে একজনকে পরীক্ষা ক'রছেন ডাক্তার। গৌরী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রেই ডাকল, ডাক্তারবাবু!

একটু বিরক্ত হয়েই মুখ তুললেন ডাক্তার। গৌরীর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে তার দুই গালের কালো পোড়ার মত দাগগুলো লক্ষ্য ক'রলেন, তারপর আপাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, তোমার চিকিৎসা আমার এখানে হবে না বাবা। অন্য রাস্তা দেখ।

না গো বাবা আমার নয়। একটা লোক রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে—

তা আমি কি ক'রব—গৌরীর কথার মধ্যেই ডাক্তার রোগীর পেট টিপতে টিপতে রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন।

একটা ফোন—

অমন কতলোক রাস্তায় ঘাটে মরছে। রাস্তায় থাকলে রাস্তায় মরবে না তো কোথায় মরবে?

একটা ফোন ক'রে কোন হাসপাতালে তাকে একবার ভর্তি ক'রে দিন বাবা। লোকটা তাহ'লে বেঁচে যায়।

ডাক্তার ভেবে পেলেন না এদের বেঁচে কি হবে। যারা থাকবার একটা ঘর না পেয়ে থাকে ফুটপাথে, খেতে না পেয়ে আঁস্তাকুড় কুড়োয় তাদের আবার

বাঁচার কি প্রয়োজন? একটা একটা ক'রে না মরে এগুলো সব এক সঙ্গে মরে না কেন? এরা যে কোন সুখে বাঁচতে চায় ডাক্তার অনেক দিন ধরে ভেবেও তা পান নি। সে যাক এখন তিনি বিরক্ত হলেন সেই মৃতপ্রায় লোকটা বাঁচতে চায় বলে নয় এই রকম ব্যস্ততার সময় তাঁকে বিরক্ত ক'রতে এসেছে বলে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন মেয়েছেলেটি নড়ে নি। এ তো একটা বাজে মেয়েছেলে। যৌবন হারানো রূপোপজীবীনী। এ আবার কেন? প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার কে হয়?

আমার ভগ্নীপতি বাবু—।

ভগ্নীপতি—কথাটা যেন শ্লেষের মত শোনাল ডাক্তারের কানে। পতি শব্দটা এদের মুখে কখনই খাঁটি হয় না। হাতের রোগীটিকে পরীক্ষা ক'রে বিধানপত্র লিখে দিতে দিতে ভাবলেন আগামী নির্বাচনে পৌরপ্রতিনিধিত্বের প্রার্থী তিনি। আজকের এই জনকল্যাণের আহ্বানটি যখন উপযাচক হয়ে হাতের সামনে এসেছে তখন সামান্য একটু কষ্ট ক'রে—

কই বাইবাই ব্যানার্জী—পরের রোগীকে ডাকলেন। বছর দশেকের একটা খুকি এসে দাঁড়াল সামনে। বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে বললেন, হাঁ কর তো—। আ আ কর—। একটা বাঁকা চকচকে যন্ত্র দিয়ে গলার মধ্যে কি দেখলেন। তারপর টর্চ রেখে চোয়ালের নিচে গলাটা টিপে টিপে কাগজ টেনে নিয়ে বসলেন। নাঃ ফোনটা ক'রে য়্যাম্বুলেন্স ডেকে বলে দেওয়া যাক। উপস্থিত রোগীরা অন্তত বুঝুক ডাক্তারবাবু প্রকৃতই জনসেবা ক'রতে চান।

এই মিক্সচারটা দুবার আর একটা বড়ি লিখে দিলাম দুবার খাবে। ওষুধটা নিয়ে যাও। শিশির—কম্পাউণ্ডারের হাতে বিধানপত্রটা দিয়ে দিলেন ডাক্তার। নির্দেশ দিলেন বাইবাই নামের খুকীটিকে। সমীর দত্ত—ডাকলেন।

একটা লোক এসে সামনের টুলটায় বসল। এবার তাকালেন গৌরীর দিকে। জানতে চাইলেন—লোকটা কোথায় আছে?

হাত তুলে দিক নির্দেশ ক'রে গৌরী বলল—ওই রাস্তার গাড়ী বারান্দা ওয়ালা বাড়ীটার নিচে—।

য়্যাম্বুলেন্সকে ফোন ক'রে পথের নির্দেশ দিয়ে বললেন—যাও ওই রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে থাক গে। গাড়ী এলেই নিয়ে যাবে।

গৌরী ডাক্তারকে অসংখ্য সাধুবাদ জানাতে জানাতে চলে গেল। সীতাকে খবর দিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাড়াল গৌরী। দাড়িয়ে অপেক্ষা ক'রতে ক'রতে পা ধরে যাচ্ছে দেখে একটা ইট পেতে তার ওপর উবু হয়ে বসল। কিন্তু হাসপাতালের গাড়ী আর আসেনা। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। বসে ঝিমোতে ঝিমোতে চমকে উঠল গৌরী। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল!

গাড়ীটা এসে আবার চলে যায় নি তো? উঠে দাঁড়াল গৌরী। ভাবল ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে একবার দেখে। রাস্তা তো নির্জন হয়ে এসেছে। দোতলা বাসগুলো কেবল এক একবার সশব্দে এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছে। গাড়ী একটাও নেই। ট্যাক্সি কচিৎ কখনও এসে ঢুকে সামনের দিকে গিয়ে কোন গলির মধ্যে বাঁক নিচ্ছে। গরম কালে কতলোক ফুটপাথে শুয়ে থাকে এখন তারাও কেউ নেই। দিনেরবেলা এই কালী টেম্পল রোডে কত কত লোকের যাতায়াত অথচ এখন ফাঁকা পথে একটা প্রাণীরও দেখা নেই। ওই মোড়ের বিড়ির দোকানে আলো জ্বলছে। খোলা আছে পাঞ্জাবী হোটেলটাও। কিন্তু গরম কালে এ সময়ও যে রকম সরগরম থাকে এখন তার এক দশমাংশও নেই। সমস্ত পথটা যেন একটা মড়া কুকুরের মত নিঃসাড়ে পড়ে আছে। দুধারে বন্ধ দোকানগুলোকে দেখে তার কেমন কষ্ট হ'ল। সারাদিন এবং বেশ কিছুক্ষণ রাত পর্যন্ত যে দোকানগুলো নানা পসরার গয়নাতে আর আলোর মালায় ঝলমল ক'রছিল এখন সেগুলো সমস্ত জৌলুস হারিয়ে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যেন হতবাক হয়ে আছে। টিনের ঝাঁপগুলো অবলীলাক্রমে সব সৌন্দর্য ঢেকে দিয়েছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। ঠিক তার নিজের মত। অতীতকে মনে পড়ল গৌরীর। তারও দিনগুলো ছিল অমনি আভরণে জ্বলন্ত হাজার বাতির অলোকমালায় উজ্জ্বল মনোহারী দোকানেরই মত। নিমতলার কাঠগোলা থেকে তখন কানু মিত্র আসত। কানুমিত্রের দিন ফুরোলে সে-ই এনে জুটিয়ে দিল হীরালালকে। হীরালাল-এর ধকল একটু বেশীই ছিল কিন্তু মজুরীও ঠিক মেহনতের মতই দিত লোকটা। তার দেওয়া খাঁটি সোনার হারটা বাড়ীওয়ালীর হাত থেকে শেষ পর্যন্ত আগলে রেখেছিল গৌরী। শেষ সম্বল ছিল সেইটা.ই আর সুদিনে সেই হারটাই তার অর্ধাবৃত বুকে জ্বল জ্বল ক'রত অত্যধিক গর্বে। পয়সা হীরালালের ছিল এখনও হয়ত আছে তাই হীরালাল বাঁধা থাকে নি, অন্য গাছে নীড় বেঁধেছিল, উড়ে গিয়েছিল রামবাগান থেকে সোনাগাছিতে। তবে তার জীবনের দোকানে হীরালালই ছিল সবচেয়ে জোরদার বাতি। সে নিভে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই গৌরী অনুভব ক'রেছিল বাকি বাতিগুলোও একে একে নিভছে। তারপর ধীরে ধীরে এই ঘন অন্ধকার। বন্ধদোকানের তোবড়ানো টিনের ঝাঁপগুলোর দিকে নজর পড়ল গৌরীর। হ্যাঁ সে-ও এখন ওই নেভা দীপ এক বন্ধ দোকান। তবে তফাৎ এই যে তার দিন আর আসবে না। আর কোনদিনই সে ঝলমল ক'রবে না আলোর স্পর্শে নতুন পসরার অঙ্গসজ্জায়।

একটা আলো এসে মুখের ওপর পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল গৌরী। নাঃ এতক্ষণে এসেছে। চোখের সামনে হাত রেখে আলোটা আড়াল ক'রে দেখল

সাদা গাড়ীই বটে। হাসপাতালেরই গাড়ী। গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে গাড়ী থামিয়ে বলল, বাবাঃ এত রাত্তে আপনারা এলেন।

গাড়ীর ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না। পথ দেখিয়ে নিরঞ্জনের কাছে নিয়ে আসতেই দুজন খাকীর পোষাক পরা লোক নেমে এল। জিজ্ঞেস ক'রল, কি হয়েছে?

কি জানি বাবা কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এমনি ক'রছে সন্ধে থেকে, গৌরীই জবাব দিল।

কি ক'রে হ'ল— ?

তা তো জানি না বাবা।

লোক দুটো অকারণ বাক্যব্যয় না ক'রে একটা ষ্ট্রেচার বের ক'রে আনল গাড়ী থেকে। নিরঞ্জনকে তুলে নিল। বিশ্বড়না বাধল সঙ্গে যাওয়া নিয়ে সীতা যাবে কি ক'রে? আর সীতা ছাড়াই বা যাবে কে? অবশেষে বাধ্য হয়েই সীতা জিনিষপত্র গৌরীর জিম্মায় রেখে ঈশ্বরের নাম ক'রে গাড়ীতে উঠে বসল। কোথায় যাচ্ছে কেমন ক'রে ফিরবে কিছুই সে বুঝতে পারল না। ওখানে গিয়েই বা কি যে ক'রতে হবে তাও আন্দাজ ক'রতে পারল না সে। নিরঞ্জনকে যখন ওরা তুলল তার দেহে প্রাণ আছে বলে মনেও হ'ল না। তবে কি—। না ভাবতে পারল না সীতা। ভয়ে আতংকে তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। সেই অবস্থাতেই গাড়ীতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বসল সীতা।

একটা বিরাট বাগানওয়ালাবাড়ীর মধ্যে গাড়ীটা ঢুকে পড়ছে সীতা বুঝল। বাগানের মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ এসে গাড়ীটা থামতেই কে যেন পেছনের দরজা টেনে খুলে দিল বাইরে থেকে। সীতাকে নেমে আসতে আহ্বান জানাল খাকী পোষাক পরা সেই লোক দুটি। সীতা নেমে বাইরে এসে দেখতে পেল একটা লাল রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছে তারা। লোকগুলো স্ট্রেচার সুদ্ধ নিরঞ্জনকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। বয়ে নিয়ে চলল বাড়ীর মধ্যে। সীতা পেছন পেছন ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজার সামনেই একটা কাঠে কত কি সব লেখা আছে। ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু মত বিছানায় নিরঞ্জনকে শুইয়ে দিয়ে, ডাকতার সাব, ডাকতার সাব ক'রে ডাকাডাকি ক'রতে একজন প্যান্টপরা বাবু এসে টেবিলের ওপর নিরঞ্জনকে দেখে যেন ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠল। এ্যাম্বুলেন্সের লোকদুটোকে অতি রুষ্টভাবে হিন্দিতে কি যেন বলতে লাগল। তারাও হিন্দিতেই সব জবাব দিতে লাগল যার একবর্ণও বুঝল না সীতা।

ডাক্তারের ধারণা লোকটা এখনই মারা যাবে। অকারণ একে এখানে আনল কেন? ভিখিরি এনে কি কূল পাওয়া যায়? এদের এনে এনে হাসপাতাল

ভর্তি ক'রলে এমন দশটা গোটা হাসপাতাল লাগবে তবে যদি সকলের জায়গা হয়। ফালতু কে বাঁচল আর কে বাঁচল না অত দেখতে গেলে চলে না। বিরক্ত ডাক্তার তার নিজের ভাষায় শেষ কথা বলল, এনেছ রেখে যাও।

য়্যাম্বুলেন্স বাহিনী চলে যেতে ডাক্তারও আবার ভেতরে চলে গেলে স্বামীকে সামনে ক'রে সীতা চুপচাপ বসে রইল। টেবিলের মত উঁচু বিছানায় নিরঞ্জন শুয়ে আছে, মাটিতে বসে তাকে দেখতেও পাচ্ছে না সীতা। কি যে হচ্ছে লোকটার ভেবেও কোন হদিশ পাচ্ছে না। যে দরজা দিয়ে ডাক্তার ভেতরে চলে গেছে সেই দিকে সীতা তাকিয়ে রইল। কতক্ষণ হয়ে গেল ডাক্তারের তবু দেখাই নেই। এতক্ষণে লোকটার পেটে একটু ওষুধই যদি না পড়ল তাহ'লে কি দরকার ছিল হাসপাতালে নিয়ে আসার? ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে সীতা দেখল কেমন যেন অন্ধকার ভাব সমস্ত ঘরে। অতগুলো আলো জ্বলছে তবু যেন স্তিমিত প্রদীপের আলোয় বসে আছে বলে তার মনে হচ্ছে। তার ভয় করছে ওটুকুও কি এখনি নিভে যাবে? পায়ের শব্দে সচেতন হ'ল সীতা, ডাক্তার ফিরে এসেছে। নিরঞ্জনের কাছে গিয়ে গায়ের কাপড় আলগা ক'রে গা দেখল, চোখ টেনে দেখল, কি কি সব আরও দেখল তারপর একটা ইঞ্জেকশন দিল। সীতাকে প্রশ্ন ক'রল—কা তখলিব ইসক?

প্রশ্নের একবিন্দুও না বুঝে সীতা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে হাত ছুটো জোড় ক'রে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার তার জবাব না পেয়ে বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল, কান মে নেহি শুনতে হো?

সীতা ভাবল তাকে বুঝতে পারছে কিনা জিজ্ঞেস ক'রছে, তাই নেতিবাচক মাথা নেড়ে জানাল সে ডাক্তারের কথা কিছুই বুঝছে না। ভয়ে ভয়ে ডাক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও পারল না। সে কেবল নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখতে লাগল ডাক্তার একবার ভেতরে যাচ্ছে একবার আসছে। অথচ আর কোন ওষুধপত্রই নিরঞ্জনকে দিচ্ছে না। একটা ইঞ্জেকসন যে দিল তাতেও কোন ফল হল কিনা বুঝতে পারছে না সে। এই অবস্থায় কি করা উচিত জানবার জন্যেই একবার সে সমস্ত সাহসটুকু একত্রিত ক'রে বলল, ডাক্তারবাবু, রুগী তো চোখ মেলতেছে নাই?

ডাক্তার এতক্ষণে বুঝল যে সীতা একেবারেই গ্রামীন এবং তার কথার এক বর্ণও বোঝে নি। বিরক্ত হয়ে সে বলল, ক্যা জংলী সব কলকাত্তা মে আ গ্যায়া কুছ বাত ভি নেহি সমঝতি হ্যায়।

একথাও সীতা বুঝল না। ভাবল কিছু আশ্বাস বাক্য ডাক্তার তাকে বলছে। কাজেই আরও ওষুধপত্রের জন্যে প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত, যখন যা দেবার দরকার ডাক্তারই দেবে তার অকারণ ভাবনার কি প্রয়োজন। কিন্তু মনের স্বভাব ভিন্ন

সে বিনা কারণেই ভাবে। ভাবে প্রিয়জনের কথা। বিশেষ ক'রে বিপদের মুহূর্তে তার বিচরণ মুক্তপক্ষ। সেই ভাবনা সীতাকে প্রবল বেগে এমনভাবে ঠেলতে থাকে যে সে যেন স্থির হয়ে বসতে পারে না। অসহায়তার পীড়ায় সে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে গেলেও চুপচাপ বসে থাকতে হয় তাকে প্রাণহীন পদার্থের মত। অনেকক্ষণ সহ্য ক'রে একবার সে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার তার স্বপ্রদেশীয় ভাষায় গর্জন ক'রে ওঠে, এটা খেলবার জায়গা নয়। যত সব জংলীর আমদানী—।

সীতা শব্দ বুঝতে না পারলেও ঝাঁজ বোঝে। এমনিতেই ভয়ে সে সিঁটকে রয়েছে তার ওপর আবার ধমকানি খেয়ে তার হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার উপক্রম হয়। স্বামীর শেষ মুহূর্তটুকু দেখবার ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে হয় বাধ্য হয়েই। ডাক্তার এমন দৃষ্টিতে তাকায় যে মনে হয় এই কলকাতা এই হাসপাতাল তার নিজস্ব সম্পদ এখানে সীতাদের প্রবেশ শুধু অমার্জনীয়ই নয় অপরাধযোগ্যও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দৃষ্টি বোঝার বুদ্ধি সীতার নেই অথবা বুদ্ধি থাকলেও নিরুপায় অবস্থা বুদ্ধির শক্তিকে পরাজিত করে তার বুদ্ধিকে চাপা দিয়েছে কেবলমাত্র বাঁচার বাসনার সমাধিস্তূপের অন্ধকারে।

রাত অনেকটা বেড়ে গেলে অন্য একজন ডাক্তার এল। নিরঞ্জনকে জরুরী বিছানায় শায়িত দেখে টেবিলের ওপর কাগজগুলো তুলে কি সব পড়ল। তার পর ভেতরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে এসে সীতাকে প্রশ্ন ক'রল, তুমি এর কে হও?

সীতা তাকিয়ে দেখল ডাক্তারটিকে। খুবই অল্প বয়স, এক কুড়িই হয়ত হবে। ভালই তো কথা বলল ডাক্তারবাবুটা—সীতার শরীরে বল এল। সে হাউমাউ করে ডাক্তারের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, বাবা গো আমার ধর্মের বাপ, বাঁচাও স্বামীকে। আমার ঘর গেছে বাবা, পুত্তুর গেছে, তুমি ওকে বাঁচাও।

শোন শোন—দুপা পেছিয়ে গেল ডাক্তার, বলল কোথায় থাক বল?

ওই রাস্তায়—সীতা জানাল।

ঘরে থাক না?

না বাবু। গেরাম থেকে ওই মানুষটার চিকিচ্ছের জন্যে এয়েচি। কালী মন্দিরের কাছে রাস্তাতেই পড়ে রয়েচি সেই থেকে।

ডাক্তার কি যেন ভাবল তারপর কাগজগুলো ফের তুলে পড়ে নিয়ে বলল, কি হয়েছিল তোমার স্বামীর?

পেটে বেদনা হয়েছেল বাবু।

কতদিন হয়েছে?

তা প্রায় চার পাঁচ বছর হবে। সদরের হাসপাতালে চিকিচ্ছে হয়েছেল বাবু তা ভাল হল নে। তাইতে মানুষটা বলল কি আমাকে কোলকাতা নে চল সেখানে বড় বড় হাসপাতাল আছে ডাক্তার আছেন আমি সেরে যাব। তা বাবু এখেনে হাসপাতালে ভর্ত্তিই করা গেল নে তো কি করা যাবে। এখন তো মানুষটার পেরাণটাই যায় বাবু।

হুঁ—একটু কেবল শব্দ ক'রল ডাক্তার, বলল, তুমি এখন চলে যাও। ওকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে নিচ্ছি। কাল বিকালে এসে দেখে যেয়ো। রোজ চারটের সময় আসতে পারবে।

সেই মুহূর্তে সীতার মনে হল নিরঞ্জন যেন সত্যিই আবার ভাল হয়ে উঠেছে। আবার তারা ফিরে যাচ্ছে তাদের সেই গ্রামে, সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। মনে হতেই রুদ্ধ বাষ্পের চাপ এক জলস্রোত সৃষ্টি ক'রল তার অন্তরে, তার দুই চোখ জুড়ে।

সবে মাত্র পাশ করা চিকিৎসক ছেলেটি বিচলিত বোধ ক'রল কি ক'রবে সেই কথা ভেবে। মহিলাটির সর্ব অঙ্গে ফুটে উঠেছে নিঃস্বতা, অসহায়তা সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। অনুমান করেই প্রশ্ন কর'ল, এঁর জন্মে যে সব ওষুধ লাগবে তা কি কিনে দিতে পারবে? অনেক দাম হবে।

কথাগুলো কানে পৌঁছাতে সময় লাগল না, নিজেকে সামলে নিতে লাগল। আপন অন্তরের উদ্‌গত কান্নাকে চাপা দিয়ে অতিকষ্টে মাথাটা সামান্য নাড়ল নেতিবাচক ভঙ্গীতে। চিকিৎসক জানত তবু যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল, হাসপাতালে রোগের তুলনায় ওষুধের যোগান অপ্রতুল। ডাক্তার বিধান রায় যতদিন বেঁচেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হাজার কাজের মধ্যেও হাসপাতালের দিকে নজর রাখতে চেষ্টা ক'রতেন বলে অগ্রজপ্রতিম সহকর্মীদের কাছে শুনেছে ছাত্র থাকার সময়ে দেখেছেও। এখন যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেল সব, যা ওষুধ আসে তাও কেমন করে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশেষ মূল্যবান জীবনদায়ী ওষুধগুলোর তো দেখাই পাওয়া যায় না এসব দরিদ্র রোগীকে তারা বাঁচাবে কি দিয়ে? দীর্ঘদিনের ব্যাধি নিয়ে এসেছে মানুষটা, ঠিক কতদিন যে ভুগছে কে জানে, পরীক্ষা করে দেখলে হয়ত বোঝা যাবে এক যুগ ধরে শরীরের মধ্যে লালন ক'রে আসছে অসুখটাকে, সেই সুযোগে মূল ব্যাধিটি সঙ্গীও হয়ত জুটিয়ে নিয়েছে আরও কয়েকটা। অত ব্যাধি নির্মূল করা কি দুচার দিনের কাজ, না অল্প ওষুধের? চিন্তাক্লিষ্ট তরুণ ডাক্তার অনেকটা স্বগতোক্তির স্বরে প্রশ্ন ক'রল, কি করি বল তো?

সীতা ছেলেটির সহানুভূতিতে প্রশ্রয় পেয়েই যেন বলল, আমার আর কেউ নেই বাবা। আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন আপনার পায়ে পড়ি—বলে সত্যিই

সে হুমড়ি খেয়ে ডাক্তারের পায়ের ওপর পড়তেই ডাক্তার পেছিয়ে গেল, বলল তুমি যাও। দেখি কি ক'রতে পারি, নাম ঠিকানা বলে যাও, লিখে রাখি।

স্বামীর নাম বলার নাকি নিয়ম নেই সীতা জানে। সে সমস্যায় পড়ল কি ক'রে সে নিরঞ্জনের নাম উচ্চারণ করে। বিপদে পড়ে বলল, ওই হাসপাতালের কাগজেই লেখা আছে বাবু।

বহু কষ্টে প্রায় গলে যাওয়া কাগজ থেকে নাম উদ্ধার করে বিরক্ত ডাক্তার মেলাতে চাইল, নিরঞ্জন মিস্ত্রী ?

হ্যাঁ বাবু।

গ্রামের নাম বল ?

গ্রাম গোত্র জানিয়ে হাসপাতালের ফটকের বাইরে এসে সীতা প্রবল এক শূন্যতার মধ্যে পড়ল। কোথায় যাবে সে এখন, কার কাছে ? কে আছে ? এখন তার একমাত্র কাজ মদনকে খুঁজে বের করা। হাসপাতালের সামনের পথে মানুষ কিছু কম, তাই তো কত মানুষ চলে তার মধ্যে খুঁজতে হলে উকুন বাছা করে দেখতে হয়, তায় এত বড় শহর। সে যে কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল, কি ক'রে তার হদিস পাবে সীতা খুঁজবেই বা কোনখানে ? হতাশ চোখে চুপচাপ দুপাশে দেখল সে অর্থহীন জিজ্ঞাসায়।

মদনকে খোঁজা তো পরের কথা এখন নিজেই কি ক'রে ফিরবে আপন ডেরায় ? সাদা গাড়ীতে এ কোথায় এনেছে তাকে ? এখন ফিরবে কি ক'রে ? সাংসারিক সামগ্রী বলতে সামান্য যা আছে রেখার মায়ের আশায় রেখে এসেছে বলে চিন্তা নেই, সকাল হলেই ফিরবে। পথ চিনলেও এত রাতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বাকি রাতটুকু বরং ভেতরেই কোথাও কাটানো যাক কোন সিঁড়ির ওপর বসে। প্রচণ্ড ক্ষিধেয় যে তার নিজের পেটই জ্বলছে টের পেল সে এতক্ষণ বাদে, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মিটতে। সেই দুপুরবেলা সামান্য কি খেয়েছিল তার আর অস্তিত্বই নেই। এখন রাত কতটা বা হবে ? অর্ধেকটা পার করেই তো তারা হাসপাতালে এসেছিল এখন তাহ'লে তিনপ্রহর নিশ্চয় পার ? কোনক্রমে ভোরের আলো ফুটলেই সে রওনা দেবে।

কিন্তু কোনদিকে ? প্রত্যুষের আলো আকাশ থেকে নেমে আসছে বাড়ী অট্টালিকার আড়াল থেকে, পথ পরিষ্কার। সীতা পথে নেবে কিছুটা অনুমানে এগিয়ে এসে দেখল ঝাড়ুদাররা সাফাইএর কাজে নেমে পড়েছে। অল্পদূরেই আর একদল নলে ক'রে জল ছিটিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে ভোর বেলাকার রাস্তা। তাদের ওদিকটা তো রোজ ধোয়া হয় এমনি সময়, এদিকেও তাহ'লে হয় ? সমস্ত কলকাতাই তবে ধোয় সকালে ? কত লোকের কত দল তাহ'লে ধুয়ে বেড়ায় সারা শহর ! এতদিন এসেছে তবু শহরটাকে যেন বোঝা গেল না। এখনই

তো আসে নি এখানে ! কত বড় যে এই শহর সেটাই এতদিনে জানা গেল না।

কোনদিকে যাবে ভাবতে গিয়ে কেমন একটা শূন্যতার মধ্যে সে যেন ঢুকে গেল। সেই কালীমন্দিরের কাছে যাবার পথটা কারও কাছে জেনে নেওয়া যায় বটে তবে কি হবে সেখানে গিয়ে? কেউ তো আর রইল না। ছেলেটা যে কোথায় চলে গেল—হারিয়েই গেল কিনা কে জানে? এখনই সে যেমন পথ চিনতে পারছে না। এইরকম সেও যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো এই শহরের অসংখ্য পথের গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে যাবে। কোনদিন কি আর পথ চিনে ফিরতে পারবে ওইটুকু ছেলে? আর স্বামী নেই, পুত্র নেই, ঘর নেই, সংসার নেই—কিসের জন্যে কি? কোথায় ফিরবে সে? কিসের ফেরা? যাক এখানেই বসে থাকবে। সে আর কোথাও যাবে না।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বসে পড়ল সীতা। এমনটা তো কোনদিন হয় নি! হঠাৎ যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, শরীরটা শূন্যে ভাসছে, হালকা! বসে না পড়লে পড়েই যেত, অল্পক্ষণ বসতেই অবস্থাটা সামলে গেল। আরও কিছুক্ষণ বসে উঠে দাঁড়াল সে, স্থির ক'রল নিজেদের বাসের এলাকাতেই ফিরে যাবে যা সামান্য জিনিষপত্র আছে তা তো পরের হেফাজতে রেখে এসেছে তাছাড়া ঘুরতে ঘুরতে মদন ফিরতেও তো পারে পথ চিনে। তখন যদি মাকে না দেখে তো চিরদিনের জন্যেই যে হারিয়ে যাবে। সামনে যে লোকটিকে পেল তাকেই জিজ্ঞাসা করল, কালীঘাট মন্দিরটা কোনদিকে হবে?

এত সকালে এমন একটি মেয়েমানুষকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে না করে লোকটি কেবল একটা ইঙ্গিত ক'রল একটি দিকে। সীতা সেই পথেই চলতে লাগল। অবশেষে বহু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ঘুরপাক খেতে খেতে সে কখন জায়গা মত এসে পৌছাল রোদ তখন বেশ চড়ে উঠেছে। চারপাশে তাকিয়ে কোথাও সে গৌরীকে দেখতে পেল না। নিজের জিনিষপত্রগুলো কেবল একপাশে পড়ে আছে। সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখল ঠিকই আছে, কেউ নাড়ে নি। এখন ভাবনা সে কি ক'রবে। কেমন হালকা লাগছে নিজেকে, মনে হচ্ছে কোন কাজই নেই। তার নিজের যে একটা পেট আছে সেটাও যে সমস্যা সেকথাও মনে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে রোদে হেঁটে ক্লান্ত লাগছে বলে বসে পড়ল সীতা। হ'লই বা শীতের কিন্তু রোদ তো প্রায় দুপুরের। এই রোদে এতটা পথ হাঁটলে কষ্ট তো হবেই।

বাড়ীর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসা মাত্র যেন ক্লান্তি কিছুটা দূর হয়ে গেল, চিন্তা হ'ল বিকালে আবার পথ চিনে সেই হাসপাতালে পৌছাতে পারবে তো! যা ঘোরাঘুরির পথ ঠিক রাখতে পারলে হয়। ডাক্তারটি বলেছিল

ওষুধ নাকি কিনে দিতে হয়। এ কেমন হাসপাতাল রে বাবা! ওষুধ যদি কিনেই দেবে তো মানুষ হাসপাতালে যাবে কেন? ডাক্তার ওষুধ সব আছে বলেই না লোকে হাসপাতালে যায়। কিন্তু সত্যিই যদি ওরা ওষুধ না দেয় তাহ'লে বেচারী বাঁচবে কি ক'রে? তাকেই বা টাকা কে দেবে যে ওষুধ কিনবে? ভাবতে গিয়ে যেন অকূল পাথারে পড়ল সীতা।

কতক্ষণ যে ভাবনার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল তার হিসেব নেই। গৌরী আসতে সচেতন হ'ল। এসেই গৌরী জানতে চাইল, কখন এলে গা?

ঠিক জবাব জানা নেই বলে সীতা জানাতে পারল না। গৌরী আবার জানতে চাইল, কোন হাসপাতালে দিলে?

আমি তো চিনি নি—সেই বাগানওলা লাল বড় হাসপাতাল।

সব হাসপাতালের নাম ধাম গৌরী নিজেই যে জানে এমন নয় ওর নেহাৎ কৌতূহলেই জানতে চাওয়া বলে সীতার জবাব থেকে বুঝতে পারল না সে নিজেও। অন্ধকারে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মত করে সে বলল, বড় হাসপাতালেই দিয়েছে তাহ'লে।

বিকালে যেতে বলেছে মাসী চিনে যাব কি ক'রে?

কোন হাসপাতাল নামটা কাউকে দিয়ে লিখে আন নি একটা কাগজে? তা হ'লে দেখিয়ে চলে যেতে।

এ বুদ্ধি মাথায় আসে নি সীতার। হাসপাতালের নাম তো হাসপাতাল আবার কি নাম থাকবে? কথাটা প্রকাশ পেতে গৌরী সীতার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে বলল, ওমা! এ বলে কি গো? তুমি জান না কলকেতায় কত গুলো হাসপাতাল আছে? সেই শ্যালদাতে কারমারকেল আছে, মেডিকেল আছে, ভবানীপুরের হাসপাতাল আছে, ময়দানের হাসপাতাল আছে—হাস-পাতাল কি একটা গা?

সকালে দেখেছি মাসী—খুব ভারী হাসপাতাল। ডাগর ডাগর সব গাছ তার ভেতরে—

হাসপাতাল সম্পর্কে গৌরীর কিছু চাক্ষুস অভিজ্ঞতা থাকায় বলল, তা হ'লে ভবানীপুর হাসপাতাল হবে। লোককে শুধোতে শুধোতে চলে যেয়ো।

তুমি যাবে মাসী সঙ্গে? আমায় বড় ভয় ক'রছিল—সীতার স্বরে আকুতি ফুটে উঠল।

গৌরী সীতার রকম সকম দেখে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল, ঠাট্টা করে বলল, এ বলে কি গা? গতরের গায়ে কড়া পড়ে গেল অথচ খুকির বেণী খোঁপা।

সীতা গৌরীর রসিকতার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝল না বলেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বলল, বেশ যাব। কিন্তু যাবি কিসে? রিসকা,

করে নে গেলে যাব। অতদূর পথ হাঁটতে পারবুনি বলে দিলাম।

রিসকা! সীতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। রোগীর ওষুধ জোটাবারই উপায় দেখছে না এ আবার বলে রিকসা চড়বে! তা কি করে সম্ভব? কাতর স্বরে বলল, রিকসার ভাড়া কোথা পাব?

পাবি নি? গৌরী জানতে চাইল, পরক্ষণেই বলল, তোর মত গতরখানা থাকলে মেয়েমানুষ মোটরের পয়সা জোগাড় করে ফেলে রিসকা কোন ছার।

সীতা এই মেয়েটির কোন কথার কোন অর্থই করতে পারে না। কি যে বলে এক এক সময়! ওর বিস্ময়ের ওপরই আবার সে বলল, টাকা চাস? অনেক টাকা?

সে কি গো! কোথা পাব? তা'লে তো ওষুধটা কেনা হয়ে যায়।

হবে। আমার সঙ্গে যাবি।

কখন?

বিকালে।

হাসপাতালে?

তা হাসপাতাল থেকেই চলে যাব।

সীতা চুপ করে রইল। হাসপাতাল থেকে যেতে তার কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু কি কাজ করতে হবে, সে পারবে তো? সভয়ে জানতে চাইল, কি কাজ গো মাসী?

মেয়ে মানুষের গতর থাকলে যে কাজ আরামেই করতে পারে লা নেকি।

এত ইঙ্গিতেও কিছু বুঝল না সীতা। ভাবল যে কাজই হোক পয়সা পেলেই ক'রবে। এখন তো ওর ঝাড়া হাত পা, কাজ করতে আর অসুবিধে কি?

বিকাল বেলায় গৌরী আর রিকসার কথা বলল না। সীতা বলতেই রাজি হয়ে বলল, চল যাই। তা একটু সাফ-সুতরো হয়ে নিলি না? তোর কি আর শাড়ী নেই।

একটা আছে, আরও ছেঁড়া।

তা চল। তোর মালটালগুলো গুটিয়ে রেখে দে কারও জিম্বায়। যদি কাজে লাগিস তো রাতে আসবার তো ঠিক থাকবে না!

কার কাছে বা রাখবো?

ওই তো বাঙাল বুড়িটা আছে।

মেয়ে মানুষটার মুখের আগাতেই যেন কথা তৈরী থাকে। কেমন পটাং করে যেমনটি দরকার সময়মত বলে ফেলে। সীতা অবাক হয়ে যায়।

আরও অবাক হল হাসপাতালে পৌঁছে, ঠিক চিনে চিনে এনেছে তো বটেই খুঁজে পেতে বেরও করে ফেলল নিরঞ্জনকে কোথায় রেখেছে। কি বিশাল

বিশাল বাড়ী জুড়ে যে হাসপাতাল—দেখে সীতার বিস্ময় তো আর ধরে না। গৌরীকে প্রশ্ন করে বসল, এতগুলো বাড়ী সবই হাসপাতাল ?

হ্যাঁ লা সোহাগী, সব।

সোহাগীর কি হল ? প্রশ্নটা মনের বাইরে আর আনতে পারল না সীতা সাহস করে। মানুষটা উপকারী বটে তবে মুখের বাক্যি বড় খারাপ। এত কুকথা বলে ! তবু সইতে হয়, কথায় বলে না যে গরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য হয় ! তা বলুক। অমন কিছু গালমন্দ তো আর করছে না বড় বেশী তো একটু রঙ তামাশা করছে। তা তিন কুল গিয়ে এক কূলে যার ঠেকেছে তার মনেও যদি রঙ থাকে তো ক্ষতি কি ?

হাসপাতালে নিরঞ্জনকে দেখে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে পথে বেরোল সীতারা ; গৌরী বলল, চল। তোকে কাজে লাগিয়ে দিই।

সীতা এবার আর কোন প্রশ্ন করল না। ওর পেছন পেছন চলতে চলতে একটা টিনের বাড়ীর সামনে এসে থমকে গেল। নানা বয়সের নানা রকম মেয়েরা যার যে রকম সেজে গুজে ঘোরাঘুরি করছে। গৌরী কাউকে কিছু না বলে একটা দরজা দিয়ে ঢোকবার সময় নিজের গতি তো বাড়ালই সীতাকেও নির্দেশ দিল, আয়।

ভেতরে ঢুকেই একজন মোটাসোটা মহিলাকে বলল, এই যে গো তুমিই বাড়ীউলি তো ?

মোটা মহিলার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কেন গা ?

আমার কাছে লোক আচে। খাটতে এয়েচে।

আ মলো যা। কাজ কই, যে খাটবে ? খদ্দের কি তেমন আছে ? ভদ্দর ঘরের বউমেয়েরা সব ষাঁড় হয়েছে ষাঁড়বাড়ী আর আসবে কে ?

গৌরী এ কথায় দমল না। সমান উৎসাহে বলল, একে লাগালে তোমার লাভ হবে। বেশী কিছু দিতে হবে না। রোজ চুক্তিতে রাখতে পার, বাকি যা হবে তোমার।

মোটা মহিলা একটুখানি তরল হ'ল, বলল, কই তোমার লোক এনেছ ? কোন খেজালত হবে না তো ?

না গো ! নিজেই এয়েচে। ইদিক আয় লো, কোতা গেলি ?

সীতা বুঝল তাকেই ডাকছে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেই বাড়ীওয়ালী বলে উঠল, এ কি গা ? রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এলে ? কি পরে আছে ?

তুমি একটা কাপড় চোপড় পরিয়ে নাওনা। কাপড় নেই তা কি করবে ? ভাত-কাপড়ের জন্যেই তো নাইনে আসা।

না বাপু। অত হবে না। নতুন আসা কাউকে কাপড় জোগাতে পারব

না। ভাত কাপড় জুগিয়ে রাখি আর সরে পড়ুক।

গৌরী আপ্রাণ চেষ্টায় বলল, না গো না। সরে পড়বে যদি তো এসেচে কেন? ওর এখন ট্যাকার দরকার।

ট্যাকার দরকার বললেই কি হ'ল? যাকে দিয়ে যা না হবার তা হবে না। ছাগল দিয়ে কি আর যব মাড়ানো যায়?

সীতা কাজটা ঠিক বুঝছিল না কিন্তু অচিরেই তার সন্দেহ হ'ল রাস্তার সাজগোজ করা মেয়েগুলোর দু একজনকে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকতে দেখে। সবাই এক একজন লোক সঙ্গে এসে খুপরি খুপরি ঘরে ঢুকে পড়ছে। সে ভাব-গতিক দেখে গৌরীর আঁচলটা ধরে টেনে বলল, চল মাসী।

যাবি কি রে?

হ্যাঁ চল।

কাজ করবি নি?

না। চল যাই।

বাইরে এসেই বলে ফেলল, এ যে দেখছি বেবুশ্যেদের বাড়ী গো।

ওমা! সে আবার কি লা? আমাদের ওসব কিছু দেকতে নেই। গতর খাটিয়ে খেতে হবে, যেখানে ভালভাবে পেট ভরবে সেখেনে খাটানোই ভাল।

সীতার এখানে দাঁড়াবারই আর ইচ্ছা ছিল না। সে শুধু বলল, চল যাই।

গৌরী বড় আশা করেই এনেছিল সীতাকে এখন আশাহত হয়ে বলল, সে কি লা, বাড়ীউলির কতাতেই তুই ভাবলি হবে না? আমি ওকে ঠিকই রাজি করাবো।

দরকার নেই। কি কাজ তারই ঠিক নেই—

কাজ আবার কি, শুয়ে শুয়ে পয়সা। এমন সুখের কাজ আর নেই। শুয়ে আরাম করে রোজগার।

গৌরীর কথা শুনে সীতা নিশ্চিত হ'ল যে কি কাজের কথা ও বলছে। তার গা ঘিন ঘিন ক'রে উঠল। ছিঃ কি বলে বলছে মেয়েমানুষটা! তার ইচ্ছে করল এখানেই দুচার কথা শুনিয়ে দেয় ওকে। নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা করে তা আর সাহস হ'ল না। স্থির ক'রল ওর সঙ্গে আর কোথাও যাবে না। এখন ফিরে গিয়েই শেষ, আর কোন কাজে ডাকবেও না ওকে। খুব শিক্ষা হয়েছে যা হোক, শেষকালটায় তাকে নিয়ে গিয়ে বেবুশ্যের ঘরে তুলে দিচ্ছিল! কি রকম মেয়েমানুষ!

নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসতে সন্ধে উতরে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। অনেকটা পথই তো হাঁটতে হয়েছে, পা-টাগুলো বেশ ব্যথা করছে, শরীরও কাহিল লাগছে। অথচ সমস্যা হচ্ছে যে রাতে খাবার কোনই ব্যবস্থা নেই।

সন্ধে নাগাদ মাঝে মধ্যে দুচারজন বাবু আসে যারা মা কালীকে দর্শন করতে আসবার সময় গাড়ী করে বেশ কিছু খাবার দাবার নিয়ে আসে ভিখারীদের দেবার জন্যে। রাতের খাবার জুটেও যায়। আজ তো সময় চলে গেছে বলে সে আশাও আর নেই। তাছাড়া সে সব পেতে হ'লে মন্দিরের গেটের কাছে তো সন্ধে থেকেই থাকতে হয়, নইলে কখন কে দিচ্ছে কি ক'রে জানা যাবে?

রেখার মা কোথায় গিয়েছিল ফিরে এসে বলল, তিনিরে দেইখা আইলা? কেমুন আছে?

কিছু তো বুঝতে পারলাম না। হাসপাতালে ওষুধ দেয় না।

ওষুধ দিবো না তো কি দেয়?

আমায় যে'বলল ওষুধ কিনে দিতে!

দিছ নি?

না গো। ট্যাকা কোথা পাব?

ক্যান তোমারে কিন্যা দিতে কইলো জানিনা। ডাক্তাররে কইলা না ক্যান যে টাকা নাই?

বললাম তো!

যখন কইছ তখন অরাই দিবো।

পরদিন বিকালে গিয়ে সীতা রোগীর সামনে দাঁড়াতেই কাতর কণ্ঠে নিরঞ্জন বলল, ওই দিদিমনিরা তোকে ডেকেছে।

সীতা দেখল দূরে একটা টেবিলের সামনে দুজন নার্স বসে কি কথাবার্তা বলছে নিরঞ্জন তাদেরই নির্দেশ করল। কেন ডাকছে সীতা বুঝতে পারল না। তবু তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তারাই জানতে চাইল, কি চাই?

আপনারা কি আমায় ডাকতেছেন?

তোমাকে! কেন?

আমায় যে বলল! আঙুলের নির্দেশে দূরে নিরঞ্জনকে দেখিয়ে দিল সীতা। ধাত্রী দেখে বলল, ও তুমি একশ চৌষট্টি নম্বরের বাড়ীর লোক? তা ওষুধ কই? ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন আন নি কেন?

ওষুধ তো কিনতে পারি নি দিদিমনি।

কেন?

ট্যাকা কোথা পাব?

তা কি আমরা জানি? ওষুধ না দিলে রোগী এখান থেকে নিয়ে যাও। খামোখা এখানে রেখে লাভ নেই। সীতাকে এই পর্যন্ত বলেই নিজেরা বলাবলি করতে লাগল, কি যে বলব ডাক্তার মাইতি যে কেন এই সব রোগী ভর্তি করে—

মাইতি আসলে ছেলে মানুষ তো—নতুন এসেছে এতশত বোঝে না।

বোঝে না তো করে কেন ? এখন কি ঝামেলা বল তো ! রোগীর অবস্থা তো একেবারেই ভাল না। বিনা ওষুধে কি এভাবে ফেলে রাখা যায় ? নিজেদের মধ্যে কথা শেষ ক'রেই আবার সীতাকে বলল, যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। নইলে এভাবে রোগীকে রাখা যাবে না, ছুটি করিয়ে নিয়ে যাও।

কথাটা শুনেই ভয় পেয়ে গেল সীতা, এই বিপন্ন রোগীকে নিয়ে কোথায় যাবে ? হাসপাতালে ভর্তি ক'রবে বলেই তো এতদিন ধরে কলকাতার পথে-ঘাটে এসে পড়ে থাকা। এখন আবার সেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবে কোথায় ? কিন্তু হাসপাতালে ওষুধ থাকে না তো কোথায় থাকবে ? হাসপাতালই তো ওষুধের জায়গা, চিকিৎসার ব্যবস্থা তো সব এখানেই থাকবার কথা।

সীতা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন ধাত্রী বলল, কি হ'ল ? যা বলবার সে তো বললাম।

এ রুগীকে কোথায় নিয়ে যাব ?

তা আমি কি ক'রে বলব ? যেখান থেকে এনেছ সেখানেই যাও।

সেখানে গেলে ও তো বাঁচবে না দিদিমনি।

এখানেই কি বাঁচবে ? ওষুধ না পেলে কোথাও বাঁচবে না। হাসপাতালের ওষুধের ভরসায় থাকলে কোন রোগীকে আর সেরে বাড়ী ফিরতে হবে না।

কথাবার্তা শুনে সীতা বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে না পারলে মানুষটা তো বিনা ওষুধেই মারা যাবে। এও তো একরকম বেঘোরেই মরা। তাহ'লে কি দরকার ছিল তার দেশ, গ্রাম, নিজের বাস্তু ছেড়ে আসবার ? কি দরকার ছিল এভাবে ভিখারীর দলে নাম লেখানোর ? একমাত্র ছেলে তাকেও কোনখানে যে হারিয়ে ফেলল তার ঠিক ঠিকানা নেই। মনটা হাহাকার ক'রে উঠল, ব্যথায় টসটস করে জল ঝরতে লাগল দুচোখ দিয়ে। ইচ্ছে হ'ল নিজের গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে এই অসহায়তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। সে আর সহ্য করতে পারছে না, এই জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক শান্তির। চোখের সামনে যদি মানুষটাকে এমন অসহায় ভাবে মরতে দেখতে হয়—

পায়ে পায়ে সে সরে এসে দাঁড়াল নিরঞ্জনের বিছানার ধারে। তাকে কাঁদতে দেখে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বউ ?

কি জবাব দেবে সীতা ? তার মুখ থেকে কথা সরছে না। সে কি করে বলবে যে টাকার অভাবে ওর জন্যে ওষুধ কিনতে পারছে না, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে দিচ্ছে ওকে নিঃশব্দে ? মুখে কাপড়ের আঁচল চাপা দিয়ে কান্নার বেগ রোধ করতে চেয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্না চাপার

কারণে। নিরঞ্জন কান্নার কারণ না বুঝে অধীর হয়ে জানতে চাইল, কি, কথা কোস না কেন?

ওরা ওষুধ দেবে না কেন? হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যাবে না তো আমরা গরীব মানুষ কোথা পাব?

নিরঞ্জন অকস্মাৎ শক্ত হয়ে গেল, বলল, দেখ, তুই হেথা আসিস নি। তোকে না দেখলে আর ওষুধ কিনবার কথা বলতে পারবে না, নিজেরাই দেবে।

নিরঞ্জনের প্রস্তাবে সীতার মন সায় দিতে পারল না। সে সারাদিনে একবার মানুষটাকে চোখের দেখাটা পর্যন্ত দেখতে আসবে না সে কেমন করে হয়? ঘর সংসার ছেলে সবই তো একে একে গেছে, থাকার মধ্যে কেবল এই মানুষটা, তার স্বামী, তাকে ফেলেই থাকতে হচ্ছে তা ব'লে দিনান্তে একবার চোখেও দেখবে না।

সীতার গররাজী ভাব দেখে নিরঞ্জনই আবার বলল, কি ভাবছু? হেথা আর আসবি নি।

সামান্য এই আপাত সরল নির্দেশটিতে ঝর ঝর ক'রে চোখের জল ঝরতে লাগল সীতার। তার ধারণা হ'ল টাকা জোগাড় ক'রে ওষুধ কেনবার অক্ষমতাকেই ভৎর্সনা ক'রছে নিরঞ্জন। তা ক'রলেই বা আর কি উপায়, কি ক'রে সে জোগাড় ক'রবে ওষুধ কেনবার টাকা? কে দেবে? এইনা মানুষ বলে হাসপাতাল গেলে সব ফিরি! কিছুর পয়সা লাগে না! কিছুর কোন হিসেব মেলাতে পারে না সীতা, আজব শহরে এসে সবই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, এই গোলক ধাঁধার মধ্যে সবই যেন গোলমেলে মনে হয়।

মদন এক চোরা স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। প্রথমে পল্টন, কটা, খন্তা ওদেরই সঙ্গে মিশে সে বুঝেছিল যে মায়ের বাপের কাছে থাকার বিকল্পও এই নগরীতে আছে। তেমনভাবে ওদের সঙ্গে না থাকলেও চলে, খাবার জুটে যায় শোয়া তো যেমন এতদিন পথে প্রান্তরে শুচ্ছে তেমনই শোয়া। বরং পল্টনদের সঙ্গে থাকলে একরকম মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। স্নেহের বন্ধনও এক বন্ধন, মদনের অসহ্য লাগে এই বন্ধনে আটকে থাকতে। কটাদের ওসব নেই। মা বাবা কিছুই নেই। কোনদিন ছিল এমনটাও মনে হয় না। কেমন স্বাধীন সম্পূর্ণ মুক্ত ওদের চলাচল। ওদের সঙ্গে মিশে থাকার আগে ক'দিন ধরে দূর থেকেই দেখছিল ভিখুকে। সম্বল বলতে কেবল একখানা বস্তা, সারাদিন পথে পথে কি যে কুড়োয় মদন জানে না, সন্ধে হ'লে গাড়ীবারন্দার তলায় সেই বস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ে। এক পাশে শোয়া, কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বলে না

কিছুই নয়, শোয় আর ঘুমোয়। সকাল হলেই আবার ওর বেরিয়ে পড়া কোথায় কে জানে, মদন জানে না।

ক'দিন দেখে মদনই ওর সঙ্গে আলাপ ক'রল গায়ে পড়ে, দিনের বেলা কোথায় থাকিস রে?

বিরক্ত চোখে মদনের দিকে তাকাল ভিখু, প্রথমটা জবাব দিল না তারপর বলল, ভাগ শালা।

আপন সহানুভূতিশীল প্রশ্নের এমন একটা রুক্ষ জবাব পেয়ে প্রথমটা কেমন থমকে গেল মদন, কি করবে ভেবে পেল না, তবে নড়লও না। ভিখুর কথামত ভাগলও না? ভিখু অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল ফিরে মদনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর নাম কি?

মদন ওর প্রথম জবাবে ক্ষুব্ধ ছিল তাই জবাব দিল না দেখে ভিখু বলল, আমার নাম ভিখু। তুই এখেনেই থাকিস?

থাকি। মদন বলল।

বোস বে।

নিঃশব্দেই বসল মদন। ভিখু বলল, আমার সঙ্গে চল দেখবি কি করি। তুই ওদিকে দেখেছিস? আমি আগে অনেক দূরে ছিলাম, সেই বড় টেশনের কাছে। শ্যালদা।

কোথায় রে?

বহু দূর।

চলে এলি কেন?

ভাল লাগল না।

কথাটা মদনের মনে ধাক্কা দিল না, ভাল লাগল না বলেই চলে এল ভিখু! ভাল না লাগলেই চলে আসা যায়? জানতে চাইল, তোর মা?

নেই।

বাপ?

এবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ভিখু, নেই। মদন তাতে কিছুই বুঝল না, নেই মানে কি? মা বাবা তো সব ছেলেরই থাকে, যেমন তার আছে। না থাকাটা কেন এবং কেমন সে বোঝে না। অথচ ভিখু স্পষ্ট করেই বলছে নেই। নেই তো কোথায় গেল? প্রশ্নটা করে জবাব পেল, মা মারা গেছে।

মরে যাওয়া কথাটা সে জানে বটে, শুনেছে বলে জেনেছে, তবে মরে যাওয়াটা যে কি দেখেনি বলেই তেমন নির্দিষ্টভাবে বোঝে না। মরে যাওয়া মানে না থাকা এইটুকু কেবল জানে। সেই অস্পষ্ট বোধ থেকেই সে চুপ ক'রে গেল। ভিখুও চুপ ক'রে থেকে হঠাৎই বলল, ধর্মতলায় একটা খেলা চলছে

দেখেছিস ?

খেলা ! খেলা তো মদন জানে ছেলেরা করে, খেলা চলাটা যে কি তার বোধগম্য নয়। সে বোকার-মত ভিখুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ভিখু জ্ঞানীর মত বলল, ধর্মতলার হলে শ্যামলালের জোর খেলা চলছে। শালা কি ভীড়, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠল মদনের কাছে। তার মনের সামনে একটা রহস্য যেন ফুটে উঠল। ভিখু তার অবাক চোখের চাউনি দেখেই বলল, তুই কি কোনদিন সিনেমা দেখিস নি ?

মদন জিনিসটা জানেই না। সিনেমা কি এবং কি করে যে দেখতে হয় তাই তার অজানা। পথ চলতে চলতে মাঝে মধ্যে এক একটা বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বড বড় ছবিটাঙানো দেখেছে তাতে সুন্দর সুন্দর সব ছবি, সুন্দর মানুষগুলোর মুখ, অনেক সময় অবাক হয়ে সেই ছবিগুলো দেখেওছে তার বেশী নয়, শুনেছে ওইগুলোই নাকি সিনেমা। ভিখুকে সে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, তুই দেখেছিস ?

খেলাটা দেখি নি। শালা বড়রা লাইনে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। মারামারি ক'রে হটিয়ে দিচ্ছে। শ্যামলালের জোর ফাইটিং আছে কিনা, খুব ভিড হচ্ছে।

মদন 'ফাইটিং' না বুঝতে পেরে বলল, কি আছে ?

ফাইটিং রে। তুই তো মহা ধুর্ আছিস। কিচ্ছু জানিস না !

মদন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হল অনেক কিছু না জানার জন্যে। ভিখু ছেলেটি ওর সমবয়সীই হবে অথচ কত কিছু জানে, কিছুটা সমীহ করে জানতে চাইল তুই দেখেছিস ?

এই খেলাটা দেখিনি। তবে 'বিন্দা সিং' বইটা তো দেখেছি শালা শ্যামলাল কি ফাইটিং ঝাডল ! পাঁচটা ডাকু ছিল পরপর ঝাড় পরপর ঝাড়। দিলদার ছিল বড ডাকু সে কিনা এসে শ্যামলালের পায়ের ওপর পড়ল। ভিখু এমন অনুপ্রাণিত হয়ে হাত পা নেড়ে তার দেখা ছবি বিন্দা সিং-এর ব্যাখ্যা করতে লাগল যে মদন মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিল। ভিখু খুব হাত নেড়ে ঘুঁসি পাকিয়ে বোঝালেও সিনেমা বস্তুটার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকার ফলে ভিখু যতটা বোঝাচ্ছিল মদন ঠিক ততটা না বুঝলেও সে বেশ আকর্ষণ অনুভব করছিল। উপসংহারে ভিখু বলল, আজকের নতুন খেলাটা দেখতে যাব। টিকিট ম্যানেজ করে ঢুকব। সুলতান বলেছে দেবে।

ভিখুর আগ্রহ দেখে মদনও অনুপ্রাণিত হল, দ্বিধা না করে বলেই ফেলল, আমাকে নিবি সঙ্গে ?

যাবি তোর কাছে পয়সা আছে ?

পয়সার কথা শুনে সংকটে পড়ল মদন। এতক্ষণ তো কথা বেশ চলছিল পয়সার প্রসঙ্গ এসেই তো একেবারে রসভঙ্গ করল। পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে? সে চুপ করে আছে দেখে ভিখু আপন ভূয়োদর্শিতাবশে বলল, কি রে, পয়সা নেই? তবে আর কি করে দেখবি? লাইন মারলেও তো ষাট পয়সা লাগবে!

ষাট পয়সা তো মদনের কাছে অনেক পয়সা। দশটা পয়সা পেলেই সে মুড়ি বা বেগুনি কিনে খেয়ে ফেলে। ষাট পয়সা একসঙ্গে তাঁর ভাবনার বাইরে। কাজেই আগ্রহ অসীম হলেও মদন যেন চুপসে গেল। চুপ করেই রইল। আর তার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে ভিখুর কেমন সমবেদনা হল বলল, দেখ আমার কাছেও বেশী পয়সা নেই তবে আমার মালগুলো বিক্রি করে দিলে যা পাব তাই দিয়ে হয়ে যাবে। তুই তো কামাস না ফেরত দিবি কি করে?

মদন অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে বলল, লোকের কাছে চাইব।

দূর শালা! মাঙলে লোকে কি পয়সা দেবে। আচ্ছা চল আমার সঙ্গে কাজ করবি।

কি কাজ?

এই আমি যেমন কাগজ কুড়োই। কোন কোন দিন তামা, পিতল, ভাঙ্গা এলুমনি এসব পেয়ে গেলে ভাল পয়সা হয়ে যায়।

মদন ভিখুর কথা কিছু বুঝল কিছু বুঝল না। তামা পিতল এলুমনি প্রভৃতি কুড়িয়ে পাওয়া এবং পয়সা রোজগার এসব কথার কিছুই তার বোধগম্য নয় বলে সে শুনে কোন কথা বলল না। কেবল ভিখুর প্রতি তার ধারণা ক্রমাগত বড় হতে লাগল, ওরই মত বয়সী হলেও কত বেশী জানে! অনেক জানে। অথচ সে নিজে কিছু মাত্র জানে না—কথাটা ভেবে সে ম্লান হয়ে পড়ল।

শেষপর্যন্ত ভিখু অনেকটা অনুকম্পা বশেই তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হওয়াতে মদন তার সঙ্গ নিল।

ভিখু বলেছিল, আর একখানা বস্তা যতক্ষণ না জুটছে তুই আমার সঙ্গেই থাক। রাস্তায় যে কাগজ দেখবি কুড়িয়ে নিয়ে আমার ঝোলার মধ্যে দিবি।

প্রথম বেরিয়েই ব্যাপারটা খুব কঠিন লাগল না। ভিখুর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার মানে যেটা ভিখু নিজে তুলত সেটা মদন তুলছে। তাতে তো আর বাড়তি লাভ কিছু হচ্ছে না! তবু শেখা তো হচ্ছে! তা ছাড়া ভিখু বলেছে বিকালে তাকে সিনেমা না কি দেখাবে—

দুপুর পর্যন্ত ঘুরে ঝোলা ভর্তি না হলেও খালের ধারে একটা টিনের চালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভিখু। মদন দেখল চালার ভেতরটায় অমন অনেক কাগজ ডাঁই করা আছে। এত কাগজ ভিখু কুড়িয়ে দিয়েছে! মদন অবাক

হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে এত পথ ঘুরে তাদের মাত্র একটুকু জোগাড় হয়েছে, এতটা পেতে তাহলে কতদিন লেগেছে ভিখুর?

কাগজপত্তর ওজন করে দিয়ে পয়সা বুঝে নিয়ে পথে নেমে ভিখু দুঃখ করে বলল, এই শালা মহাজনটা বড় খচ্চর। শালা বড় কম পয়সা দেয়।

দুজনে মিলে কত বাছাই করে মাল আনলাম বল? বলে কিনা অর্দ্ধেকের বেশী মাল গিলা। অর্দ্ধেক রদ্দি।

মদন কিছুই বুঝল না। কেবল ভিখুর মুখের ওপরকার প্রলিপ্ত অপ্রসন্নতা দেখে বুঝল পয়সা কম পেয়েছে। রদ্দি বা কি আর গিলা-ই বা কি মদন-এর জ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে বলে সে ভিখুর মনঃক্ষুণ্নতাটুকু বুঝেই চুপ করে রইল। হাতের পয়সাগুলোর দিকে চোখ রেখে ভিখু বলল, কি খাব বল তো?

বড় বাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় চলবার চেষ্টা করলেও মাথার খাড়া ওপরে সূর্য যেন আগুন ঢালছে। পেটেও বেশ ভালভাবেই সাড়া দিচ্ছে খিদের জ্বালা। নাঃ ঠিকই বলেছে ভিখু খাওয়া দরকার। কিন্তু কি বা খাবে? কি পাওয়া যাবে? কোথায় কি পাবে? এতক্ষণ ভিখুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তো চেষ্টাও করা হয়নি! বলল, কেন, পয়সা পেলে না?

এতে খেলে সিনেমা দেখতে পারবি না।

মদন অনুভব করল পেটে তার খিদে ক্রমশ বাড়ছে। এ অবস্থায় কোন কিছু ভাল লাগছে না। কাজেই ভিখু যদি খাওয়ায় তো খাওয়াই ভাল। সিনেমা না হয় নাই দেখল। জানতে চাইল, কি খাবে?

ছাতুওয়ালার কাছে ছাতু খাব চল—ভিখু সহজভাবেই বলল।

মদন কোনদিন ছাতু খায়নি, খেতে দেখেছে। অল্প পথ চলতেই দেখা গেল পথের ধারে নতুন লাগানো এক ছায়াতরুর তলায় একজন লোক কতগুলো এলুমিনিয়মের থালা, এক ধামা ছাতু জলের একটা ঘটি আর বালতিতে জল নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়। ভিখুরা পৌছাতেই সে ছোলার ছাতুর দুটি মণ্ড মেখে দিল তার সঙ্গে দুটুকরো পেঁয়াজ এবং একটু করে চাটনি।

ভিখু অতটা ছাতু শেষ করতে একটুও সময় নিল না। মদন ক্ষুধা পীড়িত হলেও ছাতু তার কাছে ভাতের বিকল্প মনে হল না কিছুতেই। তাই বহুক্লেশে সে ওটুকু শেষ করল। সময় আরও বেশীই লাগত ভিখুর তাড়ায় কিছুটা সংক্ষেপ হল।

ছাতু খেতেই পাওয়া পয়সা ফুরিয়ে গেল বলে মদনের আর সিনেমা দেখা ঘটে উঠল না। তাছাড়া সিনেমা হলের সামনের ভিড় দেখেই তার চক্ষুস্থির। যেভাবে অগণিত লোকের পায়ের তলা দিয়ে অনেকের লাথি খেতে খেতে ভিখু ঢুকে গেল তা দেখেই মদনের বাসনা দূর হয়ে গেল, পয়সা নেই বলে নয় থাকলেও

সে দেখত না।

ছবি শেষ হবার পর ঘর থেকে বেরিয়ে ভিখু দেখল রাস্তার ওপারের ফুটপাথে তার কাগজ কুড়োনো বস্তাটা পেতে মদন ঘুমিয়ে আছে। বিশাল অন্ধকারের মধ্যে বসে সে যখন অদ্ভুত এত মায়ার জগতের মোহে আচ্ছন্ন ছিল বেচারী মদন তখন ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছে ধরাতলে। মদনকে দেখে ভিখুর কোনই অনুভূতি হল না, ডেকে তুলল। বলল, চল বে। আপন ডেরায় চল। মাইরী শ্যামলালের কি ফাইটিং বে! নিজের দুহাতের ঘুঁষি বাগিয়ে ছবিতে দেখা ঘুষোঘুষির কায়দা দেখাবার চেষ্টা করতে করতে বোঝাতে লাগল, এই টিক ঢুসুম ওই টিক ঢুসুম।—প্রত্যেকটি বর্ণনার সঙ্গে আলাদা আলাদা ঘুসির মুদ্রা দেখাতে লাগল নিজের ক্ষমতার পরিমাপে। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে মদন প্রথমটায় তত আকর্ষণ অনুভব না করলেও অবাক চোখে অবুঝ বিস্ময়ে ব্যাপার স্যাপার দেখতে লাগল। যথার্থ বস্তু না দেখার জন্যে ভিখুর অনুভূতি তার ছিল না বলে সে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল না।

ফেরবার পথে কাগজ কুড়োতে কুড়োতে একসঙ্গেই ফিরেছিল দুজন কিন্তু নিজেদের ডেরায় ফিরে কাগজের ছোট বোঝা কাঁধে তুলে ভিখু যে কোথায় গেল আর পাত্তা নেই। দুপুরে খাওয়া ছাতু ততক্ষণে হজম হয়ে পেটে আবার নতুন ক্ষিধে সাড়া দিচ্ছে। কালীতলায় সন্ধেবেলা কিছু না কিছু খাবার মিলতো, এ এক এমন পাড়া যে কিছুটি কেউ দেয় না। কোন বাড়িতে রুটি বাসি থাকলে দেয়। ভাতও উদ্বৃত্ত থাকলে দেয়। তবে রাতে তো নয়! সকালেও সে ভাত সব সময় ভাল থাকে না।

এখন যে কি করা যায় ভেবে উঠে পড়ল মদন। আর ভিখুর অপেক্ষা চলছে না। কোথায় যায় সে? কোথায় গেলে জোটে রাতের খাবার? সারাদিন ভিখুর সঙ্গে ঘুরে কোথাও কোন সন্ধান করা হয় নি। নইলে কোন 'কেলাবের' বালক ভোজন বা কোন শ্রাদ্ধ বাড়ির ভিখারী ভোজনের সন্ধান থাকতে পারত। নিরুপায় হয়ে সে পল্টনদের ডেরায় গিয়ে দাঁড়াল। কটা খস্তা ওকে দেখেই বলল, কি বে শালা কোথায় গেছিলি কদিন?

মদন যথার্থ জবাব খুঁজে পেল না। তেমন করে যাওয়া যাকে বলে তা তাদের মধ্যে নেই। পথে পথে ঘোরা তো আর যাওয়া নয়! তাছাড়া ভিখু এখান থেকে বেশ একটু দূরেই থাকে তাকে এরা চেনে না বলেই তার প্রসঙ্গ এনে লাভ নেই। সে চুপ করে আছে দেখে খস্তা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, কি রে কথা বলছিস না যে?

ঘুরছিলাম।

দূর শালা পলটন তোকে কত খুঁজল।

কেন রে ?

কাল একটা বড় ভোজ ছিল। শালা বড় লোকের বাড়ি।

কোথায় ?

অনেকদূর। সেই শালা বালিগঞ্জের দিকে। যে বাড়িটায় ভোজ হয় রে! কালকের ভোজে খুব খাবার ছিল।

মদন চুপ করে রইল। তাদের ভোজ অর্থাৎ ভোগোচ্ছিষ্ট, লোকের পাতে উদ্বৃত্ত পড়ে থাকা এঁটো ত্যাক্ত খাবার যার আশায় পথের কুকুররা আঁস্তাকুড়ের সামনে বসে হট্টগোল করে। সেইগুলো হয় পাতা ফেলার লোকেদের কাছে চাওয়া যাতে তারা দয়া করে বেছে আলাদা করে ওদের দেয়। নইলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া পাতার থেকে কুকুর তাড়িয়ে কুড়িয়ে নেওয়া। ওতে সত্যিই নানা উপাদেয় খাবার পাওয়া যায় এমন সব খাবার যার নাম গোত্র কেউ জানে না, শুনবে না কোনদিনই। একই মাংস এক এক দিন খেতে এক এক রকম লাগে। তবে মাছ মাংস সেই ত্যাক্ত পাতে খুব কমই থাকে, যা জোটে তা লুচি বা মিষ্টি অথবা পলান্নও জুটে যায় কখন সখন। সেই ভোজের খবরে মদনের যে কোন অনুশোচনা হবে তা হল না। গেলে পেত, না পেয়েছে সে জন্যে সময় তো আর থেমে থাকে নি! উদরপূর্তি হলেই সে সন্তুষ্ট। কটা বা পল্টন যেমন ভালোমন্দ খাবার খোঁজে মদন তা নয়। যা হোক কিছু জুটে গেলেই হ'ল। তবে পল্টন যে তাকে খুঁজেছিল এজন্যে তার সবিশেষ দুঃখ হল। পল্টনটা ভাল। এতই ভাল যে সে না খেয়ে থাকলে নিজের খাবার থেকেও খেতে দেয়। অন্য কেউ তা দেয় না। তাই এই অসময়ে তাকেই মনে পড়েছে, জানতে চাইল, পল্টন কোথায় রে ?

জানি না—কটা জানাল।

তুই যে বললি আমাকে খুঁজছিল !

সে তো বিকেলে রে।

নিরাশ হল মদন। দুঃসময়ে কিছুই জোটে না। বন্ধুও না। কথার মধ্যেই খন্তা অকস্মাৎ দৌড়োতে চেষ্টা করতেই একটা বড় ছোকরা তাকে খপ করে চেপে ধরল। তাকে দেখেই কি ছুটেছিল খন্তা ? যে ছোকরাটা ধরল তার মুখের দিকে তাকিয়ে মদন আপন অভিজ্ঞতায় বুঝল যে এ হচ্ছে তাদেরই মত ছেলেদের বড় সংস্করণ। একে মাঝে মাঝে চৌরাস্তার মোড়ে ডিউটি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে দেখে, কটা মদনকে ফিসফিস করে বলল, ঘিমুয়া। এ শালা খোচরের দালাল।

খন্তাকে ধরল কেন ?

কটা উত্তর দিল না। মদনরা দেখল খন্তাকে হাত মুচড়ে ধরে এদিকেই

আনছে। হাতের ব্যথায় মাঝে মাঝে কুঁকড়ে উঠছে, কাতরাচ্ছে। কটা বুঝল বিপদটা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। পালাবার সময় আছে তবু সে পালাল না। এখন পালিয়ে গেলে কি ব্যাপার কিছু জানবে না অথচ পরে যখন এই ঘিসুয়া ধরবে খুবই মারবে। এখনকার মত সরে পড়লে ভবিষ্যতে বিপদ আরও বাড়বে। কাজেই অপেক্ষা করাই বুদ্ধির কাজ। ঘিসুয়া কাছাকাছি এসেই জানতে চাইল, বোল শালা সে মাল কোথায়?

খন্তা শারীরিক ক্লেশ সয়ে জবাব দিল, বলছি যে আমি জানি না। আমি দেখি নি।

ফির রোয়াব? ধমকের সঙ্গে সঙ্গে হাতের মোচড় একটু বাড়াল ঘিসুয়া, খন্তা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তাতে বিন্দুমাত্র নরম হল না ঘিসুয়া, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, শালা রেণ্ডিকে বাচ্চা ফির ঝুট?

গালাগালির কোন প্রতিবাদ খন্তা করল না কেবল বলল, ঝুট বলছি না, সত্যি আমি জানি না।

তার কথা ফুরোতে না ফুরোতে লোকটা ওর হাতে এমন মোচড় দিল যে ও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। সেই অবস্থাতেই বলল, আমি দেখিনি বলছি—

নির্মম ঘিসুয়া ততক্ষণে কটাদের একদম কাছে এসে পড়েছে। মদনকে নাগালের মধ্যে পেয়ে এক চড় কষাল গালে, সঙ্গে সঙ্গে বলল, এ শালা ভি জানে।

চড়টায় এত জোর ছিল যে মদনের খুবই আঘাত লাগল এবং মার খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় সে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে কেঁদে ফেলল। কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত কিছু না জেনে মারটা খেয়ে শরীরে যত লাগল মনে লাগল তার চেয়ে বেশি। কিভাবে প্রতিবাদ করবে বুঝতে না পেরে অসহায়ভাবে কেবল কাঁদতেই লাগল। তাকে চড় মারবার মুহূর্তেই কটা দুপা পেছিয়ে গিয়েছিল, খন্তা কটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, কে ওদের লোহা নিয়েছে আমি জানি না, দেখ আমাকে ধরে মারছে—

কিসের লোহা? বন্ধুকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই জানতে চাইল কটা। ঘিসুয়াই তার উত্তর দিল, শালা শুয়ারকা বাচ্চা চোরি করেগা?

কি চুরি করলাম? দূর থেকেই প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিল কটা।

লোহা রে রেণ্ডিকা বাচ্চা—

কোন লোহা? আমরা কোন লোহা তো দেখিইনি।

মদনের গালটা তখনও টনটন করছে জ্বলছে। তার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরছে তখনও। লোকটার ওপর রাগও হচ্ছে প্রচণ্ডই, সেই রাগ যেন মনের মধ্যে ফুটছে। কটার কথা তার কানে যাচ্ছে না, লোকটার কথাগুলোই কেবল

বিঁধছে তাকে প্রতি মুহূর্তে।

এরই মধ্যে লোকটা খন্তাকে একটা লাথি মেরে হাত ছেড়ে দিল। অমনি কিছুদূরে গিয়ে ধপাস করে ছিটকে পড়ল ছোঁড়াটা। ঘিচুয়া যাবার সময় শাসিয়ে গেল, ঠিক আছে পিছে ফির দেখা যাবে। সিধা হামার মাল বার করে দিবি নইলে শালা আবার যখন ধরব কলিজা খিঁচে লিবো।

লোকটা কিছুটা দূরে যেতেই কটা বলে উঠল, শালা! গায়ে হাত দিতে এসেছে! পুলিশের খোচর আছে তো কি, শালা নিজে চোর! ওদিককার লালুরা যা চুরি করে আনে ও শালা তার বখরা নেয় না? আমি একদিন নিজে দেখেছি শালা লালুর কাছ থেকে একটা ঘড়ি নিয়েছে। আমি কিছু জানি না আর আমাকে কিনা বলে চোর!

খন্তা হাতের যন্ত্রণায় বসে কাঁদছিল ঘিচুয়া চলে গেছে দেখে অশ্লীল সব খিস্তি করতে লাগল তার উদ্দেশ্যে। সেই সব অতি কদর্য শব্দগুলোতে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার ক্ষমতা ছিল বলেই সে যেন শান্তি পেতে লাগল।

মদন তো কিছুই জানে না. কি জন্যে এসব হল তার মাথাতেই ঢুকল না, সে ভাবল খন্তাদের দোষেই তাকে মার খেতে হল। তাই তার বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল খন্তাদের ওপরে। কান্নার বেগ কিছুটা কমলে সে খন্তাকেই বলল, আমি কিছু করিনি এখানে ছিলামই না। কিছু জানি না শুধু শুধু মার খেতে হল।

আমিই বা কি জানি শালা বেজন্মার বাচ্চা আমাকে শুধু শুধু মারলে— খন্তা গর্জে উঠল। তারপর বলল, ওরা কোথা থেকে রেলিঙ ভাঙা লোহা এনে নাকি রেখেছিল। কে তা নিয়ে নিয়েছে আমাকে ধরে শুধু শুধু মারলে!

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল কটা। সে খন্তাদের কাছে সরে এসে বলল, ও। কাল ওরা কোথা থেকে যেন রেলিঙ ভাঙা চুরি করে এনে রেখেছিল। কোন পার্কের রেলিঙ হবে।

আমি তো কিছু দেখিই নি খন্তা বলল।

আমি দেখেছিলাম। সেগুলো তো চুরি করে এনেছিল ওই বিহারী ছোঁড়াটা।

মদন সেই চোরটাকে চেনে না, জানতে চাইল, চোর রবি?

না রে! রবি কি বিহারী?

মদন রেলিঙ চোরকে চেনার ইচ্ছায় ইস্তফা দিল। ব্যাপারটা গোলমেলে এর মধ্যে না থাকাই ভাল। পেটের মধ্যে খিদের যন্ত্রণা এতক্ষণের উত্তেজনায় যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার মাথা চাড়া দিল। বেশি খিদে পেলে শরীর ভাল লাগে না, কেমন আনচান করে, তাই কটাকে বলল, কটা পয়সা দিবি দোস্ খুব খিদে লেগেছে মুড়ি খাব। তোকে ফেরৎ দিয়ে দেব।

কটা রুক্ষস্বরে জবাব দিল, আমার কাছে পয়সা নেই।

খুব খিদে লেগেছে মাইরি!

যাঃ ফোট্। খিদে লেগেছে তো আমি কি করব?

দে না মাইরি! আমি কালই দিয়ে দেব।

চ্যাল বে!

যাকে বন্ধু মনে করে তার এই রূঢ় ব্যবহারে মদন আঘাত পেল। নিঃশব্দে সে অন্যদিকে সরে গেল খাবার জোটাবার আশায়। এখন তার লক্ষ্যস্থল বড় রাস্তার মোড়ের মিষ্টির দোকান, যেখানে কচুরি খাবার জন্যে সারাদিন লোকে ভিড় করে থাকে। সামনেই একটা বিরাট টিনের মধ্যে অনবরত শালপাতাগুলো এনে ফেলে দোকানের কর্মচারীরা সেই সব শালপাতাতে অনেক সময় ডাল থেকেও যায়। মদনের লক্ষ্য হল সেই শালপাতা, ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধান।

দোকানটার সামনে পৌঁছে দেখল একটা কুকুর তার আগে এসে সেই পাতাগুলোর দখল নিয়েছে। সে দেরী এবং দ্বিধা না করে একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে ছুঁড়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। কুকুরটা কয়েক পা সরে গিয়ে বিস্মিত হয়ে মদনকে দেখতে লাগল। এ রকম ব্যবহারের জন্যে সে যেন আদৌ প্রস্তুত ছিল না অন্য একটা কুকুর হলে সে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারত, মানুষ সে যত ছোটই হোক শক্তি হিসেবে প্রবল তো বটে! তাই ক্ষুব্ধ চোখে কিছুক্ষণ মদনের দিকে তাকিয়ে দেখল যে তার প্রাপ্য খাদ্য প্রবলতর শক্তি খুঁজে খুঁজে খেয়ে নিচ্ছে। অনেকটা অসহায়ভাবেই সে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিটিয়ে থাকা পাতা ভাঁড় সন্ধান করতে লাগল যদি কিছু জোটে।

কিন্তু ফেলে দেওয়া পাতায় লেগে থাকা ডাল ছাড়া কিছুমাত্র নেই যাতে পেটের জ্বালা মিটতে পারে, অনেক ভাঁড়ের মধ্যে দু চারটে দই-এর ভাঁড়ের গায়ে লেগে থাকা দাগ চেটে তো আর পেট ভরতে পারে না। কিছুক্ষণ মিথ্যে হয়রান হল সে কেবল মাত্র। সে ব্যর্থ হয়ে সরে আসতেই কুকুরটা আবার সেই ত্যাক্ত পাতার জঞ্জালে ঢুকে পড়ল। মদন ভেবে পায় না কি করবে। পেটের মধ্যে দুঃসহ খিদে তাকে উত্যাক্ত করে তুলছে, সমস্ত শরীর অস্থির করছে সে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না। অযথাই ছটফট করতে লাগল ব্যথা বেদনা যন্ত্রণায়। কোথায় গেলে একটু খাবার পাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে সে হাঁটতে লাগল, এমন কেউ কি নেই যে একটু খাবার দিয়ে বাঁচায়! চারিদিকে দোকানে দোকানে এত খাবার, রাস্তার ধারে ধারে বিরাট বিরাট ঝাঁকা নিয়ে টিন নিয়ে বসে আছে ফুচকা, ঝালমুড়ি, আলুকাবলির ফিরিওয়ালা অথচ সামান্য একটু খাবার কোথাও নেই যা দিয়ে মদন আপাততঃ অন্তত তার পেটের যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে। হতাশ হয়েও সে হাঁটতে লাগল, এরই নাম বেঁচে থাকা

আর বেঁচে থাকার নাম জীবন। আর একটু গেলেই বড় রাস্তার মোড়ের কাছে সেই ছোট তিনকোণা পার্ক, সেই নোংরা ফেলা পার্কের গায়েই বসে আসগর হালিম বিক্রি করে, একদিন আসগর তাকে খেতে দিয়েছিল। বাঁচবার জন্যে সেই হালিমওয়ালা আসগরকে মনে করল মদন। এঁটো প্লেটগুলো ধুয়ে দেবার বিনিময়ে যদি একটু কিছু খেতে দেয়—

জীবন সীতাকে জানিয়েছে যে জীবনটা বেঁচে থাকার জন্যেই। আর এই বেঁচে থাকবার নিরন্তর চেষ্টায় যে চলাচল তারই নাম জীবন। এই চলাচল অব্যাহত রাখবার জন্যে আহার চাই, নিয়মিত নিদ্রা চাই, মানুষ নামধারী প্রাণীদের সামান্য হলেও বস্ত্রও চাই। সবকিছুরই একটা পরিমাপ আছে যে মাপের নিচে হলে আর চলে না। সেইটুকু সংগ্রহ করতেই প্রাণান্ত হয়ে যাবার যোগাড় জীবন থাকবে কি করে? এরই মধ্যে সে অবাক হয়ে যায় এতবড় শহর এত মানুষ তাদের এত উজ্জ্বলতা, এত বাড়ী, এত গাড়ী, এত সমারোহ অথচ সামান্য দুটো ভাত জোটাতেই কি হয়রান।

হাসপাতালে সদরের ভেতরে একটা ছায়াপ্রদ গাছের তলায় ভরদুপুরে বসে সে ভাবছিল এত যে মানুষ অবিরত আসছে যাচ্ছে তাদের কারও কোন যন্ত্রণা আছে বলে তো মনে হয় না! হাসপাতালেই আসছে যাচ্ছে কিন্তু সকলেরই শরীরে এত বেশী কাপড় যে মনেই হয় না কাপড় যোগাড় করা কষ্টকর। প্রায় সব লোকই স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, কোথায় যে ওদের এত খাবার জোটে সেই ঠিকানা জানতে পারে নি সীতা। এইসব ভাবনার মধ্যেই নজরে এল একজন মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে গাড়ী থেকে নামল, আরও একজন মহিলা তাকে ধরে আছে। সঙ্গে দুজন পুরুষ নামল তারাও কেমন গম্ভীর। ওদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। অবাক হয়ে সে কেবল এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মূল দরজার সামনে লোহার গেটের এপাশে ভিড় জমে উঠতে সীতা বুঝল এবার সময় হয়ে এসেছে সবাই রোগীর কাছে যেতে পারবে। আগন্তুক অনেকের হাতেই নানা পাত্রে অনেকরকম খাবার, সে কিছুই আনতে পারে নি। নিরঞ্জন যেন কিছু আশাও করে না। ও যেন সব আশা আকাঙ্খা ত্যাগ করে স্তব্ধ হয়ে আছে বিরাট কিছুর প্রতীক্ষায়। ওকে এমন নিঃশব্দ ভাবলেশহীন দেখে কেমন ভয় লাগছে ইদানীং সীতার। বেশ কিছুদিন আগেই নার্স-দিদিমনিরা ছুটি করে দিয়েছিল নিরঞ্জনকে, বলেছিল, বাড়ি নিয়ে যাও।

শুনে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল সীতার মাথায়, কোথায় বাড়ি। সামান্য সেই কুঁড়ে ঘর তো কবেই ভেসে গেছে অতি অভাবের বানে, কোনদিনই তার

আর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না খুঁজে। কোথায় যাবে সে নিরঞ্জনকে নিয়ে? হতাশ কণ্ঠে তাই সেই দিদিমনিদেরই ধরে বসল, কোথা যাব মা? ফুটে থাকি, মানুষটার চিকিচ্ছের জন্যে ঘর ছেড়ে কলকাতা এসেছি। মানুষটাকে ভাল করে দাও মা তোমাদের গড করি—বলেই খপ করে একজনের পা ধরে বসল। মহিলাটি পায়ে সীতার স্পর্শ বাঁচাতেই যেন চট করে দু পা পেছিয়ে গেল, আহা হা কর কি। আমরা কি করব তুমি বরং কাল সকালের দিকে এসে বড় ডাক্তারবাবুকে ধরো। উনিই একমাত্র রাখতে পারেন।

আমি তো চিনিনা মা—সীতা জানাল।

তুমি সামনেটায় দাঁড়িয়ে থাকবে দেখবে ছোট ডাক্তারবাবুরা তাঁর পেছন পেছন ঘুরবেন।

সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করাতেই নিরঞ্জন আজও এখানে আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে শরীরের উন্নতি যে কিছু হচ্ছে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং দিনে দিনে ঝিমিয়েই পড়ছে মানুষটা। এখন তো আর কথাবার্তাও বলে না, খুব ডাকাডাকি করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়ত একটু মাথা নেড়ে জবাব দেয়, দৈবাৎ ক্ষীণ স্বরে মুখে কিছু বলে যা বুঝে নিতে সমস্ত অনুমান ক্ষমতাকে জড় ক'রতে হয়। সীতা বুঝতে পারে না কলকাতায় এত বড় বড় হাসপাতাল এত নার্স এত ডাক্তার গ্রামের মানুষেরা ভাল হবার আশা করে আসে, কি ভাল হয়, কোথায় ভাল হ'ল নিরঞ্জন? সীতা তো বুঝতে পারছে না কেমন আছে। তবে বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় পড়ে নেই এইটুকু যা তফাৎ। এ সুযোগটুকুবা ক'দিন থাকে কে জানে, প্রতিদিন ভয় হয় এই না বলে রোগী নিয়ে যাও। বললেই হ'ল কারণ এটা সে ভালই বুঝেছে যে হাসপাতাল হ'ল বড়লোকদের জন্যে, তাদের মত গরীব লোকদের জন্য নয়। তার মধ্যে যে এটুকু সুযোগ জুটেছে এই যথেষ্ট। আসলে গরীবদের কেউ নেই, ভগবানও নয়। লোহার টানা দরজা সরে যেতেই লোকজন পিলপিল ক'রে ঢুকছে দেখে সীতা তাদের সঙ্গে মিশে গেল। চলমান স্রোতে পড়তেই কেটে গেল তার ভাবনা, ধীরে ধীরে সে নিরঞ্জনের বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্যদিন এসময়টা নিরঞ্জন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ঘুমের আচ্ছন্নতায়, আজ দেখল তাকিয়ে আছে। দেখে তার ভাল লাগল, শুধু তাই নয় জিজ্ঞাসার জবাবে ক্লান্ত স্বরে নিরঞ্জন জানাল, আজ একটু ভালই আছে। নতুন ওষুধ আর ইংজেকশন দিয়েছেন ডাক্তারবাবু।

সীতা মনে মনে প্রণাম জানাল মা শীতলা মা কালীর উদ্দেশ্যে। জানতে চাইল, কি খেল্যা?

মাছ ভাত।

শুনে সীতা খুশি হ'ল। অল্প কথায় সারলেও নিরঞ্জন জবাব দিচ্ছে বলেই ভাল লাগল। এবং কেবল জবাবই নয় অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর ও আচমকা প্রশ্ন করল, ছেলেটাকে পেলি?

নিঃশব্দে নেতিবাচক মাথা নাড়ল সীতা। কথাটা তাকে নতুন বেদনায় নতুন ক'রে আহত ক'রল। মদন তার সর্বক্ষণের অন্তর্দাহের বিষয়, মনে হ'ত নিরঞ্জন যেহেতু পুরুষ মানুষ কঠিন প্রাণ তাই ভুলে গেছে, আজ বুঝল তারই মত মনে মনে দগ্ধ হ'চ্ছে ও বেচারীও এই রোগ শয্যায় শুয়ে। একটিবার যদি ছেলেটাকে পেতো তো বাপের কাছে এনে হাজির করত, সে যে কোথায় গেল কেনই বা গেল—। সীতা অনেক কিছুরই যেমন কোন কারণ খুঁজে পায় না তেমনই পায় না মদনের চলে যাবারও।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে গৌরীকে খোঁজ করছিল পেল লালুকে। অল্প বয়স্ক ছোকরা কোথায় কোথায় বাদামভাজা বেচে ঘোরে। বাদাম ভাজার টিনটা দোকানে রেখে দেয় সেখান থেকেই ভাজা বাদাম কিনে নিয়ে বিক্রি করে বেড়ায় এদিকে সেদিকে। ওকে পেয়ে মাথায় চিন্তাটা এসে গেল সীতার, ধরে বসল, তুমি তো বহু জায়গায় বাদাম বেচে ঘোরো, মদনকে দেখতে পাও নি?

আপন মাতৃভাষায় স্বগতোক্তির মত ক'রেই সে বলল, তোহার লড়কা হম বনা দেব।

সীতা বেশ ক'বছর এই শহর কলকাতার রাজপথে বসবাস করলেও হিন্দি বা তার সহযোগী ভাষাগুলো সম্পর্কে কোন ধারণাই গড়ে তুলতে পারে নি চেষ্টার অভাবে, তাই কিছু না বুঝে বলল, কি বলতেছ কিছু বুঝতে পারছি নি।

লালু আবারও নিজের মত করেই বলল, মউগী ভোঁসড়ী কো কা কহে হম। তু মেরে গলে লাগা .ল তো তোহার লড়কা বন যাই। লড়কে কো ক্যা কম্মি বা?

কথা বলতে বলতে লালু এমন একটা শব্দ বলল যার অর্থ সীতার গোচরে, শোনামাত্র সে মুখ করে উঠল, মারব মুখে খ্যাংড়া। মুখ পোড়াগুলোর খালি এক কথা।

সীতার মনের ক্ষোভ কথায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল না সে তা করল না বলেই। লোকটাকে দিয়ে তার কাজ তুলতে হবে। মদনের খোঁজ নিতে একে তার দরকার। হাসপাতালে শুয়েও মানুষটা ছেলের খোঁজ করছে এখনও যদি তাকে পাওয়া যায় বাপ তাহলে শান্তি পাবে। সে কলকাতার যতটা অংশ দেখেছে গৌরী বলে এ নাকি তার একভাগও নয়, তবে যে কত বড় সবটা ঘুরে কারও দেখা হয়নি। তাই যদি হয় তাহলে কিছু চেনে না জানে না সীতা কোথায়

খুঁজে বেড়াবে সেই ছেলেকে? লালু যা হোক সীতার কথায় রাগ করেনি তাই বলল, তুমহার ছেলিয়াকে খুঁজবো তো হামি কুছু লিবো না?

কি নিবি?

তুমহাকে লিবো।

সীতা ফুটপাতের আর দশটা মেয়ের মত পারে না তবু যেন মুখ ফস্কে বলে ফেলল, ঠিক আছে মদনকে খুঁজে লিয়ে আয়।

লালু কথাটা ধরে ফেলল, ঠিক আছে। দমভর লিবো শালী তুকে।

লালু ছোকরাটা নব যুবক, শরীরের বাঁধন দেখলে বোঝা যায় অফুরন্ত তেজ, সীতার বাসনা কিঞ্চিৎ প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল, ঈষৎ চটুল ভাবেই বলল, হেদে যাবি।

কথাটার অর্থ না বুঝতে পেরে সে জানতে চাইল, মতলব?

এর অর্থ সীতাও বুঝল না, বলল ওসব জানিনি আগে মদনকে খুঁজে আন তারপর সব বুঝবি।

লালু স্থির করল এই মেয়েটাকে ভোগের জন্যে পাবার কারণে সে খুঁজে বের করবেই ওর সেই কেলে পুঁচকে ছোঁড়াটাকে। মাগীটার একটু বয়েস হয়েছে তাতে কি রাস্তার আর মাগীগুলোর মত দশজনের সঙ্গে তো আর শোয় নি! সামনের বড় বাড়ীর দারোয়ান থেকে শুরু করে মিঠাইওয়ালা পর্যন্ত কে না চেষ্টা করেছে ওকে 'জপাতে', কেউ পারেনি। শালা কঠিন মাল বলে কদর বেশি। ওকে চিৎ করতে পারলে ইজ্জতও হবে আরামও হবে।

লালুকে এড়িয়ে যেতে পেরে সীতা গৌরীর খোঁজ করতে লাগল। যে গৌরীকে অনেকেই পছন্দ করে না তাকেই বেশী প্রয়োজন কারণ এত দিন কলকাতায় এসে সে যে কাজ করতে পারেনি সেই কাজ করে দিয়েছে নিরঞ্জনকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। এত বড় নির্বান্ধব দেশে গৌরীই যেন তার একমাত্র সহায়। তার ভরসাস্থল। আচ্ছা গৌরী কি মদনকে খুঁজে দিতে পারে না? ওকে যদি চেপেচুপে ধরা যায় তবে কি চেষ্টা করবে না মদনকে খুঁজে দিতে? মুখে যতই বাজে বলুক ওর মনটা খুবই ভাল, করলে করতেও পারে। খারাপ কথা একটু বেশী বলে বটে—তা বলে মনটা আদৌ খারাপ নয়। কিন্তু মানুষটা যে থাকে থাকে কোথায় যায় কে জানে। কোথায় বা খুঁজবে তাকে!

বিরক্ত হয়ে পড়ে সীতা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সন্ধে যখন উত্তরে গেছে যেখানেই থাক মাসী ফিরবেই। ঐ তো সব জিনিষপত্র পড়ে আছে, তবে আর কিসের ভয়। আসুক তখনই যা হোক বলবে। বলেই বা কি করবে, যে কথা আগেও বহুবার বলেছে আরও একটা বার সেই কথাটা বলে লাভ যে কিছু হবে না তা জেনেও সীতা বলবে; যদি কিছু হয়! আগে হয়নি

বলে এখনও যে হবে না এটা কে বলতে পারে? আসলে গৌরীমাসীটা বড় খামখেয়ালী আপন ইচ্ছায় কোন কাজ যদি না করবে তো কার বাপের সাধ্য সেটা করায়! আর ও যা করতে বলবে তা না মানলে সম্পর্ক রাখবে না তার সঙ্গে। কি কষ্টে মানুষটাকে যে মানিয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে সে একা সীতা-ই বোঝে। নইলে যে আর উপায়ই নেই, এমন একজন মানুষ নেই যে একটু সাহায্য করবে। ও তো তবু আগবাড়িয়ে করে।

আর চলছে না। কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না। সারাদিন হাত পেতে যা জোটে তাতে পেট ভরে না। কোন একটা কাজ জোটাতে হবে। কি কাজ বা জোটাবে? কে দেবে কাজ? এক আছে লোকের বাসনমাজা। সেও শোনা যায় পাঁচটাকা সাতটাকার বেশী দেয় না কেউ। কি হবে তাতে? দশবাড়ী যে মেজে বেড়াবে অত সময় কোথায়? বিকালে যে সময় কাজ সেই সময়টা তো হাসপাতালে হাজির থাকতে হয়। বসে আকশপাতাল ভাবছে এমন সময় কোত্থেকে লালু এসে এক ঠোঙা মুড়ি দিল। খুলে দেখে তার মধ্যে দুটো বেগুনী। লালুকে দেবদূত মনে হল। এত ক্ষিধে লেগেছিল যে পেটের মধ্যে ব্যথা হতে হতে মুখে কেমন ফেনা ফেনা হয়ে যাচ্ছিল থুতু শুকিয়ে। জিব গলা সব শুকিয়ে ভয়ানক এক অস্বস্তি। এই সময়টিতে এক ঠোঙা মুড়ি যত ছোটো ঠোঙাই হোক অনেক মনে হয়। কোনদিকে না তাকিয়ে মুড়ি মুখে দিতে লাগলো সীতা। যেন হারানো প্রাণ হঠাৎই ফিরে পেয়েছে। খেতে আরও ভাল লাগল এইজন্যে যে মুড়িটা দিয়ে লালু আর দাঁড়ায় নি, কোন কৃতজ্ঞতার প্রকাশ পর্যন্ত দেখতে চায় নি। আগে যে সব প্রস্তাব করেছিল সেটাও পুনরুত্থাপন করে নি। ঠোঙাটা ওর কোলের ওপরে নামিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

মুড়িটুকু শেষ হতে সীতা যেন বাঁচল। এবার কিছু জল দরকার। বড় তেষ্টা পেয়েছে। ক্ষিধে মেটবার পর সেই তেষ্টা প্রবল হল। সীতা উঠে পড়ল, কলের জল তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে, কালীমন্দিরের কাছে ট্যাঙ্কে জল তো থাকে, এখন অতটা দূরে যেতে ইচ্ছেও করছে না, একটু জলপানের জন্যে অত-দূরে যাওয়া! তার চেয়ে বরং সামনের মিষ্টির দোকানে গিয়ে—তখনই মনে হ'ল ফুটপথবাসী কাউকেই দোকানের দরজায় পা রাখতে দেয় না। কত অসুবিধে এখানে—একটু জল খাবে তার পর্যন্ত উপায় নেই। কি সুখেই যে কলকাতায় থাকা! পরক্ষণে মনে এল তবু তো কলকাতা বলে টিকে আছে, নইলে চাল-চুলোনেই এমন মানুষের আর জায়গা কোথায়? গ্রামে তো আর এমন বাঁধানো ফুটপাথ নেই আর এমন গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ীও নেই যে রোদেজলে মাথা গুঁজবে। এ এক এই কলকাতাতেই সম্ভব। সে তো একা নয় তার মত কত তো

এখানে সেখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। এইভাবে থাকা ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন পথ নেই, একবার যখন জন্মে গেছে তখন বেঁচে থাকা ছাড়া কোন উপায়ও তো নেই। থাকতে যখন হবে তখন এইভাবেই থাকতে হবে—সীতা বুঝল। সকল রকম অবস্থার সঙ্গে আপোস করে চলবার নামই তো জীবন।

সামনে দিয়ে মোটাসোটা তাদেরই পর্যায়ের একটা মহিলাকে যেতে দেখে গৌরী ডাকল, দিদি, ও দিদি!

মহিলাটি দাঁড়াতেই বলল, তোমাকে তো প্রায়ই দেখি দোকান বাজার করে এ পথ দিয়ে যাও। কোথায় থাক গো?

মহিলাটি জানাল, ওই দশ নম্বরে থাকি।

দশ নম্বর যে কোন বাড়ীটা গৌরী জানেও না, জানতে চাইলও না। হবে কোন একটা, কাছে পিঠেই হবে। অযথাই যেমন ডেকেছিল তেমনই অযথা জানতে চাইল, কি কর গা?

বাবুদের বাড়ী কাজ করি।

খালি এক বাড়ীতেই কর?

না। ওই বাবুদের বাড়ী থাকি কাজ করি আর আশেপাশে কয়েক ঘরে কাজ করি।

খাওয়া দাওয়া?

বেশির ভাগ যে বাড়ী থাকি তারাই দেয় নইলে এবাড়ি সেবাড়ি করে হয়ে যায়।

তা তোমার ছেলে পিলে নেই?

একটা মেয়ে আছে; সে বাবুদের মেয়ের বাড়ীতেই থাকে সেই চেতলায়। মাঝে মাঝেই আসে।

সোয়ামী নেই বুঝি?

না।

মরে গেছে? অন্তরঙ্গভাবে জানতে চাইল গৌরী। প্রথম আলাপে অতটা জানতে চাওয়া উচিত কিনা সে সব বিবেচনা ওর এল না। কাজের মেয়েটিও বেশি দ্বিধা না করেই বলল, সে আর কেন বল এক আবাগীর বেটি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করে নিলে না আজ কত বছর হল!

ওমা! তাই বুঝি? তা সে আচে কোতায়?

ছিল তো চেতলায় শুনি কোথায় উঠে গেছে।

কে বললে?

আমার মেয়ে যে বাড়ীতে থাকত তার কাছেই ছিল। তা সে দিয়ে আর

আমার কি হবে বাপু—আমি জানি তাকে ডানে খেয়েছে। নইলে এত বছরে তার মায়া কাটলো না!

তা মেয়েটি তোমার কত বড়?

বার তের বছর হবে।

সীতা ওদের আলাপ শুনছিল। এই মহিলাটিকে সে নিজেও প্রায়ই দেখে কিন্তু কোনদিন যেচে আলাপ করে নি, কারও সঙ্গেই বেশি কথা বলায় তার অনভ্যাস তার ওপর আবার যেচে আলাপ! কখনই সম্ভব নয়। তবে গৌরীকে আলাপ করতে দেখে বলল, আমাকে ক'টা কাজ খুঁজে দিতে বলনা গো মাসী!

কথাটা গৌরীকে বললেও মহিলাটি নিজেই জবাব দিল, তুমি বাড়ীর কাজ করবে? বলে তো অনেকেই ভাল লোক আর ভাল বাড়ী দুই-ই তো চাই।

গৌরী বলল, তা দেখ না দু এক বাড়ী কাজ। ও তো একবারে ঝাড়া হাত পা কাজ করতে কোনই অসুবিধে নেই।

ঠিক আছে। তোমরা তো এখেনেই থাক আমি দু এক দিনের মধ্যেই খপর দেব। আমাকে ঐ রাস্তার সব বাড়ীতেই সাধনার মা বলে জানে, বললেই চিনিয়ে দেবে।

সীতা আচমকা জানতে চাইল, মাইনে কত দেবে?

যেমন কাজ তেমন মাইনে। সব বাড়ী কি আর এক রকম হয়? সে তুমি বাছা দেখে নিয়ো না পোষালে তো আর করছ না!

ঠিক কথা—সায় দিল গৌরী।

সেদিনের মত চলে গেলেও একটা দিন বাদেই সাধনার মা এসে সীতাকে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি গো মেয়ে কাজ করবে? আমি যে বাড়ী কাজ করি সামনের বাড়ীতে এক ঘরে কাজ আছে। আমাকে কদিন ধরেই বলছিল।

সীতা জানতে চাইল, কি করতে হবে?

বাসন মাজবে আর দুটো ঘর মুছে দেবে।

গৌরী সে সময়টা ছিল না বলে সীতা কেবল জিজ্ঞাসা করল, কখন যেতে হবে?

মাইনে পত্তরের কথা বলে নিতে চাও তো এখনই যেতে পার। পোষালে করবে না পোষালে না করবে, আমার বাপু কোন দায়দায়িত্ব নেই তা আগেই বলে দিচ্ছি।

সীতা একথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল, জীবনে কখনও লোকের বাড়ী কাজ করে নি কি যে করতে হবে না হবে তার জন্যই লাগছে। কিসের দায় দায়িত্ব বলছে—দায় দায়িত্ব বা কি জিনিষ সীতা ভেবে পেল না।

ওর মুখ চোখের ভাব দেখে সাধনার মা-ই বলল, কি হল, ভয় পাচ্ছ ?

কি জানি আমি তো কাজ কখন করিনি —

নিজের ঘরেও তো ঘর মুছেছ বাসন মেজেছ না কি করো নি। এও সেই কাজ, এর আর ভয় কি।

এরকম বললে তো হয়, এতক্ষণ কি রকম কথা যে মেয়েটি বলছিল—সীতা ভাবল। সাহস পেয়ে বলল, চল।

স্থির হল মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। এক বাড়ী বলে সাধনার মা এনেছিল কিন্তু একই সঙ্গে পাশাপাশি দু বাড়ীতে কাজ ঠিক করে দিল। দ্বিতীয় বাড়ী কাজ কম তাই বিশ টাকা। মাস গেলে পঞ্চাশটা নগদ টাকা হাতে পাবে এই সম্ভাবনাতে সীতা মনে মনে বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা সত্যিই অভাবিত। জীবনে কখন এতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখেনি যে সীতা তার হাতে সেই টাকা আসার ভাবনা যে তাকে উৎফুল্ল করবে সে আর আশ্চর্য কি। ওই টাকা দিয়ে কি করবে সে ভাবতে লাগল। নিরঞ্জনের জন্তে ওষুধ তো কিনবেই। বাকি টাকা দিয়ে মদনের জন্তে একটা জামা প্যাণ্ট কিনতে হবে। আহা একটা মাত্র প্যাণ্ট পরে ছেঁড়া গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে কোথায় গেল ছেলেটা ! কি করছে, কি খাচ্ছে বা কেমন আছে কে বা জানে ? সবাই বলে কলকাতা শহরটা নাকি অনেক বড়, ওদিকে নাকি আরও বহু ঘরবাড়ী আছে। সে যে কোনদিক সীতা জানে না, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেও তো অনেক বড় বড় বাড়ী ঘর ছিল। মদনের বাপ বলেছিল কলকেতার বাজার বাড়ী সেই বাড়ীও তো দেখেছে, সেইদিকে আবার ফিরে যায় নি তো ছোঁড়াটা ? কার সঙ্গেই বা যাবে, সীতা নিজেই তো এখন আর চিনে যেতে পারবে না অতটুকু ছেলে যাবে কি করে ?

যে বাড়ীতে ত্রিশ টাকা মাইনে দেবে সে বাড়ীর গিন্নি বলেদিয়েছিল, তা আজই বিকাল থেকে এসো। কথা যখন হয়েই গেল—কেমন কাজ কর আজ দেখে নেব।

বিকালে যে তাকে হাসপাতালে যেতে হবে স্বামীকে দেখতে সে কথা বলতেই মহিলা যেন আঁতকে উঠল, কেন তোমার স্বামীর কি হয়েছে ?

পেটের ব্যামো মা —পেটে ব্যথা। ডাক্তাররা বলে পিত্তশূল না কি যেন।

ও বাবা। তাহলে তুমি কাজ করবে কখন ?

কি করব মা হাসপাতালে দেখতে যাবার তো কেউ নেই—

বেশ হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে কাজটা করে দিয়ো—তাও তো আবার মুস্কিল হাসপাতালের কাপড়ে ঘরের কাজ কেমন করে করবে বাপু ? তার চে বরং যাবার আগেই করে দিয়ে যেয়ো। পারবে না ?

সেই পরামর্শ অনুসারে দুপুর গড়িয়ে যেতেই এসে এক রাশ বাসনের সামনে বসে ভেবে পেল না সীতা কি ভাবে এত বাসন মাজবে। গিন্নিই বলল, কি গা মেয়েমানুষ বাসন কি কোন দিন মাজ নি? উনোন থেকে ঝেড়ে ছাই নিয়ে শালপাতা দিয়ে ঘষে মেজে ফেল, বসে দেখছ কি?

উনোন ঝেড়ে ছাই বের করবার যে কায়দা আছে তা জানা নেই বলে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল অতিকষ্টে যখন ছাইগুলো বের করে আনল গৃহকর্ত্রী উনোন দেখে বলে উঠল, দিলে তো উনুনটা ভেঙে?

সীতা অবাক হয়ে কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—উনোন আবার কখন ভাঙল সে?

তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মহিলা মুখিয়ে উঠল, অমন হাঁ করে দেখছ কি? হাত পাগুলো সাবধানে নাড়তে পার না? এখন এই ভাঙা উনুনে আমি কি করে রাঁধব বল তো? ভাল জ্বালা হল এক কাজের লোক রেখে।

সীতা বুঝতেই পারল না উনোনটা ভাঙল কোথায়। গিন্নি যখন বলছে নিশ্চয় ভেঙেছে ধরে নিল। সত্যিই তো এসব উনোন নাড়াচাড়া করা তাদের অভ্যেস নেই ভাঙতেও পারে। দেশে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করত এখানে ফুট-পাথে যে কদিন করেছে বা করে তিনটে ইঁট তিন পাশে সাজিয়ে কাগজ পাতা হাবিজাবি দিয়ে আগুন ধরিয়ে টিনের কৌটোয় করে ফুটিয়ে নেয় ভাত। যেখার যার যে রান্নার অত আয়োজন আছে তারও তাই, উনোন কারও নেই।

বাসনগুলো মেজে শেষ করতে প্রায় সন্ধে লেগে গেল। অথচ কাজে হাত দিয়েছে বলে না করেও উঠতে পারল না সীতা, ফলে হাসপাতালে আর যাওয়া হল না। মন বড়ই বিষন্ন হয়ে পড়ল। যেভাবে ভদ্দর লোকেদের বাসন মাজতে হয় তাও তাদের দেশে গাঁয়ের পদ্ধতি থেকে কিছু আলাদা। সেখানে পুকুরে ডোবায় বাসন ডুবিয়ে রাখলে ময়লা আপনি অনেকটা কেটে যায় পরে একটু মাটি বুলিয়ে নিলেই তাদের গরীব ঘরের একখানা বাসন সাফ। এখানে অত জলের ব্যবস্থাও নেই মাটিও নয়। ছাই দিয়ে ঘষতে ঘষতে অনভ্যস্ত হাতে দেরী লাগল অনেকটাই। এরপর আবার আছে ঘর মোছা। সীতা বুঝল এক বাড়ীতে কাজ করতেই তার সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে যাবে। কখন সে কাজ সারবে আর কখন আর এক বাডী যাবে কাজ করতে। হাসপাতলে যাওয়া তো আজ হলই না। সাত পাঁচ ভেবে সীতা গৃহিনীকে বলল, আমি একবার ঘুরে আসছি।

শুনেই তো গিন্নি চমকে উঠল, যাবে কিগো? এই কটা বাসন মাজতেই তো সারাটা বেলা কাটিয়ে দিলে এখন আবার বাসি ঘর রাখছ ফেলে?

সীতা কোনই কথা বলল না। বাসন মাজা ছাই লেগে থাকা হাত পা

ভাল করে ধুতে লাগল। গিন্নি ভাবল পরিষ্কার হয়ে ঘর মুছতে লাগবে, কিন্তু গিন্নি একটু চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্রই সীতা সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। সে পারবে না। একাজ তার দ্বারা হবে না। সাধনার মাকে পথে দেখতে পেলে বরং বলে দেবে অন্য বাড়ীর কাজে কাল থেকে যাবে এ বাড়ীর কাজ করতে গেলে তার আর হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়া হচ্ছে না। একবেলা বাসনটা না হয় এদের মেজেই দিল সে, অভিজ্ঞতা তো হল। তবে কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল ততটা নয়। ভদ্দরলোকেদের বাসন মাজার ধারা আলাদা, তাদের কোন কিছুই ওদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু ভদ্দর লোকের বউদের ব্যবহার এত খারাপ হয় এমনটা সীতার ধারণা ছিল না—এত খিটখিটে! তার মনে হত ভদ্দরলোক মানে ভদ্দরলোক; এ আবার কেমন রে বাবা! কোন কথাটাই যেন ভাল করে বলতে মন চায় না। সবই কি এই রকম? কি জানি গৌরী মাসী তো অনেক জানে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। তার কাছে ভাল করে জেনে তবে কাল আর এক বাড়ীর কাজে যাবে সীতা।

আপন এলাকায় ফিরে এসে দেখল লালু তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ওকে দেখা মাত্রই বলল, কি কোথায় গিয়েছিলে? তুমার জন্যে কতো টাইম খাড়া আছি।

ছোকরার বয়েস যে কম তা ওর বিপুল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও বোঝে সীতা, তবু অন্য অনেক ছোকরার চেয়ে একে কিছুটা ভাল মনে হয় বলে কথাবার্তা বলে। জানতে চাইল, আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তুমি বলেছিলে না তোমার ছোকরাকে ধরে দিতে?

সীতা যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল হাতে, মনে হল বুঝি তার মদনের সন্ধান এনেছে লালু, মদনকে পেয়েই গেল ফিরিয়ে। তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, কি হল?

ওকে পাওয়া গেছে। ইখানে আসবে না।

কেন?

সে তুমি গিয়ে পুছে দেখ।

কোথা?

চল তাহলে আমার সাথ।

কোথা?

চল না, যিখানে ছোকরা রাতমে শুবে তুমহাকে লিয়ে যাবে। নিজের আঁখসে দেখে লিবে।

তাকে ধরে লেসলে না কেন?

তুমি নিজে নিয়ে আসবে।

ছেলেকে পাবার সম্ভাবনায় অধীর সীতা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই জিজ্ঞাসা করল, কতদূর যেতে হবে?

সেই ধরমতল্লাকে উধার। জানাল লালু। কোথায় ধর্মতলা আর তার কোন ধারে যেতে হবে কিছুই সীতার বোধের মধ্যে নয় বলে সে আর কোন কৈফিয়ত নেওয়া প্রয়োজন মনে করল না, কেবল জানতে চাইল, সেথা কি মোর ছেলেটা থাকে?

হাঁ। রাস্তমে থাকে।

তুমি দেখেছ?

হাঁ। আমার দোস্তকে দিখাইছি, সে দেখাবে।

সীতা মনে মনে স্থির করল একটিবার ছেলেটাকে পেলে সে যখন বুকের মধ্যে ধরবে তখন আর সে কিছুতেই ছিটকে পালাবে না। ছেলেমানুষ কার বুদ্ধিতে পড়ে যে চলে গেছে কে জানে। একবারটি ফিরে পেলে আর ছাডবে না সে কিছুতেই, তাই একবাক্যে সে রওনা হল—চল!

ট্রামে চড়িয়েই সীতাকে আনল লালু। এত বছর কলকাতায় আছে এই প্রথম ট্রামে চাপল সীতা, মনে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ যে জাগল না এমন নয়, তবু সভয়ে বলল, ভাড়া লাগবে নে?

ও তোমার ফিকর নাই। পরম ঔদার্যে বলল লালু। সীতার ভালই লাগল। এমন ভাবে সাহায্য করলে কার না ভাল লাগে। হাঁটার পথকষ্ট থেকে তো অন্তত বাঁচা গেল। গাড়ীতে পথ বোঝা যায় না। কতটা এল কে জানে? ডান ধারে কেবলই বাড়ী আর বাঁ ধারে বড় বড় গাছের মাঠ, কি বিশাল মাঠ। এত বড মাঠে ধান লাগায় না কেন কেউ? কত ধান হতে পারে লাগালে! চলতে চলতে তাদের গাডীটা মাঠের মধ্যে এসে পড়ল, শেষে মাঠের এক পাশে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল আর ডান পাশ দিয়ে অনবরত হুস হাস করে ছুটে যাচ্ছে নানারকম রঙের মোটর গাড়ী। কত গাড়া যে চলছে তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। মাঝে মাঝে গায়ের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে দৌড়ে যাচ্ছে অন্য অন্য ট্রামগুলো। এত ট্রামগাড়ী যে আছে তাই বা কে জানতো। সীতা এই নতুন এলাকায় এসে যেন এক নতুন জগৎ দেখছে। ডান দিকের রাস্তাটাই বা কি চওড়া! আর যেন সাপের গায়ের মত চকচক করছে। রাস্তা যে এত চকচকে হতে পারে সে কোনদিন দেখে নি। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে—! তার মদন এই গাড়ী ঘোড়ার জঙ্গল পেরিয়ে এতদূর এসেছে একা! আর কতদূর বা যেতে হবে তাকে খুঁজতে?

একটা মেলার মধ্যে এসে গাড়ীটা থামল। চারিদিকে আলোর কি-

রোশনাই ! লাল নীল সবুজ হলুদ—আলোর যে এত রকম রঙ হয় এই কথাটাই কি সীতা জানত ! সামনে পাশে আকাশ জুড়ে যেন রঙীন আলোর মেলা, কত না তার বাহার। নিচে সমস্ত ভুবন জুড়ে যেন আকাশে যত তারা ততই প্রদীপ জলছে। আর তার চারপাশে কত রকম পসরার বিকিকিনি ! সে অনেককাল আগে একবার সতীমার মেলায় গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল, বহুকাল সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি আর আজকের এই মেলার বাহারের কাছে সেই স্মৃতি যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কিসের মেলা বা আজ ? এটা বা কোন জায়গা ? চারিধারে এত রকম খাবার বিক্রি হচ্ছে এসবই বা কি ? কেমন এগুলোর স্বাদ ? নানা বেশ-এর নানা রকম লোক, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে পুরুষ ঘুরছে। খাচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে, দু একজন পাশ দিয়ে চলে যেতে ভুর ভুর করে সুবাস ছড়িয়ে গেল। মোহিত হল সীতা। আঃ কি বাসনা ! কারও কাছে মনের কথাটা বলতে পারলে তৃপ্তি হত কিন্তু শোনাবে কাকে ? কে আছে ? জীবন এত নিঃসঙ্গ ! এত নিঃসঙ্গতা ভাল লাগে না। এও যেন এক দুর্বিসহ বোঝা। সীতা এই বোঝা অনুভব করে, এমনভাবে উপলব্ধি করে নি কোনদিন। কিছু না পেয়ে লালুকে বলল, কোথা যাব ?

এই কাছেই। এসেই গেলাম—লালু জানাল।

এবং অচিরে এই আলোর বৃত্ত পেরিয়ে সমস্ত রোশনাই পেছনে ফেলে চওড়া একটা পথ পেরিয়ে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল লালুর পেছনে। এখানে নিদারুণ অন্ধকার। অত আলোর একেবারে পাশেই এমন অন্ধকার থাকতে পারে এ যেন সীতার স্বপ্নের অগোচর। তবু স্বপ্নের চেয়ে সত্য এই বাস্তবতার মধ্যে সে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে যেন একটা সাপের পেটের মত অন্ধকার গলির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। টিমটিমে আলোয় সেই অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে আছে। দুপাশের বিশাল সব অট্টালিকা পৃথিবীর সমস্ত পরিসর গ্রাস করবার বাসনা নিয়ে যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শে মগ্ন।

তারই মধ্যে একটা বিরাট অট্টালিকার সদর পেরিয়ে একজনই মাত্র উপস্থিত ব্যক্তিকে লালু প্রশ্ন করল, কা বে আসলো ?

লোকটি একটা পাথরের শিলে নোড়া দিয়ে বিপুল বিক্রমে কি যেন পিষছিল মুখ না তুলে মাথা নাড়ল। লালু সীতাকে বলল, এখনো অসেনি। আমরা বসি আমার দোস্ত ওকে নিয়ে আসবে।

সীতা অবাক হল, হেথা ?

হাঁ। ওকে ইখানে লিয়ে এসে তোমাকে দেখা মিলাবে।

সীতা চারপাশে চেয়ে দেখল বিশাল চওড়া সিঁড়ির ধারে এট্টা একটা ছোট ঘর মাত্র। একটা চারপায়া দড়ির খাটিয়া আছে লালু বলল, বোস।

সীতা কোথায় বসবে ভাবছে, দ্বিধা করছে লালু বলল, হিঁয়া মে বোস্।

এখেনে? না থাক।

তবে চল উ ঘরমে বসবে—বলে সরু একফালি বারান্দা দিয়ে এনে একটা বড় ঘরে দাঁড় করাল যেখানে শুধু চেয়ার আর বড় বড় সব টেবিল পাতা।

সীতা চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এমন ঘর সে কোনদিন দেখে নি। এত চেয়ার টেবিল পাতা কেমন যেন দেখতে লাগছে। ঘরটায় কিছু না থাকলে এত শূন্য লাগত না ফাঁকা চেয়ার টেবিল সাজানো থেকে যেমন লাগছে। সে বুঝতেই পারছে না কিসের ঘর এটা, মদনের সঙ্গে এ ঘরের সম্পর্কটাই বা কি? কিছু বুঝতে না পেরে সে প্রশ্ন করল, মদন কোথা?

লালু তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, হমার একঠো দোস্ত আছে না রামাশঙ্কর ও হি ওকে বোলাতে গেছে। ইখানে লি আসবে।

এখানে?

হাঁ। ওকে ভেটবে তবে না আনবে! আমরা কুথা বসব? ই ভি হমার বুহনাই কে ঘর আছে।

সে আবার কি গো?

ওই যে মানুষটা সরবৎ বানাচ্ছে না ও আমার গাঁওয়ের বহিনকে স্বামী আছে।

গাঁয়ের বোনের স্বামী! এ আবার কেমন সম্পর্ক হল রে বাবা! বোধহয় খুব কাছের কিছু হবে। গাঁওয়ের বোন মানে ওদের ভাষায় আপন বোন হবে। কি ভাষা বাবা ওদের দেশের। কি যে সব কথা বলে সামান্যই বোঝা যায়, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে তো একটা শব্দও বোঝায় না। এতক্ষণে বোঝা গেল যে ওর ভগ্নীপতি লোকটা সরবৎ না কি যেন বলল পিষছিল। সে আবার কি জিনিষ কে জানে।

লালু অকস্মাৎ-ই বলল, তুমি বোস আমি দেখে আসি রামাশঙ্কর আসলো কি না।

যাবার সময় দরজার কাছে কি একটা খুট করে শব্দ করল অমনই মাথার ওপর একসঙ্গে তিন তিনটে পাখা ঘুরতে লাগল। কি হাওয়া! আঃ এমন হাওয়া তো সন্ধেবেলা মাঠের মধ্যেও মেলে না! নাঃ গায়ের থেকে আঁচলখানা খসেই পড়ে যাচ্ছে—সীতা সামলে নিল।

কিন্তু পাখার বাতাসের নতুনত্ব এক সময় পুরানো হ'ল। দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছে বলে মাটিতেই বসে পড়ল সীতা। লালুটা আসছে না কেন? অনেকক্ষণ কেটে গেছে সীতার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কি জানি এ কোথায় এল এখন তো সে ফিরতেও পারবে না, বেরোতেই পারবে না এই বাড়ী

থেকে। অন্ধকারে দরজাটাই চিনতে পারবে না। এ কী বিপদ হ'ল? আজ দিনটাই খারাপ, কার মুখ দেখে যে সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল!

ভয়ে যখন তার হাত পা অবশ হয়ে আসছে সেই সময় হাতে একটা শাল পাতার ঠোঙা নিয়ে লালু ঢুকল। একমুখ হেসে খুবই স্বাভাবিক ভাবে বলল, রামা আসে নি। এক কাম কর তুমি এই রোটি খেয়ে লাও, আমাদের আরও কিছু টাইম তো থাকতে হবে।

খাব নি, সীতা জানাল। তার মন মদনের জন্যে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, খাবার কথা মনেই আসছে না তাই লালু দিতে ভালও লাগল না। লালু তবু বলল, ঠিক আছে তুমি খাও আমি আর একবার ফির খুঁজে আসি।

কখন আসবে?

এখনই আসব। তুমি খেতে খেতে আমি চলে আসব।

কিন্তু মদন কখন আসবে?

আরে বাবা তু বৈঠ আরাম কর উয়ো আয়গা—যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল লালু। সে এমন ভাব দেখাল যে সীতার কেবলই ছেলে ছেলে করা তার ভাল লাগছে না। সীতা একটু ভয় পেয়ে গেল, লালু যা হোক সত্যিই চেষ্টা করছে যাতে মদনকে পাওয়া যায়। গাড়ী করে এতদূরে এনেছে, খাওয়াচ্ছে—তারই অন্যায় হয়েছে, না বাপু তুমি তাড়াতাড়ি দেখে এসো। এতবড় ঘরে আমার ডর লাগতেছে।

সীতাকে নরম করতে পেরেও সে ধমকের সুরেই বলল, লে খা!

সীতার সাহস লুপ্ত হ'ল, শাল পাতার ঠোঙাটা টেনে নিল।

তার খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে এমন সময় লালু আর সেই লোকটা এল তার হাতে একটা বালতি আর ঘটি। সীতা জল আছে ভেবে খুব আশান্বিত হ'ল। শুকনো রুটি আর তরকারী খেতে খেতে গলা শুকিয়ে উঠেছে। এক গ্লাস জল এখন বড়ই জরুরী, লালুকে বলল, একটুকুন জল দিবে?

জোল কুথা পাবে—লে পি, বলেই লালুর সঙ্গের লোকটি হাতের বালতির ভেতর থেকে মাটির গ্লাস ভরা পানীয় তুলে দিল সীতার হাতে। সীতাও গ্লাস হাতে পাওয়া মাত্র চোঁ চোঁ করে পান করে নিল এক চুমুকেই। কিন্তু প্রথম চুমকে জিবে স্বাদ লাগা মাত্রই মনে হল এ তো জল নয়! মিষ্টি এবং এমনই সুস্বাদু যে কোনদিন এমন জল খায় নি। মিষ্টত্বের সঙ্গে সামান্য অম্ল ভাব থাকলেও নির্দ্বিধায় সে পান করে নিল, প্রীতও হ'ল। ওরা দুজনও বালতি থেকে পানীয় ঢেলে নিল একজন ঘটিতে অপরজন অন্য একটা গ্লাসে। লালু প্রথম গ্লাস পানীয় সীতার শূন্য গ্লাসে ঢেলে দিয়ে নিজের জন্যে আবার ভরে নিল।

লালুর সঙ্গী দশাসই লোকটি আপন ঘটির পানীয় এক চুমুক পান করেই বিশাল একটি পরিতৃপ্তির স্বর উচ্চারণ করল, আঃ! সেই শব্দে প্রথমটা সীতা চমকেই উঠল পরক্ষণে আশ্বস্ত হল। অচিরে শুনল লোকটি কাকে যেন বলছে, পী লে বে পীলে, ফাউ ভরকে পী লে!

সীতার যেহেতু স্বাদু লেগেছিল তাই আস্তে আস্তে হাতের গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেলল। লালু বলল, পাত্তা সব বাহার ফেলিয়ে দেও।

কোন বাইরে?

কোনদিকে যে পাতটাতা ফেলতে হবে লালু নিজেও জানে না তাই জানতে চাইল কোথায় ফেলবে?

লালুর সাহায্যে বাইরে পাতাটা ফেলে হাত পা ধুয়ে সীতা যখন ঘরে ফিরে এল তখন তার সমস্ত শরীর কেমন হালকা লাগছে। খুব সামান্য এক আমেজ বহুদুর উঠে যাওয়া ধোঁয়ার মত ক্ষীণ অস্তিত্বের ধরা না ধরা দেওয়ার লুকোচুরি খেলছে যেন তার সঙ্গে। বেশ আবেশ লাগছে তার। এ কি অনুভূতি সে জানে না বোঝে না, কোনদিন এমন তো হয় নি! খারাপ যদিও লাগছে না তবু একবার মনে হ'ল আজ এমনটা কেন হচ্ছে? কোনক্রমে ঘরে এসে বসে পড়ল বটে মনে হচ্ছে না যে সে বসে আছে। ভেতর থেকে কেমন যেন ঘোর ঘোর ভাব আসছে একটা, সেই ভাবে সে মনে হ'ল শূন্যে উঠছে, উড়ছে আবার পড়ছে। ঘুরছে। সে ঘুরছে কিংবা তার চারপাশে জগৎ ঘুরছে সেটা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। তবে তাবৎ ঘোরাঘুরির ছন্দে সে যেন নিত্যই দোল খাচ্ছে। তার একবার ইচ্ছে হ'ল নিজের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করে লালুকে, জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি পেয়ে গেল, কেন পেল সে বুঝল না, হেসে ফেলল। হেসে ফেলল তো হাসতেই লাগল। হাসি অবিরত। হাসি অফুরন্ত। সে নিজেই ভাবল এ কি হাসিরে বাবা থামেই না! এই কথাটা ভাবামাত্র হাসি আবার বেড়ে গেল।

তার ওই দশা দেখে লালুর সঙ্গী একটা অশ্লীল শব্দ বলে রসিকতা করে খপ করে তার হাতটা ধরে একটা হেঁচকা টানে এনে ফেলল নিজের কোলের ওপর ঠিক সেই মুহূর্তে লালু উঠে গিয়ে সুইচটা নিভিয়ে দিতে অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। লোকটির অন্য হাতের পাঞ্জা বাঘের থাবার মত নেমে এল সীতার শরীরের কোমল অংশে। সীতা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সেই আসুরিক বলের কাছে অতি দুর্বল প্রতিপন্ন হল। সীতা অপরের ইচ্ছার কাছে কেবল যে নতি স্বীকার করল তাই নয় তার শরীরও এলিয়ে পড়ল তার এতদিনের বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিকূলতা করেই। তার বিশ্বাস সংস্কার সব একে একে ধসে পড়তে লাগল বিরাট বিস্ফোরণের সময়কার অট্টালিকার ইট চূণ সুরকীর মত।

দীর্ঘদিন ক্ষুধা আর অর্দ্ধভোজনে দুর্বল সীতার শরীরে অমন বলশালী লোককে সফলভাবে বাধা দেবার ক্ষমতা আদৌ ছিল না বলে সেই বলিষ্ঠ দেহের পেষণে সম্পূর্ণ পিষ্ট হয়ে আত্মসমর্পণ করল সে। অতঃপর ভয়ানক এক সুপ্ত ক্ষুধার গুপ্ত জাগরণ তার সমস্ত শরীরকে উন্মুখ করে তুলে তার অবস্থা অবস্থান এবং পরিবেশ দিল ভুলিয়ে। ভবিষ্যৎ বা ভবিতব্য ভাববার ক্ষমতা আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ভাঙ মেশানো সরবতের প্রভাবে, ফলে সত্য হয়ে উঠল তাৎক্ষণিক সুখ, নান্দনিক বিলাস, যা জীবনে কখনই এমন পূর্ণভাবে পায় নি চিরজীর্ণ নিরঞ্জনের কাছে। আর সেই সুখের আবেশে সে তলিয়ে চলল ক্রমাগত নিচে এক অতল জলের আহ্বানে। তার মনে হতে লাগল যে সুখের এক সাগরে সে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে, ডুবে চলেছে। তার শরীর জুড়ে অসহ্য সুখের অনুভূতি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। সে সহ্য করে উঠতে পারছে না। কি আসুরিক শক্তিতেই না পেষণ করছে লোকটা, যেন মর্দন করছে তাকে।

একসময় লোকটি তাকে ছেড়ে দিতেই আর একজন নতুন উত্তম এবং পূর্ণ শক্তিতে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। সীতা এমনিতেই নিস্তেজ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আবার একজন যখন নতুন করে তার শরীরের দখল নিল তার বড় কষ্ট হতে লাগল। সে বিবশ হয়ে পড়ল তো বটেই মনে হল দেহের কোন কোন অংশ ছিঁড়ে যাচ্ছে জ্বলছে। শরীর জুড়ে মত্ত মোষের এমন দাপাদাপি চলছে যে সে আর একমুহূর্ত বাঁচবে না, তার শ্বাসও বন্ধ হয়ে যাবে। কি ভীষণ বিভ্রাট ঘটে চলেছে তার শরীরে—সে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চীৎকার করে তার যন্ত্রণা বোঝাতে চেষ্টা করল. তার কণ্ঠ থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে লাগল আর্তস্বর। অমনি একটা কঠিন হাতের পাঞ্জা মুখের ওপর চেপে বসল, পর-ক্ষণেই একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই কে বা কারা যেন বেঁধে দিল তার মুখ। তার আর্তস্বর নিজের মধ্যেই আটকে রইল। তাতে মনে হতে লাগল যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে, সে শ্বাস নিতেও পারছে না। না: সে আর সহ্যও করতে পারছে না। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এক ঝটকায় উঠে পড়তে চেষ্টা করল বুকের ওপরকার বোঝা ঝেড়ে ফেলে; পারল না। দখলদার শরীরটা বোধহয় একচুলও নড়ল না তার অক্ষম শক্তির পরাক্রমে। ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার। নিজের অস্তিত্বকেই সে দেখতে পাচ্ছে না অন্য কাউকে তো দূরের কথা। কাজেই নেশার আচ্ছন্নতা কেটে গেলেও সে বুঝতে পারছে না যে কে তার শরীরের ওপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। কে তার মুখ বাঁধল? সে খামছে ধরতে চাইল দুর্জনটিকে দুরন্ত করতে, দেখল হাতই উঠছে না। দুখানা হাত যেন প্রচণ্ড ভারি মাটির সঙ্গে আটকে আছে কোন আঠার বাঁধনে! কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশ যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ভাগ্য এই যে দ্বিতীয়ের পর আর তৃতীয় ছিল না ফলে রাত একটু গভীর হতে যখন রেহাই পেল সীতা, তার আর ওঠবার শক্তি নেই। সন্ধেবেলাকার নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে কোমর থেকে জানু পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে আছে। সামান্য নড়তে গিয়ে দেখল শরীরের নিচের অংশ ব্যথায় টনটন করছে। সে নড়তেই পারল না।

কতক্ষণ যে সে শুয়েছিল ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তা অনুমান করতে পারল পারল না। লালু বড় হল ঘরটার শেষ প্রান্তের একটা আলো জ্বেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ডাকছিল, ঘুম ভাঙল তাতেই। কোথায় যে সে শুয়ে আছে চকিতে তা মনে করতে না পেরে আশেপাশে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করল তারপর ভাবতে ভাবতে উঠতে যেতেই শরীরের প্রচণ্ড বেদনা তৎসহ স্থান বিশেষের জলুনি তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। লালুকে স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছে দূরাগত আলোর কিরণে, ভয়ঙ্কর রাগ হল। কি যে করবে বা বলবে ভেবে পেল না, ইচ্ছে হল ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়—সাহস হল না। যে ষণ্ডা লোকটার ঘরে আছে সে চাইলে গলা টিপেই মেরে ফেলবে, আর শক্তি লালু ছোকরার গায়েও কিছু কম নেই। শেষ পর্যন্ত এই লালুই তো তার শরীরের সর্বত্র ব্যথা করে দিয়েছে। কোথাও কোথাও যে জ্বালা করছে সেও এই এই লালুর জন্যেই। তার ক্ষুব্ধ ভাবনার মধ্যে সে শুনল লালু বেশ মোলায়েম স্বরে বলছে, এ মেরে পেয়ারী উঠ, চল। আমরা এখোন যাবে।

ওর কথা শুনে মনের মধ্যে যেন চিড় বিড় করে জ্বলতে লাগল। মনে মনে খিস্তি করে বলল, যা না মায়ের কাছে সোহাগ দেখাগে। যত সব ষাঁড়ের বাচ্চা বেজন্মা।

লে উঠ চল—লালু নরম স্বরেই বলল।

সীতা অনেক কষ্টে উঠে বসল। ছিঁড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। হঠাৎ সে দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। এত বড় মিথ্যাবাদী তাকে মিথ্যে বলে ভুলিয়ে এনে বলাৎকার করল এই অন্যায় তাকে ভয়ানক দগ্ধ করছে অথচ ও কিছুই করতে পারছে না। এই প্রতিকারহীন অসহায়তা তাকে সবিশেষ পীড়িত করতে লাগল। শরীরের যন্ত্রণাতে তার দুঃখ হচ্ছিল কিন্তু মনের যন্ত্রণার ভার কান্না হয়ে গলে পড়তে লাগল। দোষ করল লালু আর তার ঘৃণা হতে লাগল নিজের ওপর। ছি ছি এ কি হল! এমন করে তাকে বলাৎকার কেউ করবে সে ভাবে নি, লালুকে বিশ্বাস করে কাল করল সে। কখনই এমন বিশ্বাস করা উচিত হয় নি। কিন্তু ও যে এমন মিথ্যে কথা বলবে তাই বা বোঝা যাবে কি করে? এখন কি করবে সে? কোথায় যাবে? কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবে নিরঞ্জনের সামনে? পরপুরুষ তাকে ধর্ষণ করবার অর্থ তার সব গেল। কুলে

কালি যাকে বলে শেষ পর্যন্ত তাই দিল সে।

লালুর মনে বিন্দুমাত্র বিকার ছিল না, সে ওর বাহুতে হাত দিয়ে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করা মাত্রই সীতা এক ঝটকায় লালুর হাতটা সরিয়ে দিল। লালু বলল, বেশ আমি চললাম। এরপর যা হবে জানব না। তুমি সামলাবে।

এই কথা শুনে সীতা যেন ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্ক হল আবার কি না জানি হবে। এ বদমাস ছোকরা চলে গেলে আবার যদি অন্য লোক এসে হাজির হয়। বাধ্য হয়ে সে নিঃশব্দে অনেক কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু একেও তো বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, কি বুদ্ধিতে আবার কোথায় নিয়ে গিয়ে কোন বিপদে ফেলবে কে জানে। এতদিন এত বছর গ্রাম ছেড়ে এসে যে সর্বনাশ হয়নি কেউ করতে পারেনি সেই সর্বনাশ তো এই শয়তান করল। এমন করে ক্ষতি তো আর কেউ করেনি! তবে এই যমপুরী থেকে বেরোতে হলে এই ছোঁড়া ছাড়া তো আর উপায়ও নেই। কোথায় এনে যে ঢুকিয়েছে বেরোবার পথও জানা নেই! রাতে কি খাইয়ে যে সর্বনাশটা করল সীতা বুঝে উঠতে পারছে না। মাথাটা দারুণ ভার হয়ে আছে। দুপাশের রগে টনটনে ব্যথা। উঠে দাঁড়িয়েও মনে হচ্ছে না চলতে পারবে।

লালু বলল, চল।

সীতা নিঃশব্দে অনুসরণ করল। বাড়ীটার বাইরে এসে দেখল সন্ধ্যা রাত্রে যে গলিপথে ঘুরে এসেছিল সেই গলি এখন একদম জনশূন্য হয়ে আছে। দু একজন লোক বেঞ্চ পেতে মাঝে মাঝে কোন দোকানের সামনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দুপাক ঘুরে একটু চওড়া পথে যেখানে ফুটপাত আছে বেশ কয়েকজন লোক শুয়ে। সে রাস্তা ধরে কিছুটা আসার পরই হঠাৎ বিশাল চওড়া রাস্তা পেল, তার উল্টো দিকেই বাগান। শুধুই মাঠের মত। কাল রাত্রে বোধহয় এই পথ দিয়েই এসেছিল, অনুমান হল। হঠাৎ দেখল লালু ফুড়ুৎ করে গলির মধ্যে ফিরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পেছন ফিরে গলির দিকে দেখছিল এরই মধ্যে দুজন পুলিশ এসে পেছন থেকে লাঠির খোঁচা মেরে প্রশ্ন করল, কা-বে রাণ্ডী ও চোর কাঁহা ভাগল্?

এরা কি জানতে চাইছে পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও তাকে যে রাঁড় বলে ডাকছে এটা বেশ বুঝল সীতা। আগে হলে ক্ষুব্ধ হত, অসন্তুষ্ট হত, এখন যেন আর হতে পারল না। সত্যিই তো সে রাঁড় হয়ে গেল। আজ রাতে ওরা তাকে তো রাঁড়ই করে দিয়েছে। এটা মনে পড়তেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এমন বাঁধভাঙা কান্না তার বুক ফেটে বেরিয়ে এল যা কোনদিন সে নিজেও দেখে নি। তার আর আছে কি জীবনে? কোন মুখ নিয়ে সে আবার গিয়ে দাঁড়াবে নিরঞ্জনের সামনে? সব খুইয়েও কেবল সতীত্বটুকু

অবশিষ্ট ছিল আজ তারও কিছু রইল না। কিসের জোরে সে টিকে থাকবে?

ওকে অমন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠতে দেখে টহলদার পুলিশ দুজন সন্দিগ্ধ হল। একজন তো হাতের মোটা লাঠি তুলে শাসাল, মারব এক ডাণ্ডা। থাম্।

সীতার কান্না তখন কোনও বাধা মানছে না, কোন ভাবেই আগল দিতে পারছে না সে। বহুদর্শী শান্তিরক্ষকযুগল কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থেকে হাতের মোটা বেতের লাঠির এক বাড়ি বসিয়ে দিল সীতার পাছায়। জীবনে এমন আঘাত এই প্রথম বলে তার চোট বেশি, সে ককিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশটি ধমকে উঠল, চোপ। কি মাল সরিয়েছিস? সঙ্গে কে ছিল?

শরীরে এমনিতেই জমাট ব্যথা তার ওপর পুলিশের ডাণ্ডার আঘাত তাকে কাহিল করে তুলল। সে নিজেকে সামলে যে কথা বলবে তার উপায় ছিল না। আর জবাবই বা কি দেবে? লালু যে চরম অন্যায় করেছে তার জন্যে এবং পুলিশের কাছে তার নামে নালিশ করা উচিত কিন্তু কেমন করে ক'রবে, পুলিশই তো তাকে অযথা মারধোর গালাগালি করছে। সে কি দোষ করেছে যে তাকে এইভাবে গালাগালি মারধোর ক'রছে? কার কাছে বিচার চাইবে সে? ভগবানের রাজত্বে বিচার নেই। কোন বিহিত হয় না। দুর্বলের ওপরই সকলের অত্যাচার চলে নির্বিচারে।

সীতার মন্দভাগ্যের দরুণই হোক বা সময়ের কোন অশুভ সংযোগের জন্যে হোক সেই সময়ে একটা পুলিশ ভ্যান চলতে চলতে ওদের দেখে পাশটায় এসে থমকে দাঁড়াতেই পুলিশ দুজন কায়দা মত সেলাম করে পায়ে বুটের আওয়াজ তুলে গাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুবোধ ছেলের মত। ভেতর থেকে বড় মাপের কোতোয়াল জানতে চাইল, কি কেস?

এর সঙ্গে একটা দাগী ছিল হুজুর। ভাগ গিয়া।

চেনা আসামী?

না হুজুর—একজন জানাল, সঙ্গে সঙ্গে অপরজন বলল, কী হুজুর!

ঠিক আছে একে ভ্যানে তোল, আদেশ এল।

অমনি তার পাছায় হাতের লাঠির খোঁচা দিয়ে শান্তিরক্ষকদের একজন বলে উঠল, চল। উঠ।

সীতা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, আমি কিছু জানিনি বাবু। আমি কিছু করিনি। আমি আমার ছ্যানাটাকে খুঁজতে এসেছিনু।—

তাকে বাকি কথা তো কেউ বলতেই দিল না যতটুকু বলল তাও কারও কানে গেল না। অপর জনে হাতের ডাণ্ডার এক বাড়ি বসিয়ে দিল অন্যভাবে। তাতেই তার শরীর টনটন করে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল সীতা, সে শব্দ

তারই কাছে রইল, অন্যের কানে পৌঁছাল না। যারা তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করল তারা এসব শব্দে গুরুত্ব না দেবার অভ্যেস করেছে অনেক দিনের প্রয়াসে। তারা জেনেছে দুর্জনও আর্তনাদ করে কৌশল হিসেবে অথবা প্রবলতর প্রত্যাঘাতে পড়লে। আর শহরময় এমন অপরাধীরা তো ভাল মানুষীর মুখোশ এঁটেই ঘোরে। কাজেই এদের কান্নায় বিচলিত হলে কাজ চলে না। তাদের দায়িত্ব কঠিন, পালন করতে হলে হৃদয় কঠিন করে নিতে হয়। এসব পাকা বদমায়েসের দল। চোরেদের আগলদার এরা। এদেরকে ধরলেই চোর বেরিয়ে আসবে। অপরাধী মাত্রেরই একজন বা একাধিক নারী সঙ্গী থাকে, এও তেমনই কোন দাগী অপরাধীর সঙ্গিনী।

ভ্যান থেকে নামবার সময় সীতার বুক ফেটে যাচ্ছিল হাসপাতালে স্বামী পড়ে রইল, কোথায় ছেলেটা গেল হারিয়ে। দুটো বদমাস মিলে তার সর্বনাশ করল আবার এই সেপাইরা এনে কোথায় ভরে দিচ্ছে কি বিপদে না পড়তে হবে কে জানে? এ কি বিপদে পড়ল! সে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। কি করে যে এখান থেকে উদ্ধার হবে ভেবেই আকুল হয়ে যাচ্ছে। বাঁচবার জন্যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে গো, আমার স্বামীর কি হবে গো? তাকে যে আমি হাসপাতালে ফেলে রেখে এলাম গো।

তার চিৎকার শুনে পাহারাদার সান্ত্রী ধমকে উঠল, এই চোপ!—সে নিয়ে গিয়ে একটা লোহার দরজা খুলে তার মধ্যে ঠেলে দিল।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গিয়ে সীতা একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল যেখানে সে একা। কত হাতে পায়ে ধরল সিপাই-এর, কত জানাল সে কোন দোষ করেনি, কিন্তু কেবল কটু কথা আর অশালীন নির্মমতা ছাড়া কিছু পেল না। কর্কশ সিপাই তাকে ঘরটির মধ্যে ঠেলে দিয়ে লোহার গরাদ দেওয়া দরজাটা টেনে দিল। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ, ঘন অন্ধকার, দম বন্ধ করা গরম তারই মধ্যে বসে সে অঝোরে কেঁদে চলল।

রাত সামান্যই যা বাকি ছিল ফুরিয়ে গেল ওর চোখের সামনে। দূরে কোথাও আলো ফুটল। কাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। সীতা যে গরাদ ধরে বসে ছিল তার পেছন দিকের অন্ধকার বিশেষ কমল না। তবু অনেক বাধা পেরিয়ে ওর চোখের সামনে এসে আলোর আভাস লাগল। দূরে যে সান্ত্রীটি টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল তার বদলে আর একজন এল। তারপর ধীরে ধীরে পরিবেশ জেগে উঠতে লাগল। তার সামনে দিয়ে লোক চলাচল সুরু হল এবং অনেক পরে এক সময় একজন সিপাই এসে লোহার ফটক খুলে ওকে সামনেই একটা হলঘরে নিয়ে গেল যেখানে সারি সারি টেবিলের সামনে বসে কয়েকজন কি সব লিখছিল। তাদেরই একজনের কাছে ওকে দাঁড় করানো

মাত্রই হাউমাউ করে কেঁদে ও জানাল, আমি কিছু করিনি বাবা। আমার স্বামী হাসপাতালে, ছেলে হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজতে গেছি।

সীতার কথা শুনে লোকটির কেমন সন্দেহ হল, জানতে চাইল, কোথায় তোকে ধরেছে?

জানিনি বাবু।

কোথায় ধরেছে জানিস না মানে?

আমি চিনি নি।

থাকিস কোথায়?

মা কালীর থানে।

কোন মা কালীর থান? ধমকে উঠল লোকটি।

কালীঘাট মায়ের মন্দিরের কাছে। স্বামী হাসপাতালে ভর্তি আছে বাবা। ছেলেটাকে পাচ্ছি না—

তা থাকিস কালীঘাটে তোকে ধরল আমাদের থানা ব্যাপার কি? এত রাতে কেন এদিকে?

এ পুলিশটার কথাবার্তা রুক্ষ বটে তবে একেবারে নির্মম নয়। সীতা মরিয়া হয়ে জানাল, লালু বলে একটা ছোঁড়া আমার ছেলেকে খুঁজে দেবে বলে আমায় নিয়ে গিয়ে আর একটা লোকের সঙ্গে মিলে আমার সব্বোনাশ করলে।

তোর সর্বনাশ কি করলো?—প্রশ্ন করল লোকটি মনে মনে বলল, যার কিছু নেই তার আবার সর্বনাশ! মুখে বলল, নাশ যা হবার তা তো আগেই হয়ে গেছে। কিছু থাকলে কি আর ফুটপাথে থাকে কেউ?

সীতা এ কথার উত্তরে জানাল, আমার শরীরের ওপর দুজন লোক মিলে অত্যাচার করলে বাবু—বলেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল! থানার কর্মীটির বহুদর্শী চোখে সন্দেহ হল কেসটা ভুল বলে। তাই জিজ্ঞাসা করল, যারা ধরেছিল তাদের চিনিস?

একটাকে চিনি বাবু। লালু, আমাদের কাছাকাছিই থাকে, রোজই দেখি। আমাকে বলল, চল তোমার ছেলে কোথা আছে দেখিয়ে দেব, তাই গেনু।

তারপর?

আমাকে রুটি দিলে খেতে। আমার সারাদিন খাবার জোটেনি। রুটি খেয়ে শরীর অবশ হয়ে গেল। লালু ছোঁড়া বলল, বস তোমার ছেলেকে আনছি। ও কোথা চলে গেল আর অন্য কোন একটা লোক আমার ওপর অত্যাচার করল।

অমনি অত্যাচার করল? —খিঁচিয়ে উঠল পুলিশ, একটা লোক একজনের ওপর অত্যাচার করতে পারে? তুইও রাজি ছিলি বল?

ওর শরীরে বাবু অসুরের জোর আমার গলা টিপে ধরলো আমি বিবশ হে
যাচ্ছিলাম। ওর সঙ্গে পারলাম নি।

স্বামী হাসপাতালে আর তুই লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিস—খিঁচিয়ে উঠল
লোকটি, কোন হাসপাতালে আছে তোর স্বামী ? কি হয়েছে ?

একসঙ্গে অভিযোগ এবং এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে থতমত খেয়ে গেল
সীতা, বলল, লাল বাড়ীর বড় হাসপাতালে।

সে আবার কোন চুলোয় ?

এত প্রশ্ন তো কেউ তাকে কোনদিন করে না তাই সীতা আশাবাদী হল
ভাবল লোকটা বুঝি তার কোন বিহিত করবে। জানাল, আমরা যেখেনে থাকি
সেই দিকেই বাবু।

ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ! আচ্ছা যা ওখানে বোস।

আমাকে ছেড়ে দেন গো বাবু আমি কিছু জানি নি—বলেই আবার কাঁদতে
লাগল সীতা।

থানার খাজাঞ্চি বুঝল যে বউটির গ্রাম্যতা এখনও কাটেনি এবং দাগী নয়
কিন্তু যে অফিসার ধরে এনেছে সেই একমাত্র পারে একে ছাড়বার ব্যবস্থা করতে
অথবা বড়বাবু চাইলে পারে। তার কেবল খাতা লেখা এবং নিয়মমত চালান
দেওয়া ছাড়া নিজের কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। তবু নেহাত মায়াবশত উঠে
গিয়ে 'কেস ধরা' অফিসারকে বলল, সার ! এই বউটা মনে হচ্ছে কোন পার্টি
নয়। নেহাৎই ফেঁসে গেছে হারানো ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে। ভিখিরি ক্লাস

অধঃস্তন হলেও সহকর্মী তো বটে, আমদানীর ভাগীদার। তাই খাজাঞ্চির
কথায় গুরুত্ব দিয়ে বলল, দিন তাহলে কোন পেটি কেস। খালাস পায় পাবে

ঠিক আছে স্যার।

খাজাঞ্চি ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে সীতাকে বলল, কাছে পয়সা কড়ি
কিছু আছে ?

না বাবু।

তবে ফাইন দিবি কি করে ? জরিমানা হবে যে।

জরিমানা শুনে সীতা অবাক হল। কিসের জন্য জরিমানা হবে সে বুঝল
না। কি করেছে যাতে জরিমানা দিতে হবে ? সে তো কোন দোষ করেনি
দোষ করলেই না জরিমানা দিতে হয় !

তার ভাবনার সময়টুকুতে খাজাঞ্চিবাবুর কাগজপত্র লেখা হয়ে গেল জানতে
চাইল, নাম বল। কি নাম তোর ?

সীতা।

খসখস করে লিখে খাজাঞ্চি ডাকল, ডিউটি !

একজন সাধারণ পুলিশ এসে দাঁড়াতেই বলল, হাজিরা মে।

অনেকক্ষণ পরে আবার ওকে নিয়ে একটা ভ্যানে তোলা হল এবং সেই ভ্যান চলতে চলতে এসে এক নতুন জনারণ্যের মধ্যে দাঁড়ালে ওকে নামানো হল। সীতার চোখের জল ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে যেমন এক সময় মেঘ যায় ফুরিয়ে তেমনই বন্ধ হয়েছে ওর চোখের জল ঝরা। এখন যেন ওর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সব থমকে থেমে গেছে। যা হয় হোক। যা হবে তা হবে, কি করবে সে? কি ক্ষমতা আছে? কোন প্রতিকার করবার উপায় যখন নেই, ঘটনাকে প্রতিরোধ করবার পথ যখন বন্ধ তখন ভবিতব্য মেনে নেওয়া ছাড়া কি উপায়? এমনই এক নৈরাশ্যময় নীরবতা নিয়ে সীতা তার ভাগ্যের বিধান প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

চারপাশে গাড়ী আর মানুষ গিজ গিজ করছে। যে বিশাল ফটকের মধ্যে দিয়ে তাকে ঢোকালো সেখানে আরও অনেক পুলিশ অনেক লোকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে এনেছে। সীতা ভেবে পেল না এখানে তাদের কি করা হবে। সে যখন এসেছে তার সঙ্গেও ওই থানার অন্য একটা ঘর থেকে এমনই হাত বাঁধা লোক এনেছে বেশ কয়েকজন। একটা অদ্ভুত বিশাল ঘরে নিয়ে ঢোকানো হল যেখানে গা ছম ছম করা নীরবতা এবং ভৌতিক চেহারার মানুষজন। ওরই মধ্যে একজন ধোপদুরস্ত শুকনো চেহারার লোক এসে-ফিস ফিস করে জানতে চাইল, কি কেস?

ফিসফিসানি শব্দটাই কেবল কানে গেল, ঠিক বুঝল না লোকটা কি বলছে। তাকে পাহারা দেওয়া জমাদার কি যেন বলল লোকটিকে। তাতেই সেই লোকটি বলল, সঙ্গে কে লোক আছে? কে ছাড়াবে?

ওর কথাবার্তার ভাবভঙ্গী সীতার আদৌ ভাল লাগছিল না বলে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছিল। তার কিছুই ভাল লাগছে না। মনের মধ্যে এমন এক আতঙ্ক সব সময় ঘুরছে যে মনে হচ্ছে তার অসাক্ষাতে কত অঘটন না ঘটে যাচ্ছে যা তার সমূহ ক্ষতি করে দিচ্ছে। কি যে ক্ষতি হয়ে গেছে সে তার খবরও পাচ্ছে না। লোকটি হঠাৎ তাকেই জিজ্ঞাসা করল, একশো টাকা দিতে পারবে?

একশ টাকা! কথাটা জীবনে কখনও সে শুনেছে বলেই মনে হল না। শোনবার কোন কারণও ছিল না। অত বড় অঙ্কের টাকার কথাই কখনও ওঠেনি তাদের জীবনে। লোকটি ওকে নির্বাক দেখে আরও প্রাঞ্জল করে বলল, তোমার নিজের লোকেরা যদি আমাকে একশ টাকা দেয় তাহলে আমি এখানে তোমার জামিন হতে পারি। তোমার ঠিকানা বল আমি না হয় নিজেই গিয়ে টাকা নিয়ে আসব।

এবারকার কথাগুলো স্পষ্ট করে এবং তাকে বুঝিয়ে বলা বলে সীতা বেশ বুঝতে পারল। কিন্তু একথার উত্তরে কি যে বলবে ভেবে পেল না। কিসের টাকা এবং কেন টাকা তার বোধগম্য নয়। কে বা দেবে। লোকটি ওকে নির্বাক দেখে খোলসা করে বলল, তোমার জামিন না নিলে এরা জেলে পাঠিয়ে দেবে।

জেল কথাটা আগে শোনা ছিল তবে সম্যক ধারণা নেই। আবছা যা শোনা আছে তাতে জানে যে সেখানে ঘানি টানতে হয়। তবে জেলে তো যায় চুরি করলে, সে তো কারও কিছু চুরি করেনি! তবে কেন তার জেল হবে বলছে! বরং তার সঙ্গে যে বেইমানী করে অত্যাচার করল তার তো কিছু হল না! সীতা হতভম্ব হয়ে গেল।

যা হয় হোক সে আর ভাবতে পারছে না।

হঠাৎ মেঘডাকার মত স্বরে কে যেন কি হুংকার দিয়ে উঠতেই চমকে উঠল সারারাত ঘুম না হওয়া সীতা। সে যে ঝিমিয়ে পড়েছিল বুঝল! সচকিত হয়ে দেখল তার বাঁ দিকে বড় আকারের কাঠের ঘেরার পেছনে উঁচু মঞ্চে একজন অন্যরকম মানুষ বসে। একা বসা সেই মানুষটির সামনে কাঠের এপাশে ছাতার মত কালো কোট গায়ে দেওয়া কতগুলো লোক কি বলে যে চেঁচাচ্ছে—তার সমস্ত শব্দ কানে এলেও সে এক বর্ণ বুঝল না। বেশ কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে এই নতুন শব্দগুলোও যখন একঘেয়ে হয়ে গেল তখন সীতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ক্লান্তি আর ঘুমে। তার কানের চারপাশের অবিরাম চেঁচামেচি তার কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না।

কতক্ষণ এভাবে কাটল তার ঠিকানা নেই হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল সিপাইএর এর ডাকে, চল্ চল্।

কোথায় যেতে হবে সীতা না জেনেই সিপাইটার পেছন ধরল পথন্তর নেই বলেই। বাইরে এসে আবার সেই বন্ধ ভ্যান। এবার যে কোথায় যেতে হবে কোন অনুমানই আর সে করতে পারছে না। তাই না ভেবেই সে বসে রইল। সব দিক বন্ধ বলে গাড়ির ভেতর বসে তার পক্ষে বোঝা সম্ভবও ছিল না কোথায় যাচ্ছে, বা কোন পথে চলেছে এই গাড়ি। সে যেন চলেছে তার ভবিষ্যতের দিকে।

একসময় গাড়ি থামল। সঙ্গের পুলিশ তাকে নামাল। সে দেখল একটা ঘেরার মধ্যে তারা ঢুকেছে। সামনেই লোহার গরাদের এক বিশাল ফটক। সেই ফটক খুলতেই তার মধ্যে ঢুকে পড়তে হল। কে যেন তার মনের মধ্যে বলল যে এটাই জেলখানা। বোঝা মাত্র সে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল, তোমার পায়ে ধরি সেপাই বাবা আমায় হেথা দিয়ো না।

পুলিশটি অনেক আসামী দেখেছে এমন নির্বোধ দেখেনি, সে বিব্রত বোধ

করে এক ধমক দিল। তার কি করবার আছে, সে তো হুকুমদাস মাত্র। হাকিম যেমন হুকুম করবে তাকে মানতে হবে। এ কোথাকার বোকা!

পাকা আসামী যে নয় এর কথাবার্তা আর ব্যবহারেই তা স্পষ্ট। এর গ্রাম্য ভাবই তো যায়নি! অযথা এদের ধরে চালান দেবার কোন অর্থ হয়!

জেলের মধ্যে যে ব্যক্তি নাম ধাম লিখছে অন্য সব পুলিসদের কাছে আরও আসামীদের বুঝে নিচ্ছে তারই কাছে সীতা আবেদন করল, আমি কিছু জানি না বাবু। কোন ঘাট করিনি।

লোকটি যে সে কথা শুনতে পেল তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে তা বোঝা গেল না। অল্পক্ষণ বাদেই জানতে চাইল, কি নাম? সীতা মণ্ডল?

হঠাৎ যেন আশার আলো দেখল, হাঁ বাবু।

আদালত থেকে আসা কাগজপত্র দেখছিল লোকটি, অভিব্যক্তিহীন মুখে বলল, দু দিনের জেল। পরশু ছাড়া পাবে।

জেল শব্দটাই ভীতিপ্রদ। আতংকিত হয়ে সীতা কেবল কাঁদতেই লাগল। তার সঙ্গে অন্যান্য গাড়াতে যেসব আসামী এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, মাগী কাঁদছে। আমাদের ওয়ার্ডে দিয়ে দিন স্যার।

দাগী আসামীর মন্তব্য শুনেও না শোনা রইল জেলকর্মী। এই সব নিয়েই তো প্রতিদিনকার কাজ অত কান করলে চলে না। জেনানা ফটকে সীতাকে পাঠিয়ে দিল একজন ওয়ার্ডার দিয়ে।

ভেতরে পৌছাতে পৌছাতে অনন্যোপায় সীতার চোখের জল শুকিয়ে কাল গালের ওপর অস্পষ্ট দাগ রেখে গেছে। সেখানে তার জন্যে যে অপেক্ষা করছে এত বিস্ময় সে জানত না। দেখল একই রকম শাড়ী পরা নানা বয়সের অনেক মেয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সে দেখে আরও অবাক হল সবাই তারই মত নয়, অনেক সুন্দরী মেয়েও আছে, এমনও অনেক আছে যাদের দেখলে ভদ্রলোকেদের মেয়ে বলেই মনে হয়। সীতা বুঝতে পারছে না এরা কারা! কয়েদী নিশ্চয় হবে না! এমন সুন্দরপারা মানুষরা কি কয়েদী হতে পারে? তবে?

ওরই মধ্যে একজন এসে তাকে দুম করে প্রশ্ন করে বলল, মেয়াদী না মামলা চলছে?

অন্য একজন মহিলা তার পেছন পেছন আসছিল, জানাল, পেটি।

শোনামাত্রই প্রশ্নকর্ত্রী যেন ঘুরে গেল অবজ্ঞায়।

যে মেয়েটি জবাব দিচ্ছিল সেই সহানুভূতির সঙ্গে বলল, দুটো তো দিন, চোখের পলকেই কেটে যাবে।

মেয়েগুলো যে যার নিজের মত চলে গেল। কেউ তাকে বিশেষ আমলই দিল না। এরপর যে কি করতে হবে সে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একদিন বাদেই ভোরবেলা তাকে ডেকে পাঠান হল জেলগেট এর অফিসে। সেখানে খাজাঞ্চি জানাল, তুমি ছাড়া পেয়ে গেছ। এই খাতায় এখানে টিপসই দাও। —লোকটি নিজেই ওর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ধরে একটা কালির ওপর ঘষে নিয়ে ছাপ দিয়ে নিল কাগজের পাতায়। তারপর একজন শান্ত্রী ওকে গেট পর্যন্ত পার করে দিল। গেটের বাইরে অপেক্ষমান অনেক মানুষ ওর মুখের দিকে চাইল, ও-ও দেখল অনেকেরই মুখ, তার মধ্যে পরিচিত একটিও ছিল না। মাত্র ছুটো দিনের ব্যবধানেই পৃথিবীটা যেন তার অচেনা মনে হতে লাগল! ও কি তবে এই বিশ্বের বাইরে ছিল? পেছন দিকে চেয়ে দেখল সীতা। জেলখানার বিশাল ফটকটা বন্ধ। নিজেরই বিস্ময় জাগল এই ফটকের মধ্যে থেকেই কি ও বেরিয়ে এল একটু আগে? এখন যেন বিশ্বাসই হয় না। মনে হয় এই সচল চঞ্চল পৃথিবীর বাইরে ছিল সে কিছুক্ষণ আগে। যেখানে ছিল সেটা এই পৃথিবীর নয়, এর মধ্যেও নয়। সে এক অন্য জগত, অন্য গ্রহও হতে পারে।

কিন্তু এখন কোথায় যাবে সে, কোনদিকে? এ জায়গাটাই বা কোথায় কে জানে? কেমন ফাঁকা গাছগাছালিতে ছায়াময়—তাদের গ্রামের চেয়ে ভাল। গ্রামে তো এত বিশাল গাছ নেই। এখানে পথ ময় কি বিশাল সব গাছ! কিসের গাছ কে জানে? জানার প্রয়োজনও মনে হল না সীতার। সে জানতে চায় এখন কোন দিকে যাবে। কোনখানে তাদের আশ্রয়স্থল আস্তানা! চারপাশে দেয়াল নেই, মাথার ওপর ছাউনি নেই, নিজের একটুকরো নির্দিষ্ট জমি পর্যন্ত নয়। না হোক, তবু যেখানে রাতে থাকে, দিনে তার ভাঙা টিন, ফুটো কৌটো ছেঁড়া ন্যাকড়া জড করা থাকে কোন বাড়ির দেয়ালের কোন ঘেঁষে, সেই তো আস্তানা। সেখানেই ফিরতে চায়, পৌছোতে চায় তার সেই সুনির্দিষ্ট স্বর্গে।

কোনদিক দিয়ে যাবে? পৃথিবীতে অনেক মানুষ, অনেক বিচিত্রতা। তার চারপাশে চলমান এবং অপেক্ষমানদের মধ্যে একজনের চোখে দয়ালুতা দেখে সীতা জানতে চাইল, কালীঘাটে কোন দিকে যাব বাবু, কতদূর?

লোকটির চোখে তার মনের প্রকাশ ছিল বলেই তিনি জবাব দিলেন, এই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলে যাও।

এ এক বিচিত্র রাস্তা, পায়ে হাঁটা মানুষ নেই বললেই যেন ঠিক হয়। অথচ গাড়ী চলছে যেন প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা করে। গায়ের পাশ দিয়ে এত জোরে গাড়ীগুলো সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে যে ভয় করছে প্রতি নিমেষেই। এদিক সেদিক বেঁকে চলতে চলতে একটা বিরাট বাড়ীর সামনে এসে যা মানুষ দেখল। বাড়ীটার সামনেও যেমন ভিড় তেমনই মানুষের ঢোকা বেরোনো। যেন কামাই নেই। বাড়ীটা পার হয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে একটা তেরাস্তার

মোড় পড়ল। এখানেও তার গুলিয়ে যাওয়াটা কিছু কমল না। বাধ্য হয়ে সে একজন দরিদ্র গোছের লোক দেখে জানতে চাইল, এ বাবা! কালীঘাট যাব কোনদিকে?

লোকটি দিক দেখিয়ে দিতে সীতা আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হল কোথায় যাচ্ছে সে? কার কাছে? কে আছে? আবার কোথায় কার কাছে যাবে? কোন মুখে সে নিরঞ্জনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? তার সতীত্বই যখন কেড়ে নিয়েছে তখন আর আছে কি? নিরঞ্জন যখন জানতে চাইবে এতদিন কোথায় ছিলি সে কি জবাব দেবে? কি তার বলবার আছে। কোনমুখে সে কথা বলবে স্বামীর সঙ্গে? মদনকে সে আর কোনদিনই ফিরে পাবে না।

নতুন করে একবার মনটা হাহাকার করে উঠল ছেলের কথা মনে হতে। ওকে ফিরে পেলে স্বামীকে নিয়ে দেশে ফিরে যেত সীতা, সেখানে জনমজুরী করে যেভাবে হোক বেঁচে থাকত এই পাপের দেশে আর কিছুতেই থাকত না। কালীঘাট! লোকে বলে মা কালীর থান! যত চোর গুণ্ডা বদমাসে ভরা। এর মধ্যে কি মানুষ বাস করে?

তবু আর কোথাও কোন গতি নেই বলেই সীতা শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে ফিরে এল। তার নজরে পড়ল যেখানটায় সে শোয় একটা অল্পবয়সী মেয়ে সঙ্গে একটা বছর ছয়েকের মেয়ে আর একটা শিশুকে নিয়ে বসে আছে। এরা আবার কারা? দেখা মাত্র মাথা গরম হয়ে গেল সীতার। কোত্থেকে এসে জুটল? আপন অধিকার বোধ সজাগ হয়ে উঠতেই ধমকে উঠল, কে গা তুমি? এখেনে কেন? ওঠ ওঠ!

তার গলার স্বর শুনে মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। একই রকম নিঃশব্দে সামনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে বসে রইল। বড় শিশুটি ভয় পেয়ে মায়ের দিকে চেয়ে ডাকতে লাগল, এমা! বকচে যে! মা! ওমা! বকচে।

ওর মা তবু সাড়া দিচ্ছে না দেখে শেষে গায়ে হাত দিয়ে অল্প অল্প ঠেলা দিতে লাগল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। কোলের শিশুটি বোধহয় এর আগেও কাঁদছিল সে নতুন করে কান্না জুড়ে দিল। অবশেষে বিরক্ত বোধ করেই দাঁড়াল মেয়েটা, কারও দিকে তাকাল না আপন মনেই হাঁটতে শুরু করল। বড় শিশুটি মার পেছন পেছন চলতে লাগল। অল্পে ঝামেলা মিটতে সীতা যেন বাঁচল। তবু একবার চেয়ে দেখল মেয়েটি একটা কাঠের পুতুলের মত ভাবলেশহীন ভাবে হেঁটে চলেছে। এমন নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব দেখে সে বেশ অবাক হল, শিশু-দুটির প্রতি সহানুভূতিতে মনে মনে বলল, কি মানুষ রে বাবা! বাচ্চাটা যে এত কাঁদছে একটা কথা বলছে না! —মা-টার ওপর রাগই হল সীতার। কারও

ছেলে কাঁদলে সীতার বড় রাগ হয়, ছোট ছেলের কান্না তার বুকের মধ্যে বাজে।' এখন আর তেমন বাজল না। যেমন অনুভূতি স্বাভাবিক তার একাংশও হল না; ভাবনাহীন মনে সে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

ভাসমান খড়কুটোরও অতীত একটা থাকে। সে যখন নদীর বানের জলে ভাসতে থাকে তখন সেই অতীত মুছে যায়, হারিয়ে যায় তার শিকড়ের ঠিকানা। কোন মাঠে বা কোন জমিটায় তার জন্ম ব্যাপ্তি বা অবস্থিতি ছিল সব ভুল হয়ে যায়। সে শুধু ভাসে। গন্তব্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, শ্রান্তিহীন ভেসে চলা, শুধু ভেসে চলা; কখনো স্রোতের টানে কখনো বা বাতাসের ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউ এর আঘাতে। দিন রাত কেবল জলে জলে জলে, কেবলই চলে বেড়ানো। ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে অমনই চলে বেড়ায় মেয়েটি, সঙ্গে তার বড় মেয়েটিও থাকে যাকে ছেলে কি মেয়ে বোঝা যায় না তার শৈশব অবস্থার জন্যে। দুটি শিশুর অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ আর গায়ে বেমাপের ছেঁড়া পোষাক দেখে অসহায়তা অনুমান করা যায়। উদাসীন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় ওরাও ভেসে বেড়ায়, পথে প্রান্তরে শহর কলকাতার জনারণ্যে। মা কারও সঙ্গে কথা বলে না শিশুরাও বলে না। ক্ষিধে পেলে কেবল কাঁদে।

সীতার তাড়া খেয়ে মা মেয়ে কিছুটা সরে গেল। ঘুরে ঘুরে পা দুটো টন টন করছিল বলে একটু বসেছিল তাও যখন লোকে বসতে দিল না বাধ্য হয়েই আবার হাঁটা সুরু ক'রতে হল। এরই মধ্যে কোলের মেয়েটা ক্ষিধের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে, অনেকক্ষণ ধরেই করে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে পড়ল ওদের মা। সমানে ঘ্যানঘ্যানানি আর সহ্য হচ্ছে না। কি বা খেতে দেবে? কি আছে? অথচ অবুঝ মেয়ে কিছুতেই থামছে না দেখে এক চড় কষিয়ে দিল কোলের শিশুকে। তাতে শিশু ভ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ স্বর বদলানোতে বড়টি ওপর দিকে চেয়ে ভীত হয়ে পড়ল। ক্ষিধে তারও লেগেছে দুচারবার খুন খুন করেছে কিন্তু মার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেছে। এবার বোন আচমকা কেঁদে ওঠায় তারও মনে বড় লাগল, কেন যে কাঁদে—না কাঁদলেই তো মা আর মারে না। মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় তার, কষ্টের চেয়ে দুঃখ অনেক ভারী। তার ছোট শরীর কষ্ট বয়, মন দুঃখ সইতে পারে না। বোনটা মায়ের মার খেয়ে আরও বেশি কেঁদে চলেছে, ওর বড় ভয় করে এই না মা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যেমন একদিন দিয়েছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিলে বড় লাগে, অনেক আগে একদিন ওর বাবা ওকেই ফেলেছিল। মার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে মাকে দু ঘা মেরে ওর বাহু ধরে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের বাইরে। তখন বড্ড লেগেছিল। ওর জন্যে অবশ্য ওর মা-ও খুব কেঁদেছিল।

সেদিন। ও কিন্তু বোনের জন্যে কাঁদেনি, ওর সাহস হয়নি; মার মুখের দিকে তাকিয়ে সরে গিয়েছিল সভয়ে। আজও বোনের জন্যে ভয় করতে লাগল।

এতবড পৃথিবীতে কোথাও যে একটু সহানুভূতি নেই এই সত্য বুঝতে বুঝতেই উদাসী একদিন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। স্বামী নামের জন্তুটা তাকে একটা ক্রীতদাসী কিনেছে বলে ভাবত। যখন তখন সামান্য কারণে অকারণে ওকে লাথি, কিল, চড় বসিয়ে দিত। রাতের অন্ধকার ঘন হলে তো আর কথাই নেই নেশা করে এসে অযথাই চড়াও হত বউ-এর ওপর। একার সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না যে প্রতিরোধ করে, ফলে সমস্ত অত্যাচার নীরবেই সহ্য করতে হত। মাঝে মাঝে যখন অত্যাচার সমস্ত কদর্যতার সীমানা ছাড়াত, শরীর সইতে পারত না কোনমতেই, তখনই কেবল ওর ভেতর থেকে আর্তনাদ ফুটে বেরোত, শুনত প্রতিবেশীজন। তাতে সেই পাষণ্ড গলা টিপে ধরে বন্ধ করতে চাইত শব্দের উৎস, নিজেকে সম্বরণ করে শব্দ থামাত না।

নিজের বাবা ছিল চিররুগ্ন অসহায়। মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কি যেন এক অসুখে, ছোট বোন একটা ছিল সে-ই কোনক্রমে ধরে রেখেছিল নিঃস্ব সংসারের কাঠামোটা। সব মিলিয়ে ওর অসহায়তার আর সীমা ছিল না বলেই অমন পীড়নের মধ্যেও তাকে সেই দুরাচারের ঘর করতে হত শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যেই। বিকল্প ছিল না। তাও এক একবার দুদিন তিন দিন ঘরেই ফিরত না লোকটা, যখন ফিরত তখন পকেট শূন্য। অমন যে সংসার সব সময়েই শূন্য থাকবার কথা সেই সংসারে এসে দেড় দিন কি দুদিন উপবাসী স্ত্রীর কাছে করত সে খাবার বায়না। খাবার যোগানোর স্বাভাবিক অসম্ভবতার কথা বিবেচনা মাত্র না করে কদর্য সব শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পীডন শুরু হয়ে যেত নিবীর্য বিক্রমে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সন্তান ধারণ করতে হয়েছিল ওকে তিন বার। বডটি বেঁচে আছে ওর প্রথম যৌবনের রক্তের জোরে, মধ্যেরটি অসুস্থ এবং আহত অবস্থায় জন্মে কদিন ভুগিয়ে গেছে মারা, তৃতীয়টি আপন দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে শীর্ণ দেহেও বেঁচে আছে নিজের এবং মায়ের দুঃখ পূর্ণ করতে। আর এটিও যেহেতু কন্যা সন্তান জন্মেছে সেই অপরাধেই গর্ভধারিনীর দণ্ডের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে নবতর কারণে এবং অবশেষে একদিন সকন্যা নির্বাসন। সেই ক্লীবটি নির্বাসন দেয়নি, নিজেই নিয়েছে, বলে গেছে—রাস্তায় মরবার জন্যে তোদের ফেলে যাচ্ছি। এবং সেই মহাপুরুষের বাক্‌সিদ্ধির প্রমাণে পথে পথেই ঘুরছে উদাসী দুটি অসহায় নিরপরাধ শিশু সন্তানকে সঙ্গে করে।

আজকাল ও আর কিছু ভাবতে পারে না, কোন ব্যাপারেই নয়। যা দেখে সব চোখ দিয়েই দেখে, মন দিয়ে নয়। সেই দেখে যাবার ভেতরে আর কিছু

থাকে না, নীরবে কেবল দেখে যাওয়া, অর্থহীন, তাৎপর্যহীন, অভিব্যক্তিহীন চোখ বুলিয়ে যাওয়া শুধু। ঘর, বাড়ি, মানুষ, গরু, গাড়ি সবই একাকার তার চোখে। সবই চোখে পড়ে তবে সে কেবলই আয়নার ওপর ছায়া পড়বার মত, ছায়াপাত যেমন কোন রেখাপাত ঘটায় না, ওর চোখে পড়াও তেমনই। অসীম জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে ওর নিরন্তর চলাচল কিন্তু কাউকেই যেন ওর চোখে পড়ে না, পেটের মধ্যে ক্ষিধের জ্বালা যখন তীব্র হয় যে কোন খাবার দোকানের সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়, প্রায় সব বারই প্রত্যাখ্যাত হয়। বেশির ভাগ দোকানদারই বলে, ভাগ ভাগ পাগলী। দৈবাৎ দু একজন অনুভব করে পাগলীরও ক্ষুধা থাকে, প্রাণ বলে যে শক্তি তা ওরও আছে। সে হয়ত সামান্য একটুচি খাবার দেয় তাতে নিবৃত্তির নাম মাত্র হয় না, কেবল পেল এই সন্তোষ হয় মাত্র।

প্রাণ থাকলে তাকে ঘিরে একটা শরীরও থাকে আর শরীরের নিয়মিত রসদ জোগাতে হয়। ওর তা জোটে না বলেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কিছু ক্ষয় হয় এবং ও নিয়মিত জীর্ণ হয়। মাঝে মাঝে কষ্ট হলে মেয়ে দুটোকে মাটিতে বসিয়ে ও গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আরও বেশী কষ্ট হলে যখন চারপাশে নিঃসীম শূন্যতার সন্ধান পায় তখন কাঁদতে থাকে। সীতার তাড়া খাবার আগেই ও ক্ষুধা এবং শারীরিক ক্লেশে বিপর্যস্ত ছিল। মেয়েদুটোর কান্নাও সহ্য হচ্ছিল না কিন্তু করবেই বা কি? কোথায় পাবে খাবার? সবাই পাগলী বলে দূরছেই করে, অন্যান্য ভিখারীরা পর্যন্ত একটু সাহায্য করে না, সে কোথাও পংক্তি ভোজনে বসে পড়লে 'দরিদ্রনারায়ণেরাই' ওকে তাড়িয়ে দেয়। সীতার তাড়ায় সমস্ত দুঃখ যেন একসঙ্গে উথলে উঠল। তবে সে কোথায় যাবে, কি করবে? কি খেতে দেবে মেয়ে দুটোকে? মনে হল চারপাশেই বন্ধ। সে ওই বন্ধ পরিসরে বন্দী। কোন উপায়স্ত না পেয়ে ও হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

মাকে এমন আচমকা কেঁদে ফেলতে দেখে হতভম্ব হয়ে বড় মেয়েটি ওর মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। মা মাঝে মাঝে কাঁদে কিন্তু আজকের মত এমন জোরে কাঁদে না। চুপচাপ কাঁদে, আপন মনে কাঁদতে থাকে কারও দিকে নজর করে না, কাউকে শুনতেও দেয়না ওর কান্নার শব্দ। আর আজ কাঁদছে যেন প্রবল উচ্ছ্বাসে। তার ছোট্ট মনে পরিবর্তন ধরা পড়ল, বুদ্ধিতে সে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পেল না।

বড় মেয়েটি মার কান্না দেখে হতবাক হয়ে থেমে থাকলেও ছোটটি সেই অবস্থায় তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। কান্না বেদনার প্রকাশ হতে পারে সমস্যার সমাধান নয়, কোন সমাধানের আশা করে ও তা করেও নি কারণ শিশুর কান্না তার প্রতিবিধান প্রার্থনার ভাষা হতে পারে, মানসিক অসুস্থের তা নয়। কাজেই

সে মাথা নিচু করে আপন বেদনার বেগেই কেঁদে চলল। তাতে পথ চলতি দুচার জন মানুষ অবশ্যই আকৃষ্ট হল তবে বেশীর ভাগ লোক ব্যস্ত ভাবে চলে গেল তাদের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই। দুচার জন হৃদয়বান মানুষই কেবল কৌতূহল প্রকাশ করল ওদের জন্যে। কিন্তু কে জবাব দেবে তাদের কৌতূহলের যে দিতে পারে সে তো ভাষাহীন, বড় শিশুটি প্রশ্নকারী সকলের মুখের দিকে কেবল বেদনার্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে ভাবলেশহীন ভাবে চেয়ে থাকে। সেও তো তার মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের সঙ্গে থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর জানে না। মানুষের প্রশ্ন যে ঠিকমত বোঝে এমনও নয়। কাজেই নিরুত্তর তাদের সামনে দয়ালু দুচারজন লোক আপন বুদ্ধিতে দুচারটে পয়সা ফেলে ফেলে চলে যেতে লাগল। তাদের সামনে কিছু কৌতূহলী মানুষের জটলাও গড়ে উঠল যাদের কাজ কর্মের চাপ নেই। সেই জটলার মধ্যে থেকে একজন সহৃদয় যুবক জানতে চাইল, কি হয়েছে খুকি?

উত্তর না পেয়ে সে মেয়েটির মলিন ধূলোয় ধূসর মাথায় হাত রাখল সস্নেহে। তবু শিশুটির কাছে কোন জবাব না পেয়ে সে ওদের প্রকৃত অবস্থা আর অসহায়তার পরিমাপ করে ব্যথিত হল। ক্ষুব্ধ স্বরে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওদের জন্যে সরকারী ব্যবস্থা আছে, এদের আশ্রয়ের জন্যে আশ্রম আছে, পুলিশের ওপর দায়িত্ব আছে এদের ধরে সেখানে পাঠানোর। কিন্তু কে কার কর্তব্য পালন করছে বলুন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, মা-টা তো পাগল। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দেখি।

সেই জন্যেই তো এদের আরও সরকারী সাহায্য প্রয়োজন যাতে শিশুগুলো বাঁচে, কষ্ট না পায়। তাছাড়া পাগলেরও তো চিকিৎসা আছে, তার জন্যেও তো সরকারী মানসিক হাসপাতাল আছে।

একজন বয়স্ক মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, আছে তো সবই কিন্তু করছে কে?

যুবকটি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল, তার ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় কি করবে ভেবে পেল না, কোথায় এদের সরকারী আশ্রয়স্থল তার জানা নেই বলে এই সময় সে-ও নিজেকে খুব অসহায় বোধ করল। কিন্তু এই মুহূর্তে এই শিশুগুলো এবং অসহায় মহিলাটিকে সাহায্য করা যে বিশেষ প্রয়োজন একথা তার কেবলই মনে হতে লাগল। তাই কোন কিছু না পেয়ে নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখল সম্বল যা কিছু আছে তা দিয়ে সে কেবল যাতায়াতের গাড়ি ভাড়াই দিতে পারে তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত। তবু সে একটু খতিয়ে হিসেব করে দেখতে লাগল কিছু বাঁচে কিনা। অবশেষে কোনক্রমে একটা ছোট পাউরুটির দাম বাঁচাতে পারল

পারো পড়িবেন না।

এবং সেটা কিনে এনে মেয়েটির হাতে দিতে পেরে যেন বিরাট এক মানসিক চাপ থেকে বাঁচল।

যে বয়স্ক মানুষটি একটু আগেই কিছু একটা মন্তব্য করেছিলেন এবার বললেন, এত বড় শহর কলকাতা এত লোকের আশ্রয় তবু নিরাশ্রয় কত লোক এখানে শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই মরছে দেখুন। আমরা কিছু করতে পারছি না, আমরাও কত অসহায়।

পথিক যুবক মনে মনে থমকে দাঁড়াল। বড় মূল্যবান কথা বলেছেন ভদ্রলোক। সত্যিই তো অসহায় সে নিজেও। কি করতে পারছে সে? সামান্য একটা কাজের জন্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান তো হচ্ছেই পরন্তু এই অসহায়দের যে সাহায্য করবে তাও পারছে না। অথচ আশ্চর্য এই যে এদের সাহায্য করবার সমস্ত ব্যবস্থা দেশে আছে। আসলে যাদের ওপর দায়িত্ব তাদের মানবতা বোধ নেই। সামান্য মানবতা বোধ না থাকলে এই কাজের জন্যে কেউই যোগ্য হতে পারে না, যুবক ভাবল এবং ভাবতে ভাবতেই আপন পথে চলে গেল বাস্তুপ্রত্যোলী অনাথার দুঃখ বেদনা অসহায়তা এবং কান্না পেছনে ফেলে রেখে। সবাই যায়। যে যার নিজের সমস্যার পেছনেই ছোটে। অন্যের বেদনার শরিক হতে পারবার ক্ষমতা কজনেরই বা থাকে? সুযোগই বা কোথায়?

বড় মেয়েটি মায়ের দিকে অনুমতির জন্যে নীরব প্রার্থনার মত করুণ চোখে চেয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েছিল তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাউরুটির টুকরোটি। যুবকটি চলে যেতেই মার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, মা।

ওর মা তখনও আপন মনেই কেঁদে চলেছে। কোন ভ্রুক্ষেপই করল না। মেয়েটির পেটে ক্ষুধা জ্বলছে তবু সে না খেয়ে আবার ডাকল, মা! কোনই উত্তর না পেয়ে অবশেষে একটা অংশ ছিঁড়ে বোনের দিকে এগিয়ে ধরল। বোনকে দিয়ে এককুচি ছিঁড়ে নিজের মুখেও দিল। বড় অংশ রেখে দিল বাঁ হাতে, মার জন্যে। ভক্তি বা প্রীতি নয়, ভয়, যে মাকে না দিলে মা যদি মেরে তাড়িয়ে দেয় তো কোথায় যাবে। কার কাছে থাকবে? ভক্তি ওই শিশু কোথায় পাবে? ভক্তি তো অনুশীলিত শিক্ষার ফসল। প্রীতি স্বভাবজ কিন্তু ক্ষুধার আগুনে পুড়তে পুড়তে তার আর অস্তিত্বই খুঁজে পাবার কথা নয় তার মত মাণবকের মনে। শুধু আছে ভয়। সেটুকু তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ক্ষুধা যেহেতু কোন বাধা মানে না তাই একটু একটু করে হাতের পাউরুটি খেয়ে নিচ্ছিল মেয়েটি। হঠাৎ ওর মার নজর পড়ল মেয়ের হাতের দিকে। চারিদিকের ঘটনা ছাড়াও জঠরের জ্বালাও তাকে জ্বালাচ্ছে; এ আমাকে না দিয়ে খাচ্ছে! ভেবেই সে আচমকা একটা চড় মেরে বসল মেয়েটিকে। হাতের

অবশিষ্ট রুটিটুকু যা ওরই জন্যে ধরা ছিল কেড়ে নিল। নিজের অপরাধ বুঝল না, দোষ জানল না আকস্মিক মারটা তার যে যন্ত্রণার উৎপত্তি করল তাতেই সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতেই লাগল। ভয়ে শব্দ করতেও পারল না তাহলে মা হয়ত আবার মারবে।

এরই নাম জীবন। এর নাম বেঁচে থাকা। কারণ বেঁচে থাকার যেটা বিকল্প জন্মানোর মতই সেটাও কারও আয়ত্তাধীন নয়, আর সেই বিকল্পের কথা অসহায়তায় পাগল হয়ে যাওয়া মা অথবা অবোধ শিশুরা কেউই জানে না।

অনেক ভয়ে ভয়েই সীতা হাসপাতাল পৌছাল। কেমন একটা আতঙ্ক তার মনের মধ্যে চেপে বসে ছিল। লালুরা তাকে ধর্ষণ করেছে তাতে তার যে কোন দোষ নেই এই কথাটা কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, তার মনে চিরন্তন কুসংস্কার কাজ করছিল সে অসতী হয়ে গেছে, কি করে সোয়ামীর কাছে মুখ দেখাবে। তাছাড়া এই ক'দিন সে যে দেখতে আসেনি তারই বা কি কৈফিয়ত দেবে; সে কৈফিয়ত কি চাইবে নিরঞ্জন? ইদানীং তো কথাবার্তা বিশেষ বলে না, কদিন ধরে যা দেখছে তাতে বেশ চুপচাপই থাকে, পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করলে একটার হয়ত জবাব দেয়, সে জবাবও তেমন জোরে নয় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুনতে হয়। সীতা যতক্ষণ থাকে দেখেছে কেমন ঘুম ঘুম ভাব নিরঞ্জনের। কতবার জানতে চেয়েছে ঘুম আসছে কিনা, জবাব পায় নি।

যতই জবাব না দিক যতই কম কথা বলুক না সীতার কেমন ভয় ভয় করছে হাজার হলেও পুরুষ মানুষের চোখ তো! যদি বুঝে ফেলে যে সে খারাপ হয়েছে! তেমন কি কোন চিহ্ন হয়েছে তার গায়ে? কোথাও কোন দাগ? লালুটা তার বুকে খামচে দিয়েছিল বটে তবে নখের দাগ তো ঢাকা আছে কাপড়ে। গায়ের জামাটা ছেঁড়াই ছিল কোনক্রমে ঢাকা ছিল বুক-টুকগুলো তা সে জামাটাও বেজন্মার বাচ্চারা ছিঁড়ে দিয়েছে। তবে জেলের বাবু একটা নীল জামা দিয়েছে, দয়া করে দিয়েই দিয়েছে বলে যা রক্ষে নইলে ছেঁড়া কাপড়ে সেই আঁচড়ের দাগ ঢাকা যেত না। নিরঞ্জনের হয়ত চোখ পড়ে যেত। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সীতা নিরঞ্জনের ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল, সব লোক ঢুকে যাচ্ছে দেখে গুটি গুটি পায়ে ঢুকল অবশেষে। কিন্তু কাছে এসে অবাক হয়ে গেল অন্য লোক একটা শুয়ে আছে! এ কি! অন্য লোক কেন? সে তাহলে কোথায় গেল? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে ভাবছে এমন সময় পাশের বিছানার রোগী ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল, কি খুঁজছ?

সীতা সন্তর্পনে বলল, এখানে যে ছিল সে কোথায়—

আগে যে ছিল?

অপর একজন প্রশ্ন ক'রল, যার পেটে ব্যথা হত ?

হ্যাঁ।

সে তো পরশু ভোরে মারা গেল।

সীতার মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কী! কি শুনল সে! না না সে লোকটা নয়, আমার সোয়ামী—তার মনের অবস্থার জন্যে অন্য কথা মুখ দিয়ে বেরোল বাকি আটকে রইল। রোগীটি বলল, তুমি সিস্টারকে জিজ্ঞাসা কর, সব জানতে পারবে। তবে এই বেডের রোগী পরশু ভোরে জল চাইছিল, কেউ জল দিতে এল না বলে জল খাবার জন্যে নামতে যেতেই পড়ে ওই মেঝেতেই মরে যায়।

সীতার মন কিছুতেই এ ঘটনা মেনে নিতে পারছে না। সে তাহলে অন্য কেউ ; এ খাটটা তাহ'লে তার নয়। অন্য কোন খাট হবে, সীতা চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল। ওর নিশ্চয় ভুল হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল সীতা, কয়েক পা গিয়ে থমকে গেল, না তো! ওইখানেই যেন হবে, আবার পেছন দিকে ফিরল। আবার সেই পুরানো খাটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এটা বোধ হয় নয়। তবে কোনটা ? কাছাকাছি কোন খাটেই তো নিরঞ্জন নেই, তবে কোথায় গেল ? কোথায় যেতে পারে ? তবে কি সুস্থ হয়ে হাঁটাহাঁটি ক'রছে ? তা হ'লে তার খালি খাটই বা কোথায় ? ও যখন সাতপাঁচ ভাবছে একজন খাকির পোষাকপরা লোক এসে বলল, কি খুঁজছ ?

আমার সোয়ামীকে—সীতা জানাল।

ইধার এসো সিস্টার ডাকছে।

কাছে যেতেই সিস্টার প্রশ্ন করল, কাকে খুঁজছ ?

আমার সোয়ামীকে—

কোন বেডে ছিল ? একশো আঠার নম্বর ?

নম্বর জানিনি দিদিমনি—ওই খাটটায়—সীতা আঙুল দিয়ে দেখাল। নার্স দিদি সেদিকে দেখে জানতে চাইল, কি নাম তোমার স্বামীর নিরঞ্জন মণ্ডল ?

হ্যাঁ দিদি—বলতে গিয়ে সীতার গলার স্বর কি এক অজানা আতংকে যেন কেঁপে উঠল। ধাত্রীদি জানতে চাইল, তুমি এ ক'দিন কোথায় ছিলে ?

প্রশ্নকর্ত্রীকে মহিলা পেয়ে মনের কথা ব্যক্ত করল সীতা, জানাল, রাস্তার থেকে পুলিশে ধরে নে গিছিল।

তুমি বলনি হাসপাতালে তোমার স্বামী ভর্তি আছে ?

কতই বললাম কোন কথা শুনলে না দিদিমনি—

ধাত্রীদি শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, তোমার স্বামী তো পরশু দিন মারা গেছে।

সীতা কি যে শুনছে স্থির করতে পারল না। বুঝতেও যেন ভুল হয়ে গেল। কেবল এক সীমাহীন সর্বব্যাপ্ত শূন্যতা গহনতম অন্ধকারের মত পরিব্যাপ্ত করল তাকে। কি অসম্ভব শব্দ; কি দারুণ শূন্যতা। এ কি শুনছে সে? তার পায়ের তলার মাটি মাথার ওপর আকাশ, কানের পাশের শব্দ, সব যেন একই সঙ্গে সরে গেল। শুধু গেল না নাকের সামনে থেকে বাতাস, যেটা গেলে সে এত অসুস্থ বোধ করত না। নিমেষে এক হাহাকার তার মনের মধ্যে থেকে সাইক্লোনের মত উঠে এসে তাকে প্রচণ্ড বিপাকে ফেলল। নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, হু হু শব্দে কেঁদে ফেলল চরম অসহায়তার আবেগে। এবার সে কি করবে? কোথায় যাবে, কোথায় গেলে ফিরে পাবে তাকে! নিদারুণ হাহাকার আর সীমাশূন্য শূন্যতা ছাড়া তার আর কোন সম্বলই রইল না। জীবনজুড়ে সেই শূন্যতার বিস্তার সে উপলব্ধি করে অস্থির হয়ে উঠল।

প্রথম যেদিন রেখার অবস্থাটা বোঝা গেল রেখার মা স্থির করে উঠতে পারল না কি করবে। মেয়েকে এতর মধ্যেও সে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল আর পারল না। হতভাগী কোনসময় নিজেরই সর্বনাশ করে বসেছে। কে যে তার সর্বনাশ করল! প্রচণ্ড ক্ষোভে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে যতটা পারল মারল। তাদের যৌথ চিৎকারে পথচলতি লোক জমে গেল দুজনকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করে। যে যেমন ইচ্ছে বা যার যেমন বুদ্ধি মন্তব্য করল। বুড়ির মনের জ্বালার ওপর সেইসব কথার আঘাত নতুন কোন মাত্রা যোগ করল কিনা কেউ তা ভাবল না। ব্যাপারটা যেখানে কৌতূহলের এবং নিছকই কৌতুক সেখানে চিন্তাভাবনার বিশেষ অবকাশ কমই থাকে। গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্যে বুড়ি আপন শব্দভাণ্ডার থেকে সমস্ত গালাগালিগুলো উজাড় করে প্রয়োগ করল রেখারই ওপর কিন্তু তাতেই কি আর ওর গর্ভস্থ মানবক শূন্যে মিলিয়ে গেল! বৃদ্ধার অসহায়তা কেবল হায় হায় করতে লাগল মনের মধ্যেটায়, উপায়ন্তর বিহীন ঘটনায় প্রতিকার সম্ভব নয় বলে মনের যন্ত্রণায় বৃদ্ধা আছাড় পাছাড় খেতে লাগল, অবশেষে মেয়েকে ছেড়ে নিজেরই মাথা ঠুকতে লাগল সিমেন্টের ফুটপাথে, উদ্দেশ্য আপন পোড়াকপাল রাখবে না।

অবস্থা দেখে সহবাসী আর একজন বৃদ্ধা এসে তাড়াতাড়ি নিবৃত্ত করবার জন্যে রেখার মাকে ধরে ফেলল। এতক্ষণ সে সবই দেখছিল এবং শুনছিল, এখন

সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কি করবে বল ? সোমত্থ মেয়ে বয়েসের দোষে করে ফেলেছে এখন আর কি হবে জড়িবুটি খাইয়ে দেখ পেট খসে যায় কিনা। অযথা নিজের মাথা ফাটালে কি কোন সুরাহা হবে !

সহবাসিনীর চেষ্টায় রেখার মা অবশেষে থামল, বলল, কে এইটা করছে আমারে কয়না ক্যান ? তারই সাথে অর বিয়া দিমু। বিয়া করতে হইবো।

এটা একটা কথা বটে, সায় দিল সহবাসী বৃদ্ধা, সেটা তুমি বলতে পার।

রেখার মাথাব বেশ কয়েকটি চুল ছিঁড়ে এসেছিল তার মার হাতে, মাথায় তাতে বেশ লেগেছিল সে তাই কথার উত্তর দিল না। কোন সুচতুর গোপন প্রেমিক যে তার গর্ভ সঞ্চার করেছে সে বিষয়ে একটিবার মুখ খুলল না সে। মা যতই মারুক ধরুক সে মুখে কুলুপ এঁটে রইল। মায়ের এত চেঁচামেচি অশান্তি করবার কি যে কারণ সে বুঝতেই পারছে না। কি এমন হয়েছে ? মাঝে মাঝে শরীরটা খারাপ করছে সে তো সকলেরই হতে পারে। হয়ও। কত লোকই বমি পায়খানা করে কি হয় তাতে ? মা যে কেন এমন ক'রছে সে মোটেই বুঝতে পারে না। কি হয়েছে তার ? কিছুই তো হয়নি। আসলে কেউ মার কাছে লাগিয়েছে ভাঙ্গিয়েছে। তার সুখে যার হিংসা হচ্ছে তেমনই কেউ হবে। কে আর হবে ওই মদনার মা-টাই হবে। ওর স্বামীটাতো আর কিছুই পারে না ঘাটের মড়ার মত পড়ে থাকে তাও গেছে হাসপাতালে। মেঠাই ওয়ালা ওর দিকে কেন তাকায় না এই হ'ল রাগ। তা গতরে আছেটা কি, ওই তো গায়ের রঙ। কুচকুচে কালো ! কে ওর দিকে তাকাবে ? তা ছাড়া মায়েরই বা এত মাথাব্যথা কিসের ? তার যদি কিছু হয় তো হবে। মার তো আর হতে যাচ্ছে না !

সহবাসিনী বৃদ্ধা রেখার মাকে শান্ত করে বলল, একটু চেষ্টা চরিত্তির ক'রে বরং মেয়েটার পেট খসিয়ে ফেল রেখার মা। তুমি জান না কিন্তুন এখেনের সব্বাই জানে তোমার মেয়ের সঙ্গে ওই মেঠাইয়ালার ফষ্টি নষ্টি আছে। দেশে ওদের বৌ আছে, ও কি কখনও বে করে তোমার মেয়েকে ?

রেখার মা সত্যিই এতদিন বুঝতে পারেনি যে ব্যাপারটা এতদূর। মাঝে মধ্যে দু চারটে জিলিপি বা লাড্ডু-মণ্ডা আনে বটে মেয়েটা তা রেখার মা ভেবেছে বাসি হয়ে যাওয়া মেঠাই দোকানদার দেয়। এখন সেই মেঠাই-এর রহস্য উদঘাটিত হয়ে যেতেই প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জে উঠল, হায় হায় রে পোড়াকপালী অভিশিয়া দুইটা জিলাপি খাইয়া মরলি ! এখন তর কি হইবো হতচ্ছাড়ী !

অনেকক্ষণ ধরে সয়ে রেখা হঠাৎ মুখফস্কে বলে উঠল, যা হইবো আমার হইবো। তোমার কি ?

এতক্ষণ এক রকম ছিল রেখার কথায় ওর মার সর্বশরীরে আগুন জলে উঠল, ঝাঁট দেবার জন্যে মুড়ো ঝাঁটা রাখা ছিল দেয়ালের ধারে সেটা তুলে নিয়েই রণরঙ্গিণী হয়ে উঠল, কি ক'লি পিশাচ? আমার কি? শয়তান! যা গা শয়তান আমার কাছ থিকা অখনি যা গা। পিছায় বাড়ি দিয়া তর দাত ফালাইয়া দিমু শয়তান জানি কুনহানকার!

হৈচৈ দেখে কিছু লোক জুটে গিয়েছিল মজা দেখতে। তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলল। আর সময় বুঝে তারই মধ্যে এমন দুচারজন জুটে গেল যারা কটূক্তিও ক'রতে লাগল রেখাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মনের জ্বালায় কোনদিকেই খেয়াল ছিল না রেখার মায়ের। তার মানসিক হাহাকার একমাত্র সে-ই বুঝছিল। দেশ ঘর ছেড়ে সর্বস্ব খুইয়ে যে মেয়েকে বুকে করে এনে বড় ক'রল সেই মেয়েই শেষকালে রাস্তার কুকুরে পরিণত হ'ল! এর চেয়ে ব্যর্থতা পরাজয় জীবনে আর কি হ'তে পারে? সমস্ত আশা ভরসা নিভে গেলেও সামান্য যে ইচ্ছা মনের মধ্যে গোপন প্রদীপ হয়ে জ্বলছিল তাও যেন নিভে গেল আচমকা এক দমকা বাতাসে। এখন প্রবল অন্ধকার, জীবন জুড়ে অন্ধকার, মৃত্যুর চেয়ে গভীর অন্ধকার তার সমস্ত অস্তিত্বের ওপর বিশাল পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে তার আত্মাকে, মরতেও দিচ্ছে না। দুঃসহ কষ্টকর অনুভূতি রেখার মা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

সীতা সেই হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যেই ফিরে এল। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। নিরঞ্জনের মৃতদেহটা যে কোথায় তার কোন হদিসই পায় নি সে। এ কদিন যাতায়াত করে একজন মমতাময়ী নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাকে ঠায় বসে থাকতে দেখে ডিউটি ফেরতা তিনিই জানতে চেয়েছিলেন, কি ব্যাপার তুমি এভাবে বসে আছ কেন? মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ বসে আছ?

সমস্ত দিনের শেষে সামান্য এইটুকু সহানুভূতির সুর শুনে জবাব হিসেবে কেবল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সীতা। বাচনিক কোন জবাবই দিতে পারল না।

দিদিমণিই খোঁজখবর ক'রে জানালেন বেওয়ারিশ শব হিসাবে সেই দরিদ্র মৃতের দেহ হাসপাতালের ডোমেদের হাতে হাতে সৎকার হয়ে গেছে। মহিলা সেই মৃতদেহের দুর্গতির কথা অনুমান করে নিয়েও সীতাকে বললেন, যাদের কেউ নেই তারা মারা গেলে কলকাতার কর্পোরেশনের ব্যবস্থায় মৃতদেহ পোড়ানো হয়। তুমি তো জানতে না, আসতে পারনি বলে তোমার স্বামীকেও পোড়ানো হয়ে গেছে। একটু থেমে তিনি বললেন, একদিকে ভালই হয়েছে তোমার তো কেউ নেই, কাকে দিয়ে পোড়াতে একা একা কি বা ক'রতে?

সীতা তখন সারাদিনের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাঁধভাঙা কান্নায় একেবারেই আকুল, নার্সদিদিমণির সান্ত্বনার স্বর তার কানে পৌঁছালও না। সে বেচারী যতক্ষণ পারল নানা কথা বলে শান্ত করতে চাইল সীতাকে, নিজের জায়গায় চলে যেতে বলল, অবশেষে বিহ্বল সীতাকে ছেড়েই চলে গেল আপন আবাসে। সীতা একা বসে থেকে কাঁদল, এক সময় ক্লান্ত হ'ল, শান্ত হ'ল। ঠিক শান্ত নয় অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারপর অনন্যোপায় হয়ে পায়ে পায়ে এসে এখানে বসল আপন শোবার জায়গাটুকুতে। বসল ভাবলেশহীন অবসাদগ্রস্থ মনে। এখানে কোন কথা কোন কলহ বা অন্য কোন শব্দও তার কানে ঢুকছিল না তাই রেখার বা তার মা-র সমস্যা তাকে আদৌ বিচলিত ক'রল না। সে তখন ভেবেই পাচ্ছে না কি ক'রবে বা কোথায় যাবে। এতবড় পৃথিবীতে এমন নিঃসঙ্গতা যে কি ভয়াবহ সেই কথাটা অনুধাবন ক'রতে ক'রতে সে যেন ক্রমাগত নিজের মধ্যেই গুটিয়ে যাচ্ছিল। তার মনে একটা ধারণা ক্রমশই প্রভাব বিস্তার ক'রছিল তার পাপেই নিরঞ্জন মারা গেল নইলে মরত না। লালুরা তাকে ধর্ষণ করাতে যে পাপ তার হয়েছে সেই পাপেই স্বামীর মৃত্যু এমনই একটা সংস্কারচালিত অজ্ঞতাজনিত বিশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে বসে তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

বেশ কিছুটা রাতেই গৌরী ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়ে দেখল দেয়ালে পিঠ দিয়ে সীতা চুপচাপ বসে আছে। তাকে অমন ঝিম ধরে বসে থাকতে দেখে সে বলে উঠল, কি লা কদিন কোথায় ছিলি। ক্ষেপ খেটে এলি নাকি?

সীতা এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে কোন কথা তার কানেই গেল না। সে নিশ্চল কোন জড়বস্তুর মত স্তব্ধতার স্তূপ হয়ে বসে র'ইল। গৌরী সামান্যক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থেকে তার কোন অভিব্যক্তি না দেখে নিজের মতই মুখ ব্যাদান ক'রে 'মরগে যা' বলে সরে গেল ঘাটের দিকে। চলতে চলতেই গজর গজর করতে লাগল, আ ম'লো যা! মাগীর গতরের দেমাক দেখে বাঁচিনি! করে কি অমন গতর দিয়ে? কাগ শগুনে খাবে। যুগটাই এই রকম, যার উপকার কর সেই গরম দেকাবে। মুকে আগুন অমন গরমের।

সারাটা রাত অমনি আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে গেল, ঠিক একইভাবে বসে সীতা একটিবার নড়ল না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পায়খানা, প্রস্রাব—কোন কিছুই তার স্তব্ধতা ভাঙতে পারল না। সকালে গৌরী অবাক হ'ল। কাল সন্ধে-বেলায় জবাব না পাওয়া তার প্রতি অবহেলা বলে মনে হয়েছিল বলে রাত্রে খাবার সময় দূর থেকে দেখেও কাছে যায়নি, এখন সন্দেহ হল তবে কি মরে গেল? মরে গিয়েই এমন বসে আছে মেয়েটা? নইলে এরকম হয় কি ক'রে! রাত সন্ধ্যার রাগ কেটে গিয়ে সহানুভূতি এল, কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে যখন

প্রাণের স্পর্শ পেল জানতে চাইল, হ্যাঁ লা, অমন ক'রে বসে আছিস কেন? কি হল? চুপ করে আছিস কেন? সামান্য একটু ধাক্কা দিল সংবিৎ ফেরাবার মত ক'রে।

তাতেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সামনেই বসে পড়ল, মুখের সামনে গিয়ে স্নেহস্বরেই জানতে চাইল, কি রে? কি হল বল?—গৌরীর সন্দেহ হল জ্ঞান আছে তো? মাথার গোলমাল হয় নি তো? সে একবার তাদের বস্তির একটি মেয়েকে পাগল হতে দেখেছিল, সে-ও এমনই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে অকস্মাৎ একবার হেসে উঠেছিল খিল খিল ক'রে, সে কি হাসি! আপন মনে কে জানে কিসের আনন্দে সে হেসেই চলল, তারপর হাসি যদি বা থামল অদৃশ্য কোন মানুষের দিকে শূন্যে লক্ষ করে কথা বলতে লাগল একান্ত আপন জনের সঙ্গে বলবার মত করে। সীতা আবার তেমনই করে হঠাৎ হেসে উঠবে না তো? আচমকা হাসির থমকে ফুলে ফুলে উঠবে না তো অকস্মাৎ?

সীতা কোনটাই ক'রল না। গৌরী কিছুটা মায়ায় পড়েই চুপচাপ তার মুখের সামনে বসে রইল। তারপর হঠাৎ ওর মনে পড়তেই বলল, হ্যাঁ রে তোর ভাতারের খবর নিয়েচিস? লোকটা কেমন আচে না আচে জানিও না।

কথাটা যাদুমন্ত্রের মত কাজ ক'রল, নিমেষে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সীতা, যেন তার বহু যুগের অবরুদ্ধ কান্নার উৎসমুখ খুলে গেল। আচম্বিতে সেই জ্বালামুখ দিয়ে হুড় হুড় ক'রে কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল লাভা স্রোতের মত। গৌরী হকচকিয়ে গেল, সে এতক্ষণ ধরে যা কিছু ঘটার সম্ভাবনা ভাবছিল তার কোনটাই ঘটল না। তার মত মুখরা মানুষও কি ক'রবে কি বলবে ভেবেই পেল না। কাঁদবার জন্যে ওকে কিছুটা সময় ছেড়ে দিয়ে নরম সুরে বলল, কি হল কাঁদচিস কেন? থাম, আমার কথাটা শোন। —গৌরী সান্ত্বনা দেবার সব রকম চেষ্টাই ক'রতে লাগল কিন্তু সীতা আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল যা সে এ কদিন ক'রতে পারে নি। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছোতে গিয়ে অনেক মৃতদেহই দেখেছে গৌরী কিন্তু মৃত্যু তেমন ক'রে দেখেনি। কলকাতার বুকে ধর্মমতের দাঙ্গার বীভৎস মৃতদেহ সে দেখেছে, তাদের সহ-বাসিনী একটি মেয়েকে আপন প্রেমিকই খুন ক'রে গেছে সে দেখেছে, তবু সে মৃত্যুকে ঠিক সেভাবে দেখেনি যা দেখলে নিরঞ্জনকে মৃত অনুমান ক'রতে পারত। অথবা তার আবেগহীন মনেও সামান্য একটু অনুভূতি হয়ত সীতার জন্যে ছিল যার ফলে এতবড় অঘটনের কথা ভাবতে চাইছিল না।

কিন্তু সীতার বাঁধন ছাড়া কান্নার ধারা দেখে তাকে অনুমান ক'রে নিতে হ'ল যে নিরঞ্জন নেই। এ কদিন বোধহয় হাসপাতালেই ছিল মেয়েটা তাই

হৃদয়ের মর্মমূল থেকে কয়েকটি শব্দ তুলে এনে ছুঁড়ে দিল, একা একা গেলি আমাকে ডাকলি নি কেন? আমি কি যেতুম না? তা জামায়ের কি গতি ক'রলি শেষ পর্যন্ত?

সে আমার মুখ দেখল নি গো মাসি। সে পাইলে গেল, বলেই আবার ডুকরে কেঁদে উঠল সীতা।

এবার আবার গোলমাল হয়ে গেল, গৌরী ভেবেই পেল না ঘটনাটা আদতে কি ঘটেছে। কোথায় পালাল নিরঞ্জন। কোথায় পালাবার কথা বলছে? সামান্য ভেবেই জানতে চাইল, কখন কি হ'ল আমাকে বললি নি তো!

এ পাপ মুখ আর সে দেখল নি মাসি। আর্তনাদ করতে লাগল সীতা।

তা কি হল বলবি তো?

কি আর বলব মাসি সে আমাকে জন্মের মত ছেড়ে গেল।

তা আর কি ক'রবি বল? চেষ্টা তো তুই কম করলি না।

না গো মাসি আমার পাপের জন্যেই সে রাগ করে চলে গেল। এই পোড়া দেহের পাপে—বলেই মাটিতে আছড়ে পড়ল অসহ্য বিকারে।

গৌরী তাকে অনেক কষ্টে আর চেষ্টায় সামলে নিল। শিশুকে বোঝানোর মত করে বোঝাল, তাতে ফল যে কিছু ফলল এমন নয় তবে মনের ভার আর শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যাওয়াতেই সীতা যেন মিইয়ে গেল। বেদম হয়ে পড়ল।

ক'টা দিন এমনি করেই কাটল। গৌরীই এখান সেখান থেকে জোগাড় টোগাড় ক'রে কিছু কিছু খাইয়ে তাকে টিকিয়ে রাখল, তারপর শোক একটু হতোদ্যম হ'লে শান্ত সীতার কাছে জেনে ফেলল সেই সময়কার ইতিহাস।

সমস্ত শুনে গৌরীই তাকে প্রথম বলল, এতে তোর দোষ ভাবছিস কেন? ওই হারামীর বাচ্চাগুলো তোকে বেইমানী করে জোর করে ক'রল সেখেনে একা মেয়েমানুষ তুই কি ক'রবি বল? দুজন গুণ্ডা মিলে তো কত সময় একলা পুরুষ মানুষ-কেও মেরে ফেলছে। তুই তো আর ওই বাঙ্গালবুড়ির শুঁটকি মেয়েটার মত মারাতে যাসনি?

সবই ঠিক, এই কথাটা সীতা নিজেও জানে, কিন্তু নিরঞ্জনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্য তার সান্ত্বনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সহজ সত্যও তাকে কোন সময়ই শান্তি দিতে পারে নি। নিজেকে তার কোন সময়ই দোষমুক্ত মনে হয়নি তার জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অভাবের জন্যে।

গৌরী সারাজীবনই জীবনকে অন্য কোণ থেকে দেখেছে, ফলে জীবন তার কাছে অন্যরকম তাৎপর্যে পূর্ণ। অনেক ঋজু, কঠিন, বাস্তব এবং স্পষ্ট।

সে আত্ম-বিক্রয় করে আত্মরক্ষা ক'রতে শিখেছে, জেনেছে জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় সত্য নেই। আর,সেই জানা এবং জানাকে মেনে নেবার ফলেই এখনও বেঁচে আছে। অল্প বয়সটা সে নিজের শরীরের মাংস খেয়েই বেঁচে থেকেছে সে মাংস ফুরিয়ে যাওয়ার পরভোজী প্রাণী হিসেবে টিকে থাকবার কলা কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। প্রাণ ধারণের জন্যে তাকে বিচরণ করতে হয় দূর দূর এলাকা পর্যন্ত, বেছে আলাপ করার স্বভাবও তাকে স্বার্থ রক্ষায় সাহায্যই করে। তার সঙ্গে তাই চেতলা হাটের আলুর কুলি, জুতো সারাইওয়ালা, ঠেলা চালানোর নগদমুটে, অনেকেরই আলাপ। সন্ধেবেলা কালী মন্দিরের কাছে বসে থাকে তেমন সাদাসিধে ধরনের লোক পেলে গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করে, দু চারজনের সঙ্গে হয়েও যায়।

উত্তর কলকাতার আলু পোস্তা থেকে, অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিহারী কুলিরা অনেকে মাঝে মধ্যে একবার মাকালীজীর দর্শনে আসে তাদের ভালমন্দ বোঝাবার চেষ্টা করে সুযোগ পেলে, যাতে তারা পাণ্ডাদের টানাটানি ছাঁচড়া ছেঁচড়ি থেকে বাঁচতে পারে। বিনিময়ে কেউ কেউ কিছু পয়সা দিয়ে ওকে খুশি করবার চেষ্টা করে। দু একজন আবার কিছু গল্পগুজব ক'রে হালহদ্দ বোঝবারও চেষ্টা করে। কেউ কেউ নেহাৎ গল্প করবার জন্যেই গল্পগুজব করে বসে। এদিনও গৌরী রবিবার বলে কালী বাড়ীর পথে একটা গাছের তলায় বসে সীতার সঙ্গে গল্প ক'রছিল এমন সময় বড়বাজার পেঁয়াজ পোস্তার কুলি জানকী এসে হাজির, কা হো মৌসীজী বৈঠকে কা করতা ?

গৌরীর লোকটাকে ভালই লাগে, প্রতি মাসেই কোন একটা রবিবারে কালীজীকে পরসাদ চড়াতে আসে, অনেক সময় সঙ্গী সাথীদের দলবল নিয়েও আসে। আজও সঙ্গে একজন ছিল তাকেই চেনা করিয়ে দিল, এ আমার পটরিদার সরযু। গৌরী লোকটির সম্ভাষণের উত্তরে প্রথম কথা বলল, মন্দির তো এখনও খোলে নি। এত আগে এসে পড়লে কেন ?

সীতাদের সামনেই পথের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল জানকীরা দুজনে, আপন ভাষাতেই বলল, এখান থেকে ফিরে গিয়ে রান্না টান্না করতে হবে তো ?

আসলে রবিবার কাজকর্ম নেই রান্না খাওয়া হয়ে গেছে, কি আর কাজ ঘুরতে বেরিয়েছে দুই সঙ্গী। ভেবেছিল ময়দানে মনুমেণ্টের কাছে রামায়ণ গান যদি হয় তো শুনবে, আজ এসে দেখে যে 'পণ্ডিত' প্রতি রবিবার বসে রামচরিত মানস পড়ে শোনায় কোন কারণে সে আজ অনুপস্থিত। তাই তখন স্থির হয়েছে চল আজ কালীজী দর্শন করে আসি।

কথার ফাঁকে গৌরী বাঁ হাতের পাতা সোজা করে জানকীর দিকে মেলে ধরতেই সে পকেটে হাত দিয়ে খৈনীর কৌটো বের ক'রল। নিজের বাঁ হাতে

কিছুটা তামাক পাতা আর চুন তুলে নিল চ্যাপ্টা কৌটোটার ছদিক থেকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেই তামাক আর চুন ডলতে লাগল বাঁ হাতের চেটোয়।

গৌরীর সঙ্গে লোকগুলোর ঘনিষ্ঠতা দেখে সীতা অবাক হয়ে গেল, যেন কতকালের চেনা। আত্মীয়স্বজন দূর থেকে এলে যেমন ভাবে কথাবার্তা বলে তেমনই ভাবে গল্প ক'রছে দুজনে। অন্য একজন লোক বরং চুপ করে বসে আছে। তার চেয়ে অবাক লাগল ওদের বাক্যালাপ শুনে, দুজনেই যার যার নিজের ভাষা বলছে অথচ বেশ কথা চলছে! লোকটা গৌরীর হাতে এক চিমটে খৈনি দিতেই সে অবলীলাক্রমে তা নিজের দাঁতের ফাঁকে চালান করে দিয়ে বলল, বাংলা মুলুকে থেকে তোমরা যে কেন নিজেরা রান্না করে খাও কে জানে?

কি ক'রব! তোমাকে তো কতদিন ধরে বলছি একটা জানানা জোগাড় করে দিতে তা তুমি তো দিচ্ছই না।

আ মলো যা, গৌরী মুখিয়ে উঠল, আমি তোর জানানা কোতায় পাব? আচ্ছা তুমি কি তাকে দেশে নে যাবে?

হ্যাঁ। দেশে গেলে নিয়ে যাব—জানকী জানাল।

দেশে তোমার বউ নেই?

আমি তো সালভর এখানেই থাকি। দেশে জানানা দিয়ে কি হবে? এখানে আমার সঙ্গে থাকবে রান্না ক'রবে, খাবে খাওয়াবে—

সীতা কেবল গৌরীর কথা বুঝতে পারছিল অপর লোকটির কথার শব্দ থেকে তার কিছু বোধ হচ্ছিল না ভাষার অসুবিধের জন্যে। এই লোকগুলো কি যে ভাষা বলে সে কিছু বোঝে না অথচ মাসী সব বুঝতে পারে। মাসীর বুদ্ধিও খুব। অমন বুদ্ধি থাকলে সেও শিখতে পারত।

গৌরী লোকটাকে বলল, একবছর বাদে তুমি দেশে পালাবে তখন মেয়েটা খাবে কি? না খেয়ে মরবে?

এই অবস্থার জন্যে কি করণীয় জানকী জানে না বলে জবাব দিতে পারল না, তার মাথায় যা এল বলল, ওকে নিয়ে যাব।

মাসী অমনি মুখিয়ে উঠল, কে যাচ্ছে তোদের খোট্টা মুল্লুকে? বাঙালী মেয়ে ওখানে যাবে না।

ঠিক আছে সে দেখা যাবে।

দেখা যাবে কি রে? যা বলবার এখনই সাফ সাফ বলে দাও বাপু, পেছনে ঝামেলা রাখা চলবে না।

ওদের কথা যখন চলছে সেই সময়ই সম্বর্ বলে লোকটা বলল, আমাদের

দেশে কত বাঙ্গালী আওরত আছে। বিয়েটিয়ে করে ঘর ক'রছে।

গৌরী ওকথা গ্রাহ্য না করবার জন্যে না শোনবার ভান করল। মনের মত কথা না হ'লে সে এইভাবেই উপেক্ষা করে, যেভাবে ক'রল। জানকীও বাধ্য ছেলের মত নিজের প্রসঙ্গ ত্যাগ করে বলল, ঠিক আছে আমি ঘর যাব তো আমার জানানার ব্যবস্থা করেই যাব। একমাসের খোরাকি দিয়ে যাব।

বেশ তবে অন্য একদিন এস আমি কথা বলে দেখি কি ক'রতে পারি। তুমি আমাকে অনেকদিন থেকে বলছ—

লেকিন জানানা তো দেখাও—

গৌরী চোখের ইসারায় সীতাকে দেখিয়ে দিল আর সে ইসারা কেবল জানকীই একা দেখল, সরযূরও নজরে এল না। জানকী ভাল করে দেখে নিল সীতাকে। বাংলা মুলুকের মেয়েরা এমনিতেই মনোহরা, রমণীয়। তাদের দেশের মেয়েদের মত রুক্ষ শক্ত চেহারার নয়। জানকী অনেক দেখেছে, দূর থেকে দেখে ভালও লাগে তার। এ মেয়েটিও বেশ নরমই হবে মনে হচ্ছে। সে মোহিত হল। রাস্তায় থাকে, তা তারা নিজেরাও তো থাকে, থাকবেও তাই। কোন ঘর পাবে আর ঘরেলু বানাবে? কাজেই ঠিকই আছে। চলবে।

গৌরী লোকের চোখের দিকে তাকালেই মন বোঝে। জানকীরও বুঝল তাই খুব অন্তরঙ্গ ভাবে বলল আজ যা, পরে একদিন আসিস।

জানকীরা যখন উঠে যাচ্ছে সেই সময় বলল, কি গো এতক্ষণ রইলে এক কাপ চা-ও তো খাওয়ালে না। কম সে কম চা বিস্কুট তো খাইয়ে যাও।

এমনিতে সিকিটার বেশী কখনও দেয় না জানকী আজ খুশির কারণ ঘটেছে বলে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিল। অনেকদিন ধরেই একজন মেয়েমানুষ দেবে বলে আশা দিয়ে যাচ্ছে বুড়িটা আজ সত্যিই একজনকে দেখাল। ঠিক করে দেবে বলে মনেও হচ্ছে।

তা আধুলি তাই সই, গৌরী মুদ্রাটা আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখল। লোক দুটো চলে যেতে সীতাকে বলল, নে তোর একটা গতি করে দিলাম।

গতি! সীতা একথার অর্থ বুঝল না। কিসের গতি? নিরঞ্জন যতদিন মারা গেছে সমানে কেঁদে চলেছে সে; ইদানীং চোখের জল ফুরিয়ে এসেছে, যতটা ঝরেছে শুকিয়ে গেছে গালে। সীমাহীন নিঃসঙ্গতা আর ভবিষ্যতের প্রবল দুর্ভাবনা তাকে যেন এক গহন অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। গৌরীই কোনক্রমে টেনে চলেছে তাকে। এই চরমতম দুঃসময়ে এই মানুষটা ছিল বলেই সে বেঁচে আছে নইলে কি যে হ'ত—। কি হ'ত ভাবতে চায় না, পারেও না সীতা, তার কেবলই মনে হয় মরে যাওয়াই উচিত ছিল। মরে

গেলেই কেবল যথার্থ বাঁচতে পারত। এ বাঁচা তো কোন বাঁচাই নয়, প্রতিদিন নতুন ভাবে নিত্যনতুন মৃত্যুর জন্যে পড়ে থাকা। কেন যে ভগবান স্বামীর সঙ্গে তাকে নিলেন না এই তার একান্ত হা হুতাশ। কাল যেমন সব কিছুই থিতিয়ে দেয় তেমনই দিল তার শোকও। এবং উপায়ন্তর বিহীন শোক অল্প দিনেই প্রশমিত হল বাধ্য হয়ে।

সেই সময়ই গৌরীর প্রস্তাবটা এল, ছাক তোর যা বয়েস তুই এখন মরবিনি। চাইলেই কি আর মরতে পারবি, তা'লে তখনই মরতিস। তা মরতে যখন পারবিনি বাঁচতে তো হবে? এভাবে একা একা পড়ে থাকলে ঠুক্‌রেই মেরে ফেলবে তোকে শ্যালকুকুরে। তোর হাড় মাংস আলাদা করে খাবে।

সীতা মন দিয়েই গৌরীর কথা শুনছিল, তাই নিঃশব্দ রইল। শুনতে লাগল—দশজনের এঁটো খেয়ে কেন মরবি একটা ভাল লোক যখন জুটেচে তোকে খাতির করে বে করতে চাইচে তুই রাজি হয়ে যা, একটা গতি হয়ে যাবে। আমি বলি কি এ সুযোগ হারাসনি। আর এখেনেও থাকতে হবে না যে পাঁচজনে পাঁচ কতা বলবে। তুই চলে যাবি এদিকে আর আসবিও নি।

গৌরীর কথাগুলো সীতার মনের সংস্কারের দেয়ালে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল। তার উত্তরাধিকার অর্জিত সংস্কার, অশিক্ষাজনিত সংস্কার, পরিবেশ জনিত কুসংস্কার সব মিলে মনের মধ্যে এক অসীম পাহাড়। সে জানে মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়, স্বামীর সঙ্গেই মেয়েদের জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যায়। সংস্কার সেই জানাটাকে আটকে ধরে গৌরীর কথা শুনতেও বাধা দেয় তাকে। ওসব কথা শুনতেও নেই। পাপ হয়। অথচ পাপ কি আর পুণ্যই যে কি কোন ধারণাই তার স্পষ্ট নয়। তবু সে পাপ বলে সাংঘাতিক কোন ব্যাপারকে ভয় পায়। মনে করে এক পাপেই সে স্বামীকে হারালো আবার পাপ করলে না জানি কি বিষম অনর্থ ঘটে যায়। তার আর কি ঘটবার থাকতে পারে? কিছুই যে বাকি নেই এটা জেনেও সে বিকল্প কিছু ভাবতে পারে না। গৌরী সারাজীবনে যেভাবে জেনেছে সেইভাবে যে কোনমূল্যে বেঁচে থাকবার নামই যে জীবন এই সরল সত্য সে মেনে নিতে পারে না। অসত্য কিছু বোধকে সে মূল্যবোধ হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকে মনের মধ্যে, সেই বোধই তাকে চালিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে।

কিছুই তার ইচ্ছকৃত নয়, সে যে সমাজের অংশীদার সেই সমাজ জন্মসূত্রে তার মনে যে বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে কোন মানুষই যেমন তার বাইরে যেতে পারে না সে-ও পারে না। অবস্থা দেখে গৌরী কিছুটা বিরক্ত হল। তার

অভিমানে লাগল, সে এতদিন দেখা শোনা ক'রছে ভালমন্দ সবকিছুর সঙ্গে আছে এমন কি নিজে কৃচ্ছ সাধন করে খাবার পর্যন্ত জোগাচ্ছে ওকে আর সেই সীতা কি না তার কথা শুনল না। গৌরী স্থির ক'রল আর নয়। এই গেঁয়ো মেয়েটার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখবে না।

এই অবস্থার জন্তে সীতা আদৌ তৈরী ছিল না। নিরঞ্জন মারা যেতে যতটা না রিক্ত লেগেছিল গৌরী না থাকায় তাই লাগল। মনে হল এতবড় পৃথিবী একেবারেই শূন্যময়। সে একা। কেউ কোথাও নেই। এমন কি না খেয়েও থাকতে হ'ল তাকে দু একবেলা। গৌরীর সঙ্গে দেখা না হওয়াতে বুঝল গৌরীর একটা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি তার প্রতি ছিল যা ছায়াতরুর মত স্নেহশীল। যে নীরব ভালবাসা দিয়ে গৌরী তাকে ঢেকে রেখেছিল তা বড়ই মমতাময়। সুলভ বস্তর যেমন মূল্য বোঝা যায় না তেমনই সে গৌরীর প্রীতিরও পরিমাপ করতে পারে নি। গৌরীর অনুপস্থিতি থেকেই সেই মূল্য বুঝল।

খুঁজতে খুঁজতে পাঁচদিনের দিন গৌরীকে পেল সীতা গঙ্গার ঘাটে বসে আর একজন বুড়ির সঙ্গে গল্প করছে। সীতা যেন চাঁদ পাবার মত করে বলল, কি গো মাসী তোমাকে কোথায় না খুঁজেছি। কোথায় ছিলে এতদিন ?

গৌরী সীতার দিকে এমন ভাবেই তাকাল যেন ওকে চেনেই না। ওর প্রশ্নের উত্তরও দিল না। এতে সীতা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। গৌরীর এমন ভাবলেশহীন নীরবতা বিস্ময়কর। সেই মানুষটাই যেন নয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, কি হয়েছে তোমার ? আমাকে চিনতে পারছ না ?

এবার গৌরীর স্বাভাবিকতা ফিরল, ওর নিজস্ব স্বরে জবাব দিল, তা আবার কেন পারব না বাপু ? মানুষ চিনতে চিনতে তো এত বড়টা হলুম। তোমাকে চিনতে পারব না ?

জবাব শুনে সীতা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না। এ মানুষটা এরকম কথা তো কখনই বলে না। আজ হঠাৎ এমন আজগুবি কথা বলছে কেন ? সে চুপ করে আছে দেখে গৌরীই আবার বলল, তুমি তোমার দেখ আমি আমার দেখি। আমার তো আর গতরে অত রস নেই যে আজ লালু কাল কালু পরশু মোল্লাই‌আলা সেই রস চেটে চেটে খাবে।

বোঝা গেল গৌরী রেগে আছে। কেন যে রেগে গেল সীতা বুঝল না। কি তার দোষ ? নিরেট ভালমানুষের মত জানতে চাইল, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ মাসী ?

তোঁর ওপর রাগ করতে যাব কেন ? তুই আমার কে ? নিজের লোকের

ওপরই রাগ করা চলে না—

সীতা বুঝল এটা অভিমানের কথা। কিন্তু সে তো মাসীর রাগ অভিমানের মত কোন কাজ করেনি। সে বোকা সোকা লোক কি বলতে কোন সময় কি বলে ফেলেছে কে জানে? এমন উপকারী মানুষটা না থাকায় এই ক'দিনেই যে হাল হয়েছে সে বুঝছে। আর বেশী বাড়তে দিয়ে লাভ নেই মনে করে বলল, আমি কখন কি বলে ফেলি মাসী তার ঠিক নেই। আমার অবস্থা তো তুমি বুঝতেছ মনেরই ঠিক থকেতেছে না কথার ভুলচুক তো হতেই পারে।

তোর কতার ভুলচুক কে বলেচে রে নেকী? আমার ওপর তোর য্যাকোন বিশ্বাস নেই—

তোমার ওপর বিশ্বাস নেই! এমন ধারা কথা কোথায় শুনলে?

কেন তুই নিজেই তো বললি।

আমি! কখন বললাম?

তোর যাতে ভাল হয় একটা আশ্রয় পাস শ্যালকুকুরে ঠুকরে না খায় তাই একটা বিহিত করতে চাইলুম তুই রাজি হলি না। হলে ভাল তোরই হ'ত, না আমার? আমি হলাম গে ভাসা খড় এখানে সেখানে দিন কেটে যাবে তোর তো এখনও অনেক দিন বাকি।

কথাটা সীতাকে গম্ভীর ক'রে তুলল। গৌরী মাসীর কথায় ওর কোনই সন্দেহ নেই তা বলে তাতে সায় দিতে পারছে না ও কিছুতেই। স্বামী না হয় নেই তা বলে পরকাল তো আছে, কি জবাবদিহি ক'রবে ও সেখানে? গৌরীর কথার জবাবে এটা বলতেই গৌরী জবাব দিল, ইহকালই যাদের নেই তাদের আবার পরকাল। রাখ তো তোদের ছেনালীর কতা!

সীতা থেমে গেল। গৌরীমাসী যেন কি রকম, কিছু মানে না। পরকাল প্রেতলোক কত কি সব আছে তাদের গাঁয়ের হারাণ নস্করের বউ সব জানে, তার কাছে কত গল্প ক'রত। নস্করের বউ স্বরো তো লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ কিনা ইস্কুলে তিন চার ক্লাস পড়েছিল, সে জানবে না তো কি গৌরী মাসী জানবে? সে বলত, জানিস না মেয়েদের তো সোয়ামীই দেবতা।—কত জন্মের পাপে তাকে এমন ভুগতে হচ্ছে কে জানে, স্বামীও চলে গেল তাকে ছেড়ে এখন আবার নতুন ক'রে পাপ ক'রবে স্বামীর সঙ্গে বেইমানী করে?

তার ভাবনার মধ্যেই গৌরী বলল, দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে তবে না অন্য কতা ভাবব। পেটের জন্যে সব, বুঝলি এই পেটেরই নাম ইহকাল আর পেট বাঁচলে তবে পরকাল।

সীতার মনে হ'ল গৌরীমাসী কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। খেতে না পেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়, খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। একটা

বেলা খাবার না জুটলে শরীরের মধ্যে কেমন আনচান করে। বড়ই কষ্ট হয়। আজকাল একটা বেলা না খেলে সহ্য হয় না। পথের ওপরে থেকে থেকে রোজ জল ঝড় শীত সবই সহ্য হয়ে গেছে ক্ষিধে সহ্য হয় না, বড়ই কষ্ট দেয়। দুঃসহ যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে। আহা রে কত যন্ত্রণাই পেয়েছে লোকটা, কত কষ্ট পেয়েই মরেছে। ব্যথা বেদনার কথা বললে কত সময় কত কিছুই না নিরঞ্জনকে বলেছে সীতা; এখন সেজন্যে অনুতাপ হতে আপনি চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল সীতার।

ওর চোখে জল দেখে গৌরী বলে উঠল, আ মলো যা কাঁদচিস কেন লা আবাগীর বেটি? কান্নার কি বললুম? আমি বাপু পষ্টো কতার মানুষ, মুকের ওপর বলি বটে তবে লোকের ভালর জন্যেই বলি। এই যে এমন ধারা সতী সাধ্বী থাকতে গেলি পারলি থাকতে? মুখপোড়া ড্যাকরা মিনষেরা দিলে থাকতে? তুই তো কোন ছার খোদ সীতা সাবিত্তিরা যদি এই ফুটে শুতে আসে তো তাদের মুক পুড়িয়ে ছাড়বে এই মড়াখেগো মিনসেরা। একা থাকতে গেলে তোকে ছিঁড়ে খাবে বলেই ভাল বাস্তা বলে দিলাম, তা তোর ভাল না লাগলে তো আমি জোর ক'রব না, খামোখা কাঁদিস নি। •

সীতা যে কিছুটা অন্য কারণে এবং অকারণে কাঁদছে এই কথাটা গৌরীর জানা থাকার কথা নয় অনুমানও অসম্ভব। তার মনগড়া কারণ সীতার কানে গেল, জবাব দিল না। বস্তুত নিরঞ্জন মারা যাবার খবর জানবার পর থেকে সে বিমূঢ় হয়ে গেছে কি ক'রবে কি ক'রলে ভাল হবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার যে কিছু ভালমন্দ থাকতে পারে এমনও আর মনে হয় না। ভাল তো কিছু হতেই পারে না, মন্দ হ'লে আর কি মন্দ হবে? সে তো মরতেই চায় কেউ যদি সেই মন্দটা ক'রে দিতে পারে তো সে বেঁচেই যাবে।

কিন্তু যে মন্দের মুখোমুখি হবার কথা সীতা কখন চিন্তাই ক'রতে পারে নি তেমনই ঘটনার সামনে এল সেদিন রাত্রে। অন্য অনেকের মধ্যে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সীতা, হঠাৎ কে যেন তার মুখের ওপর কি একটা চাপা দিয়ে আটকে দিল। আচমকাই পাকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেলেও আতঙ্কে ওঠবার পর্যন্ত অবকাশ পেল না। তবে সৌভাগ্যের এই যে সে ভয় পেয়ে হাত পা ছোঁড়ায় তার লাথি গিয়ে লাগল পাশে শোয়া রেখার মার গায়ে আর অমনি বুড়ি এমন চেঁচিয়ে উঠল যে কাছেই কোথাও টহলদার পুলিশ বাঁশি বাজাল সেই চিৎকার শুনে। সীতার আক্রমণকারীরা তিনজন দৌড়ে উধাও হয়ে গেল তাদের চেনা না গেলেও। ভয়ে উত্তেজনায় প্রচণ্ড বুক ধড়ফড় ক'রছিল সীতার। আতঙ্কে সে উঠে বসে কেঁদে ফেলল। যে কাপড়টা দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেটা যে তার গায়ের ওপরই পড়ে

আছে চোখে পড়ল না, সে অবস্থাই তখন নয়।

দিনের বেলার পুলিশ যে রাত্রে বাঘের চোখে সব কিছু দেখে সে ধারণা হয়েছে সীতার একটি বারের অভিজ্ঞতাতেই, তাই যে পুলিশের বাঁশি তাকে বাঁচাল সেই বাঁশির ভয়েই সে লুকোতে চাইল আবার চট করে শুয়ে পড়ে। রেখার মা তা হতে না দেবার জন্যে ওকে সমানে গালাগালি দিতে লাগল, তার ধারণা এই মেয়েমানুষটাই লোকগুলোকে আনিয়েছে, ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখে ফেলেছে বলেই চেঁচামেচির অভিনয় ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিল। আসলে এই মাগীটাই বদমাস, যত নষ্টের মূল। তার মেয়েটাও এরই জন্যে বিপদে পড়েছে। সে এই মাগীকে কিছুতেই শুতে দেবে না এখানে। যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগল সে সীতাকে।

পুলিশের ভয় বেড়ে গেল হাঙ্গামার ভয়ে। এমনিতে পাহারাদাররা যদি বা না আসত বুড়িটার চেঁচামেচিতেই এসে পড়বে বলে ওর আরও বেশি ভয় ক'রতে লাগল। সে অন্য সময় হলে কলহ করত এ সময় ক'রল না রণে ভঙ্গ দিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে মাথার কাছটায় গুড়ি শুড়ি মেরে বসে রইল। ঠায় সেইভাবে বসেই কাটিয়ে দিল সমস্তটা রাত্তি পাছে ঝিমিয়ে পড়লে আবার কোন বিপদ আসে তাই দু'চোখের পাতা এক ক'রতে পারল না।

পরদিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হতেই সীতা জানাল, আমি হেথা থাকবো নি মাসী।

কোতায় যাবি ?

দেশে চলে যাব। কথাটা বলল বটে পরমুহূর্তে নিজেই ভেবে পেল না দেশে কার কাছে যাবে। তিনকুলে যার কেউ নেই তার জন্যে কে দরজা খুলে বসে আছে ? নিরঞ্জনের আত্মীয় স্বজনরা কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না, তার মামা কাকা যারা আছে তারাও তাই। আশ্রয় দিতে পারে বড় গাছ, তেমনটা কোথায় ? তারা তো সবই আকন্দ ক্যাওড়া, বট পাকুড় তাদের মধ্যে কই ? কোন কূলে যার আশ্রয় থাকে সে কখনও রাজপথে আসে ? গৌরী সেকথা ভাল করেই জানে বলে ব্যাঙ্গ করে বলল, দেশে তোর ক'বিঘে জমি আছে ?

জমি কোথা পাব ? ম্লান মুখে জবাব দিল সীতা।

তবে কোন জাত আছে তোর যেখানে থাকবি ? যাক গে তোর যা খুশি তাই কর—গৌরী নিরুৎসাহ হয়ে জবাব দিল।

তা কেন বলছ মাসী ?

তবে আর কি বলব বাছা ? তোর ভালমন্দ কি আমি বুঝে দেব ?

সীতা চুপ করে রইল। দেশে ফিরে যাবে বলছে বটে নেহাৎ না পেরে

বলছে, সেখানেও যে যাবার জায়গা নেই এ সে বেশ ভালই জানে আসলে কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারছে না। ভাবতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল, জল ঝরতে লাগল নিঃশব্দেই। মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ঝরে তার চূড়ান্ত অসহায়তাও তেমনই যেন চোখের জল হয়ে ঝরতে লাগল।

কখন কখন চোখের জলের ভাষা বোঝা যায়। গৌরী বুঝল, সস্নেহে বলল, তোর যে কোন কূলে কেউ নেই সে তো আমি জানি। এখেনেই তোকে মরতে হবে, তবে যদি ভাগ্য ভাল থাকে তো পথে এমন শ্যাল কুকুরের মত না মরে কারও ঘরে মানুষের মত মরবি। তা বাদে তুই কলকেতাতে থাকলে কোনদিন না কোনদিন তোর ছোঁড়াটাকেও দেকতে পাবি।

কিন্তু এখেনে যে বড় অত্যেচার ক'রছে—

সে তো আমি আগেই বলেছিলাম বাছা—দুপেয়ে জানোয়ার তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। যে কদিন গায়ের মাংস না ফুরোচ্ছে কেউ চাটবে কেউ কামড়াবে যে যেমন ক'রে পারবে খাবে। এদের সঙ্গে পারবি নি।

সীতা একথাটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাই সে কোন কথাই বলল না। কি বা বলবে? কি করবে কোথায় যাবে? কি খাবে? মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় আর বেঁচে থাকবার মত দুটো ভাত এই সামান্য চাহিদাই এখন সবচেয়ে বড়। বেঁচে থাকার কোন বিকল্প নেই বলে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র সমস্যা বলে মনে হচ্ছে।

একদিন জানকীর দেখা পেতেই গৌরী বলে উঠল, কি গো মিনসে আর যে তোমার দেকাই নেই?

আসলে জানকী হতাশ হয়ে গিয়েছিল, সে কথাটা জানিয়ে বলল, বহুৎদিন এদিকে আসি নি।

তা বিয়ে টিয়ে করলে?

তুমি বললে যে জানানা দিবে দিলে কোথায়?

গৌরী উল্টো চাপ দিল, তুমি আর এলে কোথায়?

বাঃ কবার তো এলাম। তুমি তো কিছুই করলে না।

আমি কি তোমার কাচে মানুষ পৌঁচে দে আসব? যাক গে শোনা মেয়েটিকে অনেক কষ্টে আমি রাজি করিয়েচি, যদি এক্ষুনি কর তো হয়ে যাবে নইলে আবার কি মত ঘুরে যাবে আমি জানি নি।

সেই মেয়েলোকটি?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

তবে আমাকে তিনশো ট্যাকা দিয়ে যাও। আমি কাপড় চোপড় কিনে সব গুচিয়ে গাচিয়ে দেব।

জানকী জানাল, কাপড় আমি কিনে দেব।

গৌরী মুখিয়ে উঠল, আ মলো যা মেয়েটা কি স্তাংটো হয়ে যাবে? ওসব হবে না ট্যাকা খসাতে হবে।

অবশেষে অনেক দর কষাকষি করে দুশো টাকায় রফা হল। স্থির হ'ল পরদিনই জানকী টাকাটা দিয়ে জানানা নিয়ে যাবে। আসলে এতগুলো টাকা দিয়ে সে বিশ্বাস করতে পারে না এমন একটা ফুটপাথের মেয়েমানুষকে। গৌরীর কথা হল, তুমি ট্যাকা দিয়েই বলবে চল তা কি করে হয়? আমি শাড়ীটা শায়াটা কিনব একটু সাফ সুতরো ক'রব তবে না তোমার সঙ্গে যাবে।

কথাটা যদিও ঠিক তবু বিশ্বাস করা মুশকিল। তাই জানকী জানাল, সে-ও সেদিনটা কাজ কামাই ক'রে এখানেই সারাদিন থেকে যাবে। টাকা দিলে মাল না নিয়ে চলে যাবার মূর্খামী ওদের ধাতে নেই। টাকার বিনিময়ে বাকি রাখে না কোন প্রাপ্য, কোন সৌজন্যবোধেই নয়, কারণ সৌজন্যবোধ যে জীবনের সম্পদ সে জীবন ওদের নয়। ব্যাপারটা জানে বলেই জানকীর অবিশ্বাস গায়ে না মেখে হাল্কাভাবে নিল গৌরী, একমুখ হেসে বলল, ঠিক আচে তাই হবে। তুমি সকাল থেকে এখানেই থাকবে মায়ের থানে পূজো দিয়ে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে নিয়ে যাবে। সকালে এসেই আমাকে ট্যাকা দিতে হবে কিন্তু।

জানকী অনুমান করছিল বুড়িটা এই টাকায় সিংহভাগ বসাতে চায় বউটাকে জুটিয়ে দেবার মূল্য হিসেবে। সে-ও তা দিতে রাজি নয় বড় জোর দু পাঁচটা টাকা দিতে পারে। বাংলা মুলুকে আবার মেয়ের অসুবিধে কি? এখানের বহু মেয়েই তো বহু পরদেশীর সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। তাদের জন্যে আবার টাকা খরচ করতে হবে নাকি! সে নেহাৎ বাঙ্গালী পাড়ায় থাকে না বলে তার জোটে নি। গৌরীর মানসিকতা সে বোঝে না, মাগীটাকে রাজি করাতে কি কষ্ট যে হয়েছে সে একমাত্র গৌরীই জানে। এত কষ্ট শুধু শুধু করবে? ও মদ্দটা কিছু দেবে না-ই বা কেন? ওর জন্যে যে এত হাঙ্গামা ক'রলাম!

যাই হোক ঝামেলা অবশেষে মিটল। সকালবেলা স্নানটান করে জানকী এসে হাজির। গৌরী বলল, ট্যাকা দাও।

দিবো দিবো। জানানা তৈয়ার তো?—জানকী জানতে চাইল।

ট্যাকা দাও তবে না তৈরী হবে?

এরদ্দান তো বাত না ছিলো!

বলিস কি রে মিনসে! ট্যাকা দিবি তবে না কাপড় চোপড় কিনব!

জানকী দেখল বধ্য ছাগলের মত দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে সীতা। ভাব দেখে তার কিছুটা আশা হল যে মাল যখন চোখের সামনে আছে তখন টাকা দিলেও ভয় নেই। তবু সে একশো টাকাই দিল। অমনি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল গৌরী এমনই একটা অশ্লীল কথা বলে বসল যে জানকীর মত পুরুষ মানুষও লজ্জা পেল। সে বলল, কাপড়া কিনো তো রূপেয়া দেঙ্গে।।

দেঙ্গে টেঙ্গে নয় এখনই দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল!

অবশেষে আর পঞ্চাশ টাকা বেগতিক দেখেই দিল জানকী। গৌরী বলল, বসো আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একখানা সস্তা ছাপা শাড়ী, একটা জামা একটা সায়া এনে সীতাকে পরিয়ে দিল। ক'গাছা প্লাস্টিকের চুড়িও পরালো তার হাতে। সীতার ভীষণ ভয় ক'রছিল, এত ভয় তার জীবনে করেনি। সে যেন শক্ত কাঠ হয়ে পড়েছিল। গৌরী তাকে স্বাভাবিক করবার জন্যে বলল, ভয় কি লা? দেখবি কত ভাল থাকিস। কোন কষ্ট হবে না। আমি তো যাব তুইও পরে বেড়াতে আসিস ওর সঙ্গে।

সীতার মুখে কথা সরছিল না অবশেষে বলল, কোথা যাব তুমিও চল মাসী। আমার বড় ভয় করতেছে।

দূর বোকা। কিসের ভয়?

জানকী কাছেই ছিল শুনে সাধ্যমত সীতার ভাষায় বলল, কুছু ভয় নাই। —তার ভালই লাগছিল সীতার সলজ্জ ভয় দেখে। সে মোলায়েম স্বরে বলল, তুমকো কুছু তখলিফ হোবে নাই।

কোন আশ্বাসই সীতার কাছে যথেষ্ট মনে হ'ল না লোকটির ভাষার সঙ্গে লালুর কথার মিল দেখে। শরীরও লালুর সঙ্গী সেই ধর্ষণকারী লোকটির মতই। এ যদি আবার তেমনই বদমাস হয়! আতংকিত হয়ে পড়ল সে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, না মাসী তুমি চল।

গোলমাল এড়ানোর জন্যে গৌরী রাজি হয়ে গেল। ঠিক আছে চল। আমার আর কি বল, যেখানে হোক থাকলেই হল!

যতই জিলিপি কচুড়ি খাওয়া হোক বাকি পঞ্চাশ টাকার দাবী জানাতে ছাড়ল না গৌরী এবং অতিকষ্টে পঁচিশ টাকা আদায় ক'রতে পেরে তবে থামল। সব পাট চুকে গেলে যাবার আগে গৌরী বলল, এতকাল রইলি ভালই হোক আর মন্দই হোক মা কালীর থানে একবার গড় ক'রে যাবি নি?

যাচ্ছিস তো ভাল মন নিয়েই যা। মা কালীকে বলে যা মা যেন ভালই রাখে।

এতদিন এখানে আছে ওরা কখনও মন্দিরের ভেতরে ঢোকবার কথা ভাবে নি, যা হবার বাইরে বাইরেই হয়েছে, বাইরেই থেকেছে। আজ নতুন পোষাক পরে পুরানো জীবন বদলে কালী মন্দিরে ঢুকল সীতা। বদ্ধ মন্দিরের দরজার সামনে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করল বেশ ভক্তিভরেই। কিন্তু সেই যে মাথা নীচু করল আর তোলে না দেখে গৌরী বলল, কি লা, ঘুমিয়ে পড়লি না কি? অচিরেই বোঝা গেল সে কাঁদছে। নিঃশব্দে কিন্তু প্রবল আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদছে সে, সবেগেই কাঁদছে। শুধু বেঁচে থাকবার জন্যেই তাকে মনের বিরুদ্ধে সারাজীবনের ধারণার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন পথে চলতে হচ্ছে ঠিকই, যা ফেলে যাচ্ছে তার মূল্যও কম নয়। ফেলে যাচ্ছে তার সমস্ত কিছু যা আর কোনদিনই ফেরৎ পাবে না, কোন অবস্থাতেই নয়। কোথায় কিভাবে কি অবস্থার মধ্যে জীবন বয়ে চলবে সে জানে না, কোন অনিশ্চিয়তার দিকে নিরুপায় অনিবার্যতায় সে ভেসে চলল তারও কিছুই অনুমিত নয়, তবু তাকে যেতে হচ্ছে। যা হারিয়ে গেছে তারই আকর্ষণ এখন তার পিছুটান হয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে তাকে, কি যেন এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রাখতে চাইছে, সে কেবল রক্তাক্ত হচ্ছে এই টানাপোড়ানে, বিধ্বস্ত হচ্ছে।

গৌরী সব বোঝে বলেই ঘাটমাঝির নির্মমতায় নোঙর তুলে দিল, নে ওঠ, চল। অনেকদূর যেতে হবে। আমি তো আছি।

জীবন চট করেই শেষ হয়ে যায় মহাকালের চোখের পলকে, তবু শেষের পথ অনেক দূর। এখনও অনেকটা দূরই চলতে হবে সীতাকে। এ চলা একলা অসম্ভব তাই অজানা অচেনা অবাঞ্ছিত জানকীর পেছন পেছন সে চলতে লাগল শুধু মাত্র জীবন ধারণের জন্যে, জীবন ছাড়া জীবনের আর কোনই গতি নেই বলে।